মাসুদ রানা

সর্বনাশের দূত

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

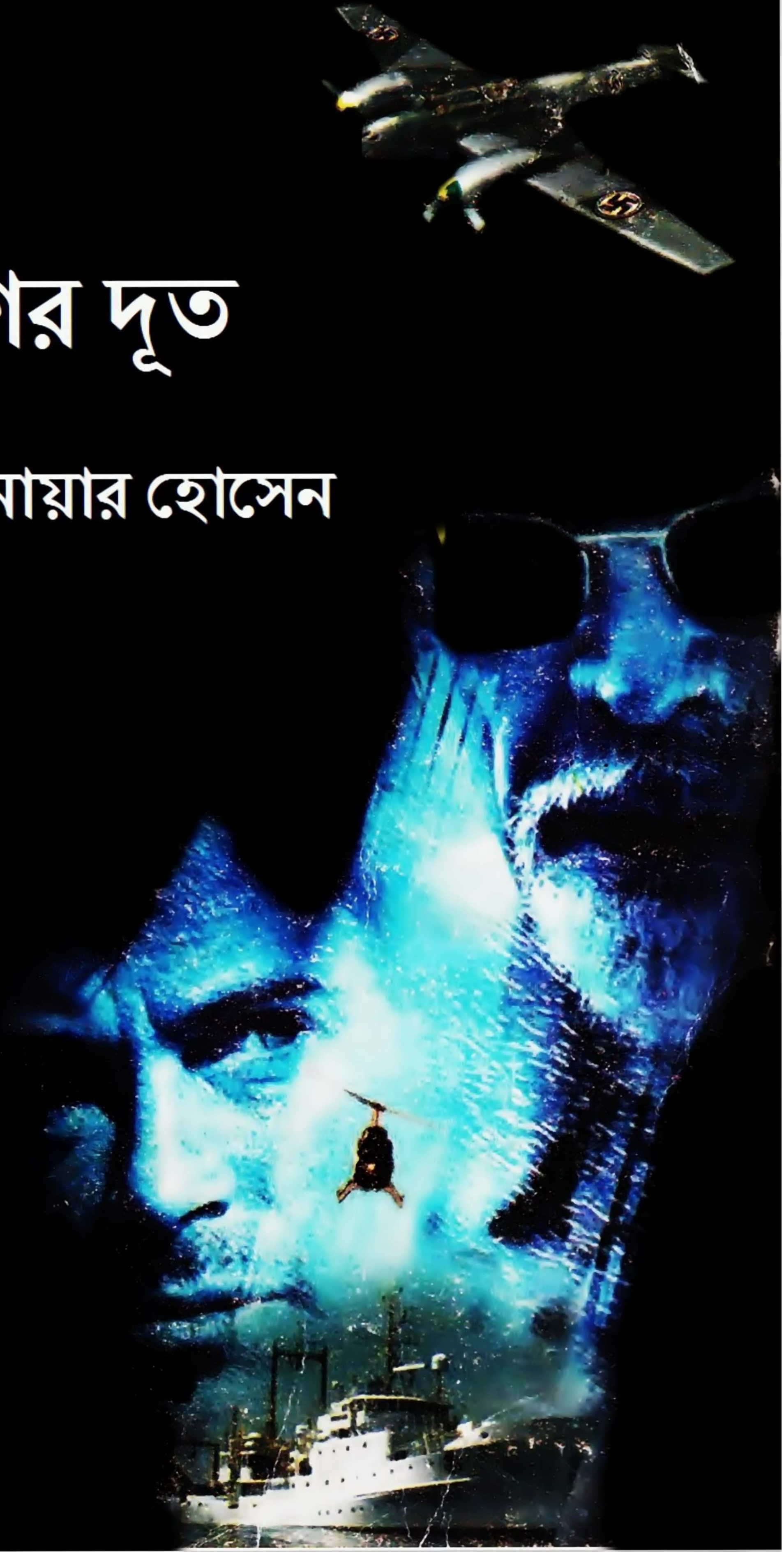

Rizon

সেবা প্রকাশনী

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা ৪১৫

সর্বনাশের দূত

(প্রথম খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন

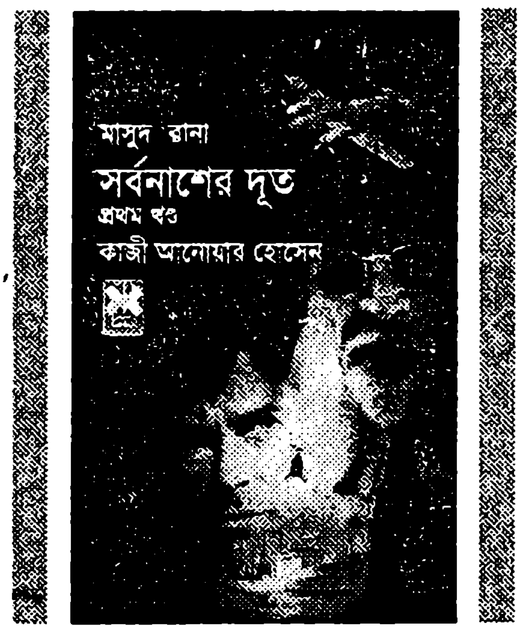

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7415-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১২

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-415
SHARBANASHER DOOT
Part-I
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

নব্বই টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউণ্টার ইণ্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর *গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ *বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট* সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর *নকল রানা*রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যুআলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ *ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা *অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী*দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩ *কালপুরুষ*নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি*কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ *অপারেশন বসনিয়া *টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ *শয়তানের ঘাঁটি*ধ্বংসের নকশা*মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস *জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা*মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ *গুডবাই, রানা*সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে *শয়তানের দোসর *নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু *মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা *মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা*বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট *ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসদ্বীপ *বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী *স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল *শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য*প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেলআবিব *ক্রাইম বস*সুমেরুর ডাক*ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী*বেঈমান *দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা *রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন*হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ*কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু *আসছে সাইক্লোন *সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা *দুরন্ত ঈগল*সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*স্নাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান*জলরাক্ষস *মৃত্যুশীতল স্পর্শ*স্বপ্নের ভালবাসা*হ্যাকার*খুনে মাফিয়া*নিখোঁজ*বুশ পাইলট *অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অন্তর্ধান*ড্রাগলর্ড*দ্বীপান্তর*গুপ্ত আততায়ী*বিপদে সোহানা *চাই ঐশ্বর্য*স্বর্ণ-বিপর্যয়*কিল-মাস্টার*মৃত্যুর টিকেট*কুরুক্ষেত্র*ক্লাইম্বার *আগুন নিয়ে খেলা*মরুস্বর্গ*সেই কুয়াশা*টেরোরিস্ট*সর্বনাশের দূত।

এক

দিগন্তে ঝুলছে হালকা কুয়াশা মোড়া মস্ত পূর্ণিমার চাঁদ। রুপালি আলোয় টলমল করছে তীব্র শীতল, নিথর সাগর। শীত মৌসুম প্রকৃতিকে এখনও বসন্তের হাতে তুলে দেয়নি। এ বছর সূর্য ওঠেনি এখনও। তবে দূর দিগন্ত বরাবর, যেখানে আকাশ মিশেছে সাগরে, ইতোমধ্যেই দেখা দিয়েছে সেখানে সরু একটা সাদা রেখার আভাস। ওটা বলছে: দিন বদলের পালা এই এল বলে। মাসখানেকের মধ্যেই উঁকি দেবে সূয্যি-মামা। সেই যে উঠবে, বিদায় নেবে একেবারে সেই হেমন্তের শেষে। আর্কটিক দিনরাত্রির সাইকেল কোটি কোটি বছর ধরে চলছে এভাবেই।

এটা নরওয়ের ব্যারেণ্টস্ সি। প্রায় সত্তর বছর আগের দৃশ্য। তারিখ: উনিশ শ' বেয়াল্লিশ সালের ২২ এপ্রিল।

উত্তর গোলার্ধের এতটা উপর দিকের সাগর বছরের বেশির ভাগ সময়ই জমে বরফ হয়ে গিয়ে জাহাজ চলাচলের অনুপযোগী থাকার কথা। কিন্তু ব্যারেণ্টস্ সির ব্যাপারটা আলাদা। গালফ স্ট্রিমের সঙ্গে ট্রপিকের উষ্ণ স্রোত মিশে উঠে আসছে উপরে। এই জোরাল প্রবাহের কারণেই উত্তর নরওয়ে ও স্কটল্যাণ্ডে টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে মানুষের পক্ষে। ঘোর শীতের ভিতরও নাব্য থাকে ব্যারেণ্টস সাগর, তাই এ পথে আমেরিকা থেকে আসতে পারছে লক্ষ লক্ষ টন মারণাস্ত্র, পৌঁচচ্ছে যুদ্ধরত সোভিয়েত ইউনিয়নে।

এ ধরনের বেশ কিছু সমুদ্র প্যাসেজ, যেমন ইংলিশ চ্যানেল বা জিব্রাল্টার স্ট্রেইট, হয়ে উঠেছে ভয়ানক বিপজ্জনক। ওঁৎ পাতছে এখানে জার্মান ক্রিয়েক্সমেরিন, বিশেষ করে দ্রুতগতি টর্পেডো বোট শ্নেলবুটসগুলো ঝামেলা করছে বেশি। সেই সঙ্গে ইউবোটের সুপরিকল্পিত অতর্কিত হামলা তো রয়েছেই।

ঠিক যেন দাবার ছক, নির্ভুল চাল দিচ্ছে কোনও দক্ষ দাবাড়ু গ্র্যাণ্ডমাস্টার। তুমুল দাপটে চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জার্মান সেনাপতিরা নিজেদের আওতার ভিতর রাখতে চাইছে মহাসমুদ্র। খুঁটিনাটি প্রতিটি সামরিক তথ্য সংগ্রহ করছে তারা, পরীক্ষা করছে বোর্ডে সাজিয়ে। যুদ্ধে জিততে হলে প্রয়োজন প্রবল শক্তি, সেই সঙ্গে দ্রুতগতির সিদ্ধান্ত। জার্মান নেভি নজর দিয়েছে মিত্রপক্ষীয় জাহাজের গতিপথের উপর। উত্তর আটলাণ্টিক সাগরে কখন কোন্ জাহাজে হামলা করবে ইউবোট, জানে না মিত্রশক্তি।

নরওয়ে ও ডেনমার্কের বেস থেকে আকাশে উঠছে জার্মান এয়ারক্রাফট, চোখ রাখছে সাগরে। বাণিজ্য জাহাজ দেখলে দেরি না করে জানিয়ে দিচ্ছে ফ্লিটের হেডকোয়ার্টারে। ইউবোটগুলো ফাঁদ পাতছে, আক্রমণ চলছে জাহাজগুলোর উপর। যুদ্ধের প্রথম বছর ছিল সাবমেরিনগুলোর বিজয়ের সাল। তারাই ছিল সাগরের রাজা। কত মিলিয়ন টন মালামাল ডুবিয়ে দিয়েছে, কেউ জানে না। হাজারো মানুষ অকালে ডুবে মরেছে। মিত্রশক্তি জাহাজ-গুলোকে যতই এসকোর্ট করুক, তাদের ক্রুজার ও ডেস্ট্রয়ারগুলো প্রতি এক শ' জাহাজের মধ্যে রক্ষা করতে পেরেছে মাত্র একটি। ঠাণ্ডা মাথায় খেলেছে জার্মান নেভি। কিছুই করবার ছিল না মিত্রপক্ষের মার্চেন্ট মেরিনের।

তবে আজ রাত থেকে বদলে যাবে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি।

আকাশে ভাসছে চার ইঞ্জিন বিশিষ্ট বিশাল এক বিমান,

ফোক-উলফ এফডাব্লিউ-২০০ কণ্ডোর। দৈর্ঘ্যে ওটা সাতাত্তর ফুট, ডানার বিস্তার এক শ' দশ ফুট। যুদ্ধের আগে ডিজাইন করা হয়েছিল ওটা লুফ্‌ত্‌হানসার প্যাসেঞ্জার এয়ারলাইনার হিসাবে ব্যবহারের জন্য। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় মিলিটারি কাজে নামিয়ে দেয়া হয়েছে কণ্ডোরকে। মালামাল বহন করছে, সেই সঙ্গে কাজ করছে লং-রেঞ্জ রিকনিসেন্স প্ল্যাটফর্ম হিসাবে। কণ্ডোরের রেঞ্জ আড়াই হাজার মাইল, ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকতে পারে আকাশে, উপকূল থেকে বহুদূর সাগরে খুঁজতে পারে মিত্রশক্তির জাহাজ।

যুদ্ধ-বিমান হিসাবে কণ্ডোরকে প্রথম উনিশশ' একচল্লিশ সালে ব্যবহার করা হয়। ফলাফল ভাল হয়নি। চারটি পাঁচ শ' পাউণ্ডের বোমা ডানার নীচে নিয়ে হামলা করতে গিয়ে এসব বিমানকে প্রচণ্ড ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। এরপর থেকে এসব বিমানকে রিকনিসেন্স-এর কাজ দেয়া হয়। অ্যালাইড অ্যান্টিএয়ারক্রাফ্‌ট গানের রেঞ্জের বাইরে থেকে চারদিকে চোখ রাখে ফোক-উলফ এফডাব্লিউ-২০০ কণ্ডোর।

কয়েক ঘণ্টা হলো সাগরের উপর চোখ রেখেছে এয়ারক্রাফটের পাইলট জ্যাকব শুমাখার। নীচে দেখবার কিছুই নেই, শুধু ঘন কালো অন্ধকার। তিক্ত হয়ে আছে শুমাখারের মন। কোনও ফাইটার বিমানের পাইলট হতে চেয়েছিল সে। বদলে হয়েছে এই! যুদ্ধ করবার উপায় নেই তার! সত্যিকারের যুদ্ধ থেকে অনেক দূরে সে! হাজার হাজার ফুট উপরে আকাশে ভেসে চলেছে, নীচে শুধু কালো মরা সাগর! সে যদি মিত্রপক্ষের কোনও জাহাজ দেখে, হামলা করবে অন্য কেউ, ডুবিয়ে দেবে সে জাহাজ, বাহবা নেবে। কৃতিত্বের ভাগ পাবে না শুমাখার।

বেসে কঠোর ভাবে মিলিটারি আইন মেনে চলে জ্যাকব।

সবসময় তার দলকে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বাধ্য করে। তবে আকাশে যখন থাকে, শৃঙ্খলায় খানিক ঢিল দেয় সে। পাঁচজন তারা বহুদিন ধরে এই একই কাজ করছে—আকাশ থেকে চুপচাপ চোখ রাখছে বিশাল সাগরের উপর। সময় কাটতে চায় না বিমানে, তাই মাঝে-মধ্যে খানিক হাসি-ঠাট্টাও চলে এখানে—তবে সব সময় নয়।

'ওটা সুবিধা দেবে,' মন্তব্য করল পাইলট জ্যাকব শুমাখার, মাথা কাত করে ইঙ্গিত করল নিঃসঙ্গ চাঁদটার দিকে।

'অথবা ওটার আলো প্রতিফলিত হবে সাগরে, আর তাই হারিয়ে যাবে জাহাজের প্রপেলারের ঢেউ,' বলল শুমাখারের কো-পাইলট, হ্যানসেল মুয়েলার। নেতিবাচক কথা বলার ওস্তাদ সে।

'এখন সাগর যেমন শান্ত, ওদের দেখতে পাব সহজে।'

'আমরা কি জানি এদিকের সাগরে জাহাজ আছে?' জানতে চাইল ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেল। ক্রুদের ভিতর সবচেয়ে কম বয়সী সে, কণ্ডোরের রিয়ার গানার। ফিউজেলাজের পিছনে, নীচের দিকে তার গণ্ডোলা। প্লেক্সিগ্লাস শিল্ডের পিছনে বসেছে। ডানহাত রেখেছে এক নলা এমজি-ফিফটিন মেশিনগানের উপর। এ বিমান যে এলাকা পিছনে ফেলে আসে, শুধু সেটুকু দেখতে পায় সে।

'স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার আমাকে বলেছেন এক ইউবোটের কাছ থেকে মেসেজ পেয়েছেন। ওটা ফিরছিল গত পরশুদিন। ফেয়ারো দ্বীপপুঞ্জের কাছে অন্তত এক শ' জাহাজ দেখেছে।' নীচে চাইল পাইলট শুমাখার। 'ওসব জাহাজ উত্তর দিকে আসে। কাজেই এদিকেই কোথাও থাকবে।'

'বোধহয় খোঁজ নিলে জানা যাবে ইউবোটের কমাণ্ডার সব ক'টা টর্পেডো হারিয়ে বাড়ি ফিরেছে, এখন মিলবে ঊর্ধ্বতন অফিসারের বকা, তাই একটা কিছু বানিয়ে বলে দিয়েছে।'

তিতকুটে চেহারা করল হ্যানসেল মুয়েলার। ঠাণ্ডা, কৃত্রিম কফি—চুমুক দিয়ে আরও তেতো হয়ে গেল সে।

'আমি চাই জাহাজগুলো আমাদের সামনে পড়ুক, ডুবিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরব,' বলল ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেল। মাত্র আঠারো বছর তার বয়স। তার ইচ্ছা একদিন মস্ত ডাক্তার হবে। কিন্তু মেডিকেলে ভর্তি হওয়ার আগেই ডাক পড়েছে মিলিটারি থেকে। ব্যাভারিয়ার গরিব এক পরিবার থেকে এসেছে সে, মনে মনে জানে, মেডিকেলে পড়বার সুযোগ তার হবে না। টাকা কোথায়? তবুও অবসরে নাক গুঁজে রাখে মেডিকেল জার্নালে। কয়েকটা ডাক্তারি বইও কিনেছে, বারবার পড়ে ওগুলো।

'সত্যিকারের জার্মান যোদ্ধা এ কথা বলবে না,' নরম স্বরে শাসন করল ক্যাপ্টেন শুমাখার। সে জানে, তাদের কপাল ভাল যে কখনও কোনও শত্রুর সামনে পড়েনি। তার ধারণা, যদি সত্যি লড়তে হয়, প্যাণ্ট নষ্ট করে ফেলবে ক্যাপেল। একটা গুলিও বেরোবে না তার মেশিনগান থেকে। ক্রুরা কেউ রিয়ার গণ্ডোলার বদ্ধ পরিবেশে থাকতে চায় না, তাই ওখানে রাখা হয় ক্যাপেলকে। ওখানে বসে কীসের যেন আশা নিয়ে ঝিমিয়ে চলে ছোকরা, বোধহয় ভাবে যুদ্ধ জয় করবে।

তিক্ত মনে ভাবছে শুমাখার, পুব ফ্রন্টে মারা পড়ছে হাজার হাজার জার্মান সৈনিক। শত শত ট্যাঙ্ক ও বিমান পাঠানো হচ্ছে ওখানে। আশা করা হচ্ছে রাশানদের হটিয়ে মস্কো জয় করে নেবে জার্মান সেনাবাহিনী। আর আমরা কী করছি, নিজেকে জিজ্ঞেস করল শুমাখার। ছটফট করে ওঠে তার বুকের ভিতরটা—ভাল হতো দু'চারটে জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারলে!

অতি ধীরে পেরিয়ে গেল একটি ঘণ্টা। আঁধারে চোখ জ্বেলে চারদিক দেখছে ওরা। যদি সত্যি ওই কনভয়ের দেখা মেলে!

আরও কিছুক্ষণ পর শুমাখারের কাঁধের উপর টোকা দিল কো-পাইলট হ্যানসেল মুয়েলার। তার লগ দেখিয়ে দিল। অফিশিয়াল ন্যাভিগেটর সামনের গগুোলার গানার, তবে মুয়েলার হিসাব কষে বের করেছে ফ্লাইট টাইম ও ডিরেকশন। নিচু স্বরে জানিয়ে দিল সে, এবার সময় হয়েছে বিমান ঘুরিয়ে নেয়ার। সাগরের আরেক অংশ থেকে আবারও নতুন করে শুরু হবে খোঁজা।

রাডারে চাপ দিল পাইলট শুমাখার, ধীরে নাড়ছে ইয়ক, বামে ঘুরতে শুরু করল বিমান। একবারের জন্য দিগন্ত থেকে চোখ সরল না শুমাখারের। মনে হলো সরতে সরতে আকাশের এক দিক থেকে আরেক দিকে চলে গেল মস্ত চাঁদটা।

এ বিমানের ক্রুদের ভিতর সবচেয়ে তীক্ষ্ণ নজরের অধিকারী ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেল। যখন অনেক ছোট ছিল, তখন থেকেই নিজেদের খামারে কোনও জন্তু মারা গেলে সেটার মৃতদেহ কাটাকাটি করত সে—অ্যানাটমি শিখবে বলে। এ বিষয়ে কোনও বই পেলে বারম্বার পড়ত। সেই বয়স থেকেই সে জানত তার চোখ খুব ভাল; শুধু তা-ই নয়, কখনও কাঁপে না হাত। মন বলত, ডাক্তার হলে ভাল করবে সে। আর এখন সৈন্য হয়েও খারাপ করছে না। তার চোখ খুঁজছে শত্রুপক্ষের জাহাজ বহরকে।

ক্যাপেলের স্টেশন থেকে বহুদূর চোখ চলে না, কাজেই সবার আগে শত্রুকে দেখবার কথা নয় তার, কিন্তু সে ঠিকই দেখল! বিমান ভেসে চলেছে মসৃণ ভাবে, এমন সময় জ্যোৎস্নায় অস্বাভাবিক একটা সাদা ঝিলিক চোখে পড়ল তার।

'ক্যাপ্টেন!' ইন্টারকমে বেসুরো শোনাল ম্যাক্সিমিলিয়ানের কণ্ঠ। 'স্টারবোর্ড সাইড, স্যর! বেয়ারিং তিন শ'র মত!'

'ওটা কী?' চাপা উত্তেজনার সঙ্গে জানতে চাইল শুমাখার। বুকে ছলকে উঠেছে আদিম উত্তেজনা। যেন পাওয়া গেছে শিকার।

'ঠিক নিশ্চিত নই, স্যর। কী যেন। হঠাৎ ঝিলিক দিল।'

ওদিকের অন্ধকারে চেয়ে রইল শুমাখার ও হ্যানসেল মুয়েলার। কিন্তু কিছুই নেই ওদিকে।

'তুমি ঠিক দেখেছ?' আবারও জানতে চাইল পাইলট।

'ইয়েস, স্যর,' জোর দিয়ে বলল ক্যাপেল। 'আমরা যখন ঘুরছিলাম, ঠিক তখন। আমাদের অ্যাঙ্গেল বদলে গেল তারপর। আমি শিওর, ওখানে কিছু দেখেছি।'

'কোনও কনভয়?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল মুয়েলার।

'ঠিক জানি না, স্যর,' বলল ক্যাপেল।

'স্মিট, রেডিও চালু করো তো,' অ্যানসিলারি পজিশনের ফোর গানারকে নির্দেশ দিল শুমাখার। নিজে আরও কিছুটা পাওয়ার সরবরাহ করল বিএমডাব্লিউ ইঞ্জিনগুলোতে। বাঁক নিতে শুরু করেছে বিমান। খানিক নামছে ওটা, তীব্র বাতাস কাটছে প্রপেলারগুলো।

চোখে বিনকিউলার তুলেছে মুয়েলার, অন্ধকার সাগরের দিকে চেয়ে রইল সে। প্রায় দু শ' মাইল গতি তুলে ছুটছে বিমান, কো-পাইলট আশা করছে যে-কোনও সময়ে দেখবে মিত্রপক্ষের জাহাজ বহর। এক এক করে মুহূর্ত কাটছে, পেরিয়ে গেল দুটো মিনিট—কিছুই দেখা গেল না। বিনকিউলার নামিয়ে নিল মুয়েলার। 'কোনও ঢেউ বোধহয়,' ইন্টারকমের মাইক্রোফোন সরিয়ে রাখল সে।

'সত্যি কিছু থাকতে পারে,' বলল ক্যাপ্টেন শুমাখার। 'রাতের আঁধারে বিড়ালের মত দেখে ক্যাপেল।'

সাগর সমতলে শত্রুদের কাছ থেকে নিজেদের রক্ষা করবার পথ বের করে ফেলেছে অ্যালাইড ফোর্স। তাদের বাঁকাচোরা ক্যামোফ্লেজ প্যাটার্নগুলো ফ্রেইটার ও ট্যাঙ্কারগুলোকে লুকিয়ে

রাখে। কিন্তু রাতের আঁধারে তাদের কনভয়কে আড়াল করে না। জাহাজের প্রপেলারের ফেনা ও স্রোত ঠেকাবে কে? কুচকুচে আঁধার সাগরে জ্বলজ্বলে সাদা দাগের মত রয়ে যায় ওগুলো।

আরেশ্শালার কপাল—বিড়বিড় করল মুয়েলার, আঙুল তুলে দেখাল দূরে।

প্রথমে মনে হলো ওটা কালো সাগরে এক স্তূপ ধূসরতা। বিমান আরও কাছে যেতে দেখা গেল, ওগুলো ডজনখানেক লম্বা সাদা রেখা। ঠিক যেন ব্ল্যাকবোর্ডের উপর সরু রেখা টেনেছে সাদা চক। ওরা বুঝে গেল, ওখানে রয়েছে জাহাজের বড় একটা বহর! প্রপেলারের ঢেউ পিছনে ফেলে দ্রুতগতি তুলে চলেছে পুবে। এত উপরের কণ্ডোর থেকে মনে হলো, ওগুলো বড়সড় হাতি, হেলেদুলে চলেছে পাল বেঁধে।

জাহাজগুলোর আরও কাছে চলে এসেছে কণ্ডোর, চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল শ্লথ গতির ফ্রেইটার ও ট্যাঙ্কারগুলোকে। সেসবের দু'পাশে চলেছে ডেস্ট্রয়ার, তৈরি করছে সরু ঢেউ। যেন ভেড়ার পালকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে পাহারাদার কুকুর।

কণ্ডোর থেকে চেয়ে রইল বৈমানিকরা, হঠাৎ তারা দেখল কনভয় থেকে স্টারবোর্ডের দিকে সরে গেছে একটা ডেস্ট্রয়ার, দ্রুত চলেছে ওটা। চিমনি দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া। দেখতে দেখতে কনভয়ের মাথায় চলে গেল ডেস্ট্রয়ার। তারপর আবারও কমিয়ে নিল গতি। অপেক্ষা করছে, আবারও ফ্রেইটারগুলো তাকে পাশ কাটাবে। বেশ কিছু দিন হলো এই পদ্ধতি ব্যবহার করছে অ্যালাইড ফোর্স। নাম দিয়েছে, ইণ্ডিয়ান রান। এক মাইল লম্বা কনভয়ের পিছনে পড়ে গেলে আবারও গতি তুলে সামনে হাজির হবে ডেস্ট্রয়ার। বারবার চলবে এই নিয়ম।

এতে যুদ্ধ-জাহাজের প্রয়োজন হয় কম।

'অন্তত দু' শ' জাহাজ,' আন্দাজ করল মুয়েলার।

'ওখানে যত রসদ, কয়েক মাস যুদ্ধ চালাতে পারবে রাশা,' সায় দিল শুমাখার। 'স্মিট, রেডিও কী বলে?'

'স্ট্যাটিক ছাড়া কিছু নেই।'

প্রায় নিয়মিত আর্কটিক সার্কেলে চলে রেডিওর এই খড়খড় আওয়াজ। যোগাযোগ কঠিন হয়ে ওঠে। বিশ্বের দুই ম্যাগনেটিক ফিল্ডে আঘাত হেনে চলেছে চার্জড্ পার্টিক্ল্, ফলে বেশির ভাগ সময় অকেজো থাকে রেডিওর ভ্যাকিউয়াম টিউব।

'আমাদের পজিশন লিখে নাও,' বলল শুমাখার, 'আমরা বেসের কাছে পৌঁছলে রেডিওতে রিপোর্ট করব। আর, ক্যাপেল, হ্যাঁ, ভাল দেখিয়েছ। আমি আরেকটু হলে ঘুরতে শুরু করতাম, দেখতাম না কনভয়।'

'আপনাকে ধন্যবাদ,' তরুণ সৈন্যের কণ্ঠে গর্ব প্রকাশ পেল।

'আন্দাজ করে লিখে রাখো কনভয়ে ক'টা জাহাজ থাকতে পারে। সেই সঙ্গে ওগুলো কী গতিতে চলেছে।'

'ওগুলোর বেশি কাছে যাওয়া ঠিক হবে না,' সাবধান করল মুয়েলার। 'ডেস্ট্রয়ার থেকে গোলা আসতে পারে।' নিজ চোখে বিমান লড়াই দেখেছে সে। তার বাম উরুর ভিতর এখনও রয়েছে শ্র্যাপনেল। লণ্ডন শহর আক্রমণ করতে গিয়ে বিপদে পড়ে তার দল। ক্যাপ্টেন জ্যাকব শুমাখারের চোখে স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছে সে। লোকটার কণ্ঠে ছড়িয়ে পড়েছে উত্তেজনা। নিচু স্বরে বলল মুয়েলার, 'ক্যাম থেকে সাবধান।'

'আমার উপর বিশ্বাস রাখো,' আত্মবিশ্বাস ও গর্ব ঝরল শুমাখারের কণ্ঠে। বিরাট বিমানটা ঘুরিয়ে কনভয়ের দিকে নিয়ে চলেছে সে। দশ হাজার ফুট নীচ দিয়ে ধীর গতিতে চলেছে

জাহাজগুলো। 'বেশি কাছে যাব না। তবে ওরা তীর থেকে অনেক দূরে। হারিকেনের সাপোর্ট পাবে না।'

জার্মানদের রিকনিসেন্স-এর পাল্টা জবাব অ্যালাইড ফোর্সের ক্যাম, বা ক্যাটাপল্ট এয়ারক্রাফ্ট্ মার্চেন্টমেন। ফ্রেইটারের বো থেকে লম্বালম্বি থাকে রেইল পাত, ওখানে রকেট নিয়ে প্রস্তুত থাকে হকার সি হারিকেন ফাইটার এয়ারক্রাফট্। ও জিনিস ছিটকে উঠে আসে আকাশে। ওই বিমান সহজেই কণ্ডোর বা পানির উপর উঠে আসা ইউবোট ধ্বংস করতে পারে। কিন্তু ক্যামের অসুবিধা, ওটা আবারও মাদার শিপে ফিরতে পারে না। গ্রেট ব্রিটেনের কাছাকাছি থাকতে হয় হারিকেনগুলোকে, অথবা কাছাকাছি বন্ধু কোনও দেশে নামতে হয়। তা যদি না পারে, তাদের নামতে হয় সাগরে, তলিয়ে যায় মূল্যবান বিমান। তবে বেশির ভাগ সময় পাইলটকে উঠিয়ে নেয়া যায় জাহাজে।

এফডাব্লিউ ২০০-র নীচে এগিয়ে চলেছে কনভয়। তারা অ্যালাইড টেরিটোরি থেকে অন্তত এক হাজার মাইল দূরে। আকাশে যতই থাকুক উজ্জ্বল চাঁদ, কোনও হারিকেন এয়ারক্রাফট আঁধার সাগরে নামলে সঙ্গে সঙ্গে ডুববে পাইলটসহ। ধরে নেয়া যায় আজ রাতে আকাশে উঠবে না অ্যালাইড ফোর্সের বিমান। কণ্ডোরের কোনও ভয় নেই, অ্যালাইড শিপিঙের কাছাকাছি না গেলেই হলো। ডেস্ট্রয়ারের অ্যান্টিক্রাফ্ট গোলা থেকে অনেক দূরে থাকতে হবে।

সারি সারি জাহাজের সংখ্যা গুনছে ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেল, এমন সময় হঠাৎ দুটো ডেস্ট্রয়ারের ডেকে আলোর ফুলকি দেখল। 'ক্যাপ্টেন!' বেসুরো সুরে ডাকল সে। 'কনভয় থেকে গোলা আসছে!'

বিমানের ডানার অনেক নীচে ডেস্ট্রয়ারগুলোকে দেখল

শুমাখার। 'ভয় নেই, বাছা,' মৃদু হাসল সে। 'ওগুলো সিগনাল লণ্ঠন। জাহাজগুলো কড়াকড়ি ভাবে রেডিও সাইলেন্স মানছে। ওই বাতি দিয়ে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করছে।'

'ও। দুঃখিত, স্যর।'

'লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। ভালভাবে গুনে রাখো ক'টা জাহাজ।'

জাহাজের বহরকে ঘিরে অলস ভঙ্গিতে ঘুরছে কণ্ডোর, চলে গেল উত্তরদিকের সারির উপর। ঠিক তখন সামনের দিকের মেশিনগানার সিগফিয়েড শুল্‌ৎয্‌ চেঁচিয়ে উঠল, 'গোলা আসছে! গোলা আসছে, স্যর!'

ব্যাটা বলে কী! ভাবল ক্যাপ্টেন শুমাখার। দেরি হয়ে গেল তার কর্তব্য স্থির করতে। নিখুঁত লক্ষ্যে পৌঁছে গেল মেশিনগানের ৭.৭ এমএম বুলেটগুলো। কণ্ডোরের উপর অংশে লাগল। প্রথমে বিঁধল ভার্টিকাল স্ট্যাবিলাইজারের গোড়ায়, এরপর পুরো বিমান ফুটো করল বুলেট। কিছু বুঝবার আগেই মারা গেল মেশিনগানার সিগফিয়েড শুল্‌ৎয্‌। ককপিটের ভিতর ভিমরুলের মত গুঞ্জন তুলেছে বুলেট। ঠন-ঠন লাগছে বিমানের ধাতব দেয়ালে। ফিউজেলাজের যেসব জায়গা ফুটো করছে বুলেট, সেখান থেকে ভেসে এল তীক্ষ্ণ হাওয়ার শিস। কো-পাইলটের চাপা আর্তনাদ শুনল শুমাখার। চট্‌ করে ওদিকে চাইল, মুয়েলারের ফ্লাইট জ্যাকেটের বুকে চট্‌ চট্‌ করছে আঠালো রক্ত!

রাডার চেপে ধরল শুমাখার, একইসঙ্গে হ্যাঁচকা টান দিল ইয়োকে, ডাইভ দিয়ে সরে যেতে চাইছে অ্যালাইড এয়ারক্রাফটের কাছ থেকে। ভাবছে, হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হলো বিমানটা!

ভুল দিকে সরতে চেয়েছে শুমাখার।

মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে নৌবহরে যোগ দিয়েছে এমভি

এম্পায়ার ম্যাকঅ্যালপাইন। ওটা তৈরি করা হয় ফসল বহনের জন্য। জাহাজটা আট হাজার টনের। গত পাঁচ মাস ধরে বার্নট আইল্যাণ্ড শিপইয়ার্ডে ওটাকে মডিফাই করা হয়েছে। প্রচুর অদল-বদল আনা হয়েছে সুপারস্ট্রাকচারে। যার ফলে ওটা এখন হয়ে উঠেছে ছোটখাট একটা দ্বীপের মত। চার শ' ষাট ফুটের রানওয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ওটায়। পাশেই হ্যাঙার, তাতে চারটে ফেয়ারলি সোর্ডফিশ টর্পেডো বম্বার। জাহাজ এতই বদলে নেয়া হয়েছে যে প্রয়োজনে ওটা এখনও একই পরিমাণ ফসল বহন করতে সক্ষম। অ্যাডমিরাল্টি সবসময় ভেবেছে তারা ক্যাম ব্যবহার করছে স্বল্প দিনের জন্য, তাদের দরকার অন্যকিছু। এত দিন সেই অন্যকিছু খুঁজেছে বিশেষজ্ঞরা। শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করা হয়েছে মার্চেন্ট এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, বা ম্যাক। ইংল্যাণ্ড এ জিনিস আগে যুদ্ধে নামায়নি, কারণ জাহাজটা এস্কোর্ট করবার কিছু ছিল না তাদের। কিন্তু এখন আমেরিকা থেকে পেয়ে গেছে তারা এসেক্স ক্লাস এস্কোর্ট ক্যারিয়ার।

কনভয়ের উপর ভাসছে কণ্ডোর, কিন্তু ম্যাকঅ্যালপাইন থেকে উঠে এসেছে দুটো সোর্ডফিশ বিমান। প্রথমে রাতের আঁধারে ও-দুটো সরে গেছে কনভয় থেকে, তারপর অ্যাম্বুশ করে বসেছে জার্মান বিমানকে। ফেয়ারলিগুলো বাইপ্লেন, টপ স্পিড কণ্ডোরের অর্ধেক। সোর্ডফিশের তুলনায় অনেক দ্রুত চলে কণ্ডোর, কিন্তু শুমাখার বা তার দলের কেউ টের পায়নি যে, হামলা হতে পারে তাদের উপর। বাইপ্লেন দুটোর রেডিয়াল ইঞ্জিনের কাউলিঙের উপর একটা করে ভিকার্স মেশিনগান, আর পিছনের ককপিটের উপর একটা করে গিমবল্ড লিউস গান।

ফোক-উল্ফ্ এফডাব্লিউ ২০০ কণ্ডোরের তিন হাজার ফুট নীচে তক্কে-তক্কে ছিল দ্বিতীয় সোর্ডফিশ, অন্ধকারে প্রায় অদৃশ্য।

প্রথম বিমানের আক্রমণ থেকে সরে যেতে চেয়েছে কণ্ডোর, আর ঠিক তখনই ফাঁদে পড়েছে দ্বিতীয় বিমানের। ওটার মেশিনগান ছিন্নভিন্ন করতে চাইল বড়সড় বিমানটাকে।

কণ্ডোরের সামনের অংশে প্রচণ্ড স্রোতের মত এসে লাগল ভিকার্সের বুলেট। সোর্ডফিশের দ্বিতীয় গানার ককপিট প্রায় পেরিয়ে বাগিয়ে ধরেছে লিউস গান—লক্ষ্য, কণ্ডোরের পোর্ট উইঙের বিএমডাব্লিউ ইঞ্জিনগুলো।

ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেলের চারপাশে পঞ্চাশ পয়সার সমান অসংখ্য ফুটো দেখা দিল। এক সেকেণ্ডের জন্য মনে হলো অ্যালুমিনিয়ামের দেহ টকটকে লাল হয়ে উঠছে, পরক্ষণে খয়েরী হয়ে আঁধার হয়ে যাচ্ছে। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে শুল্ৎযের কাতর ধ্বনি শুনেছে সে, পরক্ষণে টের পেয়েছে কণ্ডোরের নীচের অংশে এসে লাগছে বুলেট। ভয় পাওয়ার সময়টুকু পায়নি ক্যাপেল, তার আগেই বুঝে নিয়েছে, কর্তব্য পালন করতে হবে তাকে। দু'বার বড় করে ঢোক গিলল সে, খালি খালি লাগল পেট—দ্রুতগতিতে নেমে চলেছে কণ্ডোর। এমজি-ফিফটিনের ট্রিগার পেঁচিয়ে ধরল ওর আঙুল। মুহূর্তে পিছনে পড়ে গেল স্বল্প গতির সোর্ডফিশ, ওটা থেকে ছিটকে আকাশ ভরে তুলল ট্রেসার বুলেটের ঝাঁক।

আক্রমণকারী বিমান লক্ষ্য করে ৭.৯২ এমএম বুলেট ছুঁড়তে শুরু করল ক্যাপেল। সে যেন কোনও ফায়ারম্যান, পানি দিয়ে নিভিয়ে দিতে চাইছে আগুন। বুলেটের আগুনের টুকরো দূর থেকে দূরে গিয়ে আঁধারে মিলিয়ে চলেছে। ফেয়ারলির রেডিয়াল ইঞ্জিন থেকে ভেসে আসছে ফট-ফট আওয়াজ। ওটা লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ শুরু করল ক্যাপেল। তার খেয়াল নেই নিজের বিমান পাথরের টুকরোর মত নীচে পড়ছে, ফিউজেলাজের ভিতর ঢুকছে অজস্র বুলেট।

আকাশের গায়ে বাঁকা লাল টুকটুকে রেখা এঁকে ছুটে চলেছে ক্যাপেলের ৭.৯২ এমএম বুলেট। তারপর হঠাৎ মনে হলো, অ্যালাইড বিমানের নাকের উপর নাচছে আগুনের প্রজাপতি। তা এক সেকেণ্ডের জন্য, এরপর আগুনের বিশাল এক জিভ গ্রাস করল সোর্ডফিশকে। শত শত বুলেটে ছিন্নভিন্ন হলো বিমানের অ্যালুমিনিয়াম ও ফ্যাব্রিক। মনে হলো একটানে ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে প্রপেলার, পরক্ষণে বিস্ফোরিত হলো রেডিয়াল ইঞ্জিন, ফ্র্যাগমেণ্টারি গ্রেনেডের মত চারদিকে ছিটকে পড়ল। জ্বলন্ত ও গরম অকটেন গিয়ে পড়ল পাইলট ও গানারের উপর। এক সেকেণ্ড আগে কণ্ডোরের ডাইভ অনুসরণ করছিল সোর্ডফিশ, তবে এবার আকাশ থেকে খসে পড়ল নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে।

বিমানের অবশিষ্টাংশ সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নামছে দুই ডানা, আঁধার রাতে মনে হলো আকাশ থেকে পড়ছে উল্কাপিণ্ড। ততক্ষণে কণ্ডোরের ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে জ্যাকব শুমাখার। গণ্ডোলা হতে চেয়ে রইল ক্যাপেল, অনেক নীচে চলে গেছে জ্বলন্ত বিমানটা। কয়েক মুহূর্ত পর হঠাৎ আকৃতি বদলে গেল ওটার। ফিউজেলাজ থেকে ছিঁড়ে গেছে দুই ডানা। একটু আগেও সোর্ডফিশে সামান্য এয়ারোডাইন্যামিক ছিল, এখন সেটাও হারিয়ে বসল পুরোপুরি। পাথরের মত আকাশ থেকে পড়তে থাকল জ্বলন্ত ধ্বংসস্তূপ, ক'সেকেণ্ড পর ছ্যাঁৎ করে নিভে গেল সাগরে পড়ে।

এতক্ষণ লড়তে গিয়ে আতঙ্ক ভুলে ছিল ক্যাপেল, কণ্ডোরের পোর্ট উইঙের দূর-কিনারা দেখে শিউরে উঠল—নয় সিলিণ্ডারের ইঞ্জিনগুলো থেকে গলগল করে বেরুচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়া! ভয়ে ঢোক গিলতে শুরু করল ক্যাপেল। বুক ধকধক করছে, প্রতি সেকেণ্ডে বিশ্রী মিসফায়ার করছে ইঞ্জিনগুলো!

'ক্যাপ্টেন!' মাইক্রোফোনে চেঁচিয়ে উঠল সে।

'একদম চুপ, ক্যাপেল!' ধমক দিল শুমাখার। 'রেডিওম্যান, ওখান থেকে উঠে এসো। আমার সাহায্য দরকার। মুয়েলার মারা গেছে।'

'ক্যাপ্টেন, ওই পোর্ট ইঞ্জিনগুলো,' আবারও বলতে চাইল ক্যাপেল।

'হ্যাঁ, জানি! একদম চুপ, গাধা!'

হামলাকারী প্রথম সোর্ডফিশ অনেক পিছনে পড়েছে, সম্ভবত ঘুরে রওনা হয়েছে কনভয়ের দিকে। এখন আর ওটাকে আক্রমণ করবার উপায় নেই ক্যাপেলের। আতঙ্কিত চোখে নিষ্পলক চেয়ে রইল সে, কণ্ডোরের পোর্ট ডানা হতে পিছনে ছুটছে ঘন কালো ধোঁয়া। ইনবোর্ড ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল শুমাখার, আশা করল আগুনের শিখা নিভবে। ঠিক করেছে আপাতত উইণ্ডমিলের মত ঘুরতে থাকুক প্রপেলার, একটু পর আবারও নতুন করে স্টার্টার টিপবে। কিছুক্ষণ পেরিয়ে যাওয়ার পর নতুন করে স্টার্টার টিপল সে। সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের কাউলিং ঘিরে দপ করে জ্বলে উঠল আগুন। দেখতে দেখতে কুচকুচে কালো হয়ে গেল বিমানের দেহের অ্যালুমিনিয়াম।

ইনবোর্ড ইঞ্জিন থেকে দ্রুত গতি পাওয়া অসম্ভব, কাজেই ঝুঁকি নিল শুমাখার, বন্ধ করে দিল বাইরের মোটর। একটু পর আবার যখন স্টার্টার টিপল, চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন। তবে মাঝে মাঝে ওটার ভিতর থেকে ভলকে উঠছে ধোঁয়া। এবার দেরি করল না শুমাখার, বন্ধ করল জ্বলন্ত ইনবোর্ড ইঞ্জিন। আসলে উপায় নেই তার, বেশি ঝুঁকি নিলে আগুন ধরবে কণ্ডোরের ফিউয়েল লাইনে। বাইরের দিকের মোটরও ক্ষতিগ্রস্ত, তবুও ঠিক করেছে যতক্ষণ পারা যায় ইনবোর্ড ইঞ্জিন বিশ্রামে রাখবে। আপাতত পূর্ণ গতিতে চলছে দুটো ইঞ্জিন, তৃতীয়টা অর্ধেক শক্তিতে চলছে। কাজেই

আশা করা যায় নিরাপদে বেসে পৌঁছতে পারবে তারা।

অতি দীর্ঘ দশটি মিনিট পেরিয়ে গেল। বহু কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে তরুণ ক্যাপেল। জানতে চাইছে পরিস্থিতি কেমন। মনে মনে নিজেকে বলল, একটু পর নিশ্চয়ই জানাবেন ক্যাপ্টেন। ঠিক তখনই নতুন একটা আওয়াজ শুরু হলো। ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে চাইল ক্যাপেল, স্ট্রাটের সঙ্গে ঠকাস্ করে ঠুকে গেল মাথা। পিছন থেকে এল জোরাল হুউশ্-হুউশ্ আওয়াজ। যে প্লেক্সিগ্লাস ক্যানোপির ভিতর বসে আছে ক্যাপেল, সেটার উপর ঝরঝর করে পড়ছে কোনও তরল। পরক্ষণে টের পেল হিসাব কষেই কাজটা করেছে ক্যাপ্টেন। তাদের পজিশন থেকে নার্ভিকের বেস পর্যন্ত যত তেল লাগবে, সেটুকু রেখে কণ্ডোরের বাড়তি তেল ফেলে দেয়া হচ্ছে। ক্যাপ্টেন চাইছে বিমান যতটা পারা যায় হালকা রাখতে। ক্যাপেলের গান পজিশনের খানিক উপর রয়েছে ফিউয়েল ডাম্প টিউব।

'ওখানে কী অবস্থা তোমার, ক্যাপেল?' অকটেন ফেলে জানতে চাইল জ্যাকব শুমাখার।

'উম্, ভাল, স্যর,' থমকে থমকে বলল ক্যাপেল। 'ওই প্লেনগুলো কোত্থেকে এল, স্যর?'

'আমিও দেখতে পাইনি।'

'ওগুলো বাইপ্লেন ছিল। গুলি করে একটাকে ফেলে দিয়েছি।'

'বোধহয় সোর্ডফিশ,' বলল শুমাখার। 'অ্যালাইড ফোর্সের আস্তিনে লুকানো নতুন জাদু ওটা। ওগুলো কোনও ক্যাম থেকে আসেনি। রকেটের সাহায্য নিলে বাইপ্লেনের ডানা খসে পড়ত। এখন ব্রিটেনের হাতে নতুন এয়ারক্রাফ্ট ক্যারিয়ার পড়েছে।'

'আমরা কিন্তু কোনও বিমান উড়তে দেখিনি।'

'ওরা বোধহয় আগেই রেইডারে আমাদের দেখেছে। তখনই

আকাশে তুলেছে সোর্ডফিশ। আমরা কনভয় দেখবার আগেই।'

'আমরা কি বেসে খবর দিতে পারি?'

'স্মিট সেই চেষ্টা করছে। এখনও রেডিওতে স্ট্যাটিক ছাড়া কিছু নেই। আধঘণ্টা পর উপকূলে পৌঁছব, তারপর পরিষ্কার রিসেপশন পাওয়ার কথা।'

'আমি আপাতত কী করব, স্যর?'

'স্টেশনে থাকো, চোখ খোলা রাখো। আশপাশে আরও সোর্ডফিশ থাকতে পারে। আমরা এক শ' নটের কম গতিতে চলেছি। ওগুলোর কোনও একটা হামলা করতে পারে।'

'লিউট্যানেণ্ট মুয়েলার আর কর্পোরাল শুল্‌ৎযের কী অবস্থা, স্যর?'

'শুনেছি তোমার বাবা চার্চের ব্রাদার, বা এ ধরনের কিছু?'

'আমার দাদা, স্যর। গ্রামের লুথারান চার্চে রয়েছেন।'

'পরেরবার যখন তাঁকে চিঠি লিখবে, তাঁকে প্রার্থনা করতে বলবে। মুয়েলার আর শুল্‌ৎয্ মারা গেছে।'

এরপর আর কোনও কথা চলল না। আঁধার আকাশে চেয়ে রইল ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেল। তার ভয় লাগছে, আবারও কোনও শত্রু বিমান দেখবে। তবে মনে মনে প্রার্থনা করল, যেন দেখতে না হয়। ভুলে যেতে চাইছে, একটু আগে দু'জন লোককে খুন করেছে। এটা যুদ্ধ, ওই লোকগুলো ওদের সতর্ক না করেই আক্রমণ করেছিল, কাজেই মনের ভিতর পাপ থাকার কথা নয়। কিন্তু শিরশির করছে তার মেরুদণ্ড। এভাবে হাত কাঁপা উচিত নয়। পেটের ভিতর পাকিয়ে উঠছে কী যেন। ভাল হতো, যদি ক্যাপ্টেন ওর দাদার কথা না তুলত। ম্যাক্সিমিলিয়ান জানে দাদা জানলে কী বলবেন। এই জার্মান সরকারকে দেখতে পারেন না তিনি। সব সময় বলেন, 'আমরা বোকামি করে যুদ্ধ শুরু করেছি।'

আর এখন বলবেন, 'দেখো, এই ভুল যুদ্ধ কী করেছে, আমার নাতিকে খুনি বানিয়ে দিয়েছে!'

ম্যাক্সিমিলিয়ান জানে, আর কখনও দাদার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারবে না সে।

'আমি দূরে উপকূল দেখতে পেয়েছি,' চল্লিশ মিনিট পর ঘোষণা দিল শুমাখার। 'কিছুক্ষণ পর পৌঁছব নার্ভিকে।'

কণ্ডোরের উচ্চতা কমিয়ে তিন হাজার ফুটে নিয়ে এসেছে শুমাখার, এক মুহূর্তের জন্য নরওয়ের উত্তর উপকূল দেখা গেল। বিরান এলাকা, দেখতে লাগে কুৎসিত। উপকূলে আছড়ে পড়ছে ফেনায়িত ঢেউ। এখানে-ওখানে রুক্ষ দ্বীপ, তারপর একের পর এক টিলা। ভাঙাচোরা তীর, সেখানে মাঝে মাঝে জেলে-গ্রাম। আদিবাসী মানুষগুলো সামান্য যা উপার্জন করে, তা আসে সাগর থেকেই। কায়ক্লেশে চলতে হয় ওদের।

ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেল টের পেয়েছে, বিমান চলেছে উপকূলের উপর দিয়ে। তাতে খানিক স্বস্তি মিলছে মনে। এটা ঠিক, নীচের পাথুরে জমিতে আছড়ে পড়লে বাঁচবে না, তবুও মরলে সে মাটির উপর মরতে চায়। বিমানের বিধ্বস্ত টুকরো পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে তার দেহাবশেষ। কবর হবে। যে দুই ব্রিটিশ পাইলটকে গুলি করে সাগরে নামিয়েছে, তাদের চেয়ে ঢের ভাল থাকবে। সাগরে পচবে না তার মৃতদেহ।

এমন সময় শেষ তাস খেলল নিয়তি। এতক্ষণ অর্ধেক শক্তি দিয়ে চলেছে পোর্টের আউটবোর্ড ইঞ্জিন, ভারসাম্য রেখেছে বিশাল রিকনিসেন্স বিমানের, কিন্তু এবার কোনও সুযোগই দিল না—থেমে গেল আচমকা। প্রপেলারের কারণে উড়েছে পোড়া বিমান, কিন্তু এবার পাখা বন্ধ হতেই শুরু হলো প্রচণ্ড ড্র্যাগ।

ফ্লাইট ডেকে সর্বশক্তিতে রাডার চেপে ধরল ক্যাপ্টেন

শুমাখার। আশা করল ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে মাটিতে পড়বে না কণ্ডোর। স্টারবোর্ডের ডানা এগিয়ে যেতে চাইল, তার সঙ্গে যোগ দিল পোর্টসাইডের ড্র্যাগ। ফলে যা হয়, অসম্ভব হয়ে উঠল বিমান ভাসিয়ে রাখা। বামদিকে বাঁক নিতে চাইল কণ্ডোর, সেই সঙ্গে চাইল নীচের দিকে ডাইভ দিতে।

প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে গান-মাউণ্টের উপর পড়ল ম্যাক্সিমিলিয়ান ক্যাপেল। ওকে সাপের মত জড়িয়ে নিতে চাইল অ্যামিউনিশন লুপ। নাকে-মুখে বেল্টের চপেটাঘাত খেয়ে ঘোলা হয়ে গেল মাথা। আবছা হলো দৃষ্টি, রক্তের স্রোত ছিটকে বেরুল নাকের দুই ফুটো দিয়ে। আবার ছুটে এল বুলেটের বেল্ট, এবার লাগবে মাথার বাঁ পাশে। তবে আগেই উবু হয়ে বসে পড়ল ক্যাপেল, দু'হাতে ধরে ফেলল পিতলের বেল্ট, শক্ত করে ঠেসে ধরল বাল্কহেডের সঙ্গে।

আরও কয়েক সেকেণ্ড বিমান স্থির রাখতে পারল শুমাখার, তবে টের পেল, হার হচ্ছে এ যুদ্ধে। কণ্ডোরের নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। শুমাখার জানে, যদি নিরাপদে নামতে হয়, তার আগে থ্রাস্ট ও ড্র্যাগকে বাগে আনতে হবে। গ্লাভস পরা হাত দ্রুত নাড়ল সে, পটাপট বন্ধ করে দিল স্টারবোর্ডের ইঞ্জিনগুলো। এবার দ্রুত নামবে বিমান। স্তব্ধ প্রপেলারগুলো পোর্টসাইডে বাড়তি ড্র্যাগ তৈরি করছে। সেটা না হয় সামলে নেবে, তিক্ত হাসল শুমাখার—কিন্তু এখন আর সে বিমানের পাইলটই রইল না, কণ্ডোর হয়ে উঠেছে বিশাল এক গ্লাইডার।

'ক্যাপেল, ওখান থেকে উঠে এসো,' ইণ্টারকমে চেঁচিয়ে উঠল শুমাখার। 'সিট বেল্ট বেঁধে নাও। আমরা ক্র্যাশ করছি।'

বড়সড় এক পাহাড়ের উপর দিয়ে গেল কণ্ডোর। পরক্ষণে পিছনে পড়ল সাগরের সরু এক ইনলেট। ওটার মাথার কাছে

ছোট এক গ্লেসিয়ার। রুক্ষ কালো পাথুরে জমি, তার বিপরীতে ঝিকমিক করছে ধবল তুষার ও বরফ।

কাঁধের স্ট্যাপদুটো খুলে ফেলল ক্যাপেল, ক্রল করে বেরিয়ে আসবে গান পজিশন থেকে, এমন সময় অনেক নীচে কী যেন দেখল। একটা ইনলেটের পাশে গভীর খাদের মত, তার পাশে বিশাল কোনও দালান। খানিক অংশ গ্লেসিয়ারের ভিতর। ওটা হতে পারে প্রাচীন কোনও দালান, এখন ধীরে ধীরে গ্রাস করছে গ্লেসিয়ার। মাত্র দু'সেকেণ্ড দেখতে পেয়েছে ক্যাপেল। নিশ্চিত নয়, তবে মনে হয়েছে, ওটা সত্যিই মস্ত কিছু। হয়তো অনেক আগের কোনও ভাইকিং স্টোরহাউস।

'ক্যাপ্টেন,' অনিশ্চিত স্বরে বলল ক্যাপেল। 'আমাদের পিছনে। ওখানে একটা দালান। মনে হয় বরফে নামা যায়।'

শুমাখার দেখেনি, তবে পিছন দিকে চোখ ছিল ক্যাপেলের। ইনলেটের ওদিক ভাল দেখবার কথা তার। কণ্ডোরের সামনে যতদূর চোখ চলে, এবড়ো-খেবড়ো জমিন। এখানে-ওখানে বরফ ছাওয়া টিলা, একেকটা যেন তীক্ষ্ণধার ছোরা। কণ্ডোর ওখানে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে আণ্ডারক্যারিজ ধসে যাবে। পাথরের স্তর মুহূর্তে ছিঁড়েখুঁড়ে দেবে বিমানের পাতলা দেহ। ফলাফল...!

'তুমি ঠিক দেখেছ তো?' জানতে চাইল শুমাখার।

'ইয়েস, স্যর। গ্লেসিয়ারের এক ধারে। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখেছি। ওখানে কোনও দালান আছে, স্যর।'

ইঞ্জিনগুলোর সাহায্য মিলবে না, কাজেই মাত্র একবার নামবার সুযোগ পাবে শুমাখার। জানে, যদি পাথুরে জমির উপর নামে, সঙ্গে সঙ্গে মরবে ওরা। গ্লেসিয়ারে নামাও সহজ নয়, তবে হয়তো বাঁচা সম্ভব।

দু'হাতে ইয়ক টেনে নিল শুমাখার, নড়তে চাইছে না কণ্ডোর।

ওটাকে ঘোরাতে গিয়ে দ্রুত উচ্চতা হারাতে হলো। গ্লাইড করবার সময় কিছুটা ধীরে নেমেছে বিমান, কিন্তু এবার বনবন করে উল্টো ঘুরছে অল্টিমিটার। এ নিয়ে আফসোস করে লাভ নেই, জানে শুমাখার। এটা সহজ-সরল ফিযিক্স।

আকাশে কাত হয়ে ঘুরছে বিশাল বিমান, খানিক পর পিছনে ফেলে আসা পথে আবার ফিরল—চলেছে উত্তর দিকে। যে পাহাড় গ্লেসিয়ারকে লুকিয়েছে, সেটা এবার সামনে পড়ল। দূরে পরিষ্কার দেখল শুমাখার। নিঃশব্দে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল, জ্বলজ্বল করছে পূর্ণ চাঁদ। পাহাড়ের পায়ের কাছে সাদা বরফের বিস্তৃত গ্লেসিয়ার, দৈর্ঘ্যে অন্তত এক মাইল। ক্যাপেলের সেই দালান চোখে পড়ল না। তাতে কিছু যায় আসে না। বরফের মাঠের দিকে মনোযোগ দিল শুমাখার।

সাগর থেকে ধীরে উঠেছে বরফের প্রান্তর, এরপর অনেক দূর গিয়ে হঠাৎ পাহাড়ের পাশে হয়ে উঠেছে খাড়া দেয়ালের মত। ওটা পুরু বরফের। অনিশ্চিত আলোয় নীলচে লাগছে। দীর্ঘ ইনলেটে ভাসছে ছোট কিছু হিমশৈল।

দ্রুত নেমে চলেছে কণ্ডোর। এইমাত্র ঘুরেছে শুমাখার। অল্টিচ্যুড এত কমে এসেছে যে, যে-কোনও সময়ে আছড়ে পড়বে বিমান। গ্লেসিয়ারের সঙ্গে শেষ মুহূর্তে লাইন আপ করল শুমাখার। পায়ের নীচ থেকে বিদায় নিল পাহাড়ের চূড়া। ওটার কাঁধের পাঁচ ফুট উপর দিয়ে পেরিয়ে এল বিমানের দুই ডানার প্রান্ত। হাজার ফুট-উপর থেকে যে বরফ-প্রান্তরকে মসৃণ মনে হয়েছে, কাছ থেকে দেখে তা মনে হলো, পুরোপুরি এবড়ো-খেবড়ো। যেন ছোট ছোট ঢিবি। ল্যাণ্ডিং গিয়ার নামাল না শুমাখার। যদি ওগুলোর স্ট্রাট ভাঙে, সঙ্গে সঙ্গে পুরো বিমান চরকির মত ঘুরতে শুরু করবে। ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে বিমান ও যাত্রীরা।

'শক্ত করে ধরো!' জানিয়ে দিল শুমাখার। ঢোক গিলতে গিয়ে টের পেল, শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে জিভ।

নিজের পজিশন থেকে উঠে এসেছে ক্যাপেল, নিজেকে আটকে নিয়েছে সিট বেল্টের সঙ্গে। ফ্লাইট ডেকে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে রয়েছে মার্কওয়াল্ড স্মিট। রেডিওর ডায়ালগুলো দুধ-সাদা লাগছে। কাছাকাছি কোনও জানালা নেই, কাজেই এয়ারক্রাফটের ভিতর গাঢ় আঁধার। ক্যাপ্টেনের সতর্কবাণী শুনে উবু হলো ক্যাপেল, দু'হাতে আঁকড়ে ধরল ঘাড়ের পিছনটা। দুই কনুই গুঁজে দিল দুই হাঁটুর ভিতর। এভাবেই ট্রেনিং দেয়া হয়েছে ওদের।

বিড়বিড় করে প্রার্থনা বেরিয়ে আসছে ক্যাপেলের মুখ থেকে।

গ্লেসিয়ারে ধড়াস্ করে নেমে এল কণ্ডোর, পরক্ষণে লাফিয়ে উঠল বারো ফুট। পরেরবার নামল আরও জোরে। বরফের সঙ্গে সংঘর্ষের ধাতব আওয়াজ, যেন কোনও সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে ছুটছে দ্রুতগতির রেলগাড়ি। প্রচণ্ড গতিতে সেফটি স্ট্র্যাপের উপর হোঁচট খেল ক্যাপেল, কুঁকড়ে গেল ভয়ে। নড়বার সাহস নেই। ভাবছে, কোনও ঢিবির উপর লাফিয়ে উঠেছে বিমান! রেডিও ম্যানুয়ালের পাতাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে গেল। বরফে ধাক্কা দিল এক দিকের ডানা। সঙ্গে সঙ্গে কুমারের চাকার মত ঘুরতে শুরু করল বিমান। অ্যালুমিনিয়াম দেহকে খাবলে নিল সুকঠিন বরফ।

ক্যাপেল জানে না, কীসে ভাল হতো। বিমানে থাকা ভাল, নাকি বাইরের পৃথিবীতে? ককপিটে থাকা উচিত ছিল? কিন্তু সেখানেই বা নিরাপত্তা কোথায়—হয়তো এক্ষুণি ছিন্নভিন্ন হবে কণ্ডোরের ককপিট!

ক্যাপেল যেখানে গুটিসুটি মেরেছে, ঠিক তার নীচে বিকট আওয়াজ শুরু হলো। ফিউজেলাজের নীচ থেকে ছিটকে এল

বরফ-শীতল ঝোড়ো হাওয়া। ফরওয়ার্ড গানারের নিরাপদ প্লেক্সিগ্লাসের গণ্ডোলা এক গুঁতো খেয়ে চুরচুর হয়ে ভিতরে ঢুকল। এগিয়ে চলেছে কণ্ডোর, যেন শেভ করছে গ্লেসিয়ারের বুক। বিমানের ভিতর ছিটকে ঢুকছে ধারালো বরফ টুকরো। গতি কমছে না কণ্ডোরের, চলেছে তো চলেইছে, যেন থামবে না কোনদিন।

হঠাৎ সমস্ত শব্দ চাপা পড়ল বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজে। ভয়ানক ভাবে চুরমার হচ্ছে ধাতু, পরক্ষণে নাকে এল বিশ্রী গন্ধ। হাই অকটেন এভিয়েশন ফিউয়েল। ক্যাপেল জানে কী ঘটছে। বরফের ভিতর আটকা পড়েছে একদিকের ডানা, পরক্ষণে ছিঁড়ে গেছে। ক্যাপ্টেন শুমাখার বেশির ভাগ গ্যাসোলিন ফেলে এসেছে, ছিল শুধু চলবার মত। তবে সেটাও লাইনে আগুন তৈরি করতে যথেষ্ট!

দ্রুত গতিতে গ্লেসিয়ারের বুকে পিছলে চলেছে কণ্ডোর, সামনে নিচু হয়েছে বরফের প্রান্তর। এদিকে ধীরে ধীরে কমে আসছে গতি। পোর্ট উইং ছিঁড়ে যাওয়ায় আড়াআড়ি ভাবে চলেছে বিমান। আণ্ডারক্যারিজে আরও ঘষা দিচ্ছে বরফ। দ্রুত কমছে কণ্ডোরের গতি, ওটাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে বরফ।

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল ক্যাপেল। আর কিছুক্ষণ, তারপর থামবে বিমান। মস্ত ঝুঁকি নিয়ে ল্যাণ্ড করেছে ক্যাপ্টেন শুমাখার, এবং জিতেও গেছে। দুই কনুইয়ের ভিতর থেকে হাঁটু বের করে নিল ক্যাপেল, সিটে সোজা হয়ে বসবে, ঠিক তখনই স্টারবোর্ডের ডানা গোড়া থেকে ছিঁড়ে বরফের ভিতর গেঁথে গেল!

ছেঁড়া ডানাকে চেপ্টে দিয়ে চলেছে কণ্ডোর, তারপর চরকির মত ঘুরেই উল্টে গেল! এত দ্রুত ঘটল যে আরেকটু হলে সেফটি বেল্ট ছিঁড়ে ছিটকে পড়ত ক্যাপেল। প্রচণ্ড ব্যথা পেল ঘাড়ে। মুহূর্তে অবশ হলো সারা দেহ।

বেশ কিছুক্ষণ পর টের পেল, ও ঝুলছে উল্টো হয়ে যাওয়া সিটে—চার দিকে অ্যালুমিনিয়াম ও বরফের সংঘর্ষের আওয়াজ আর নেই! থেমে গেছে কণ্ডোর! বনবন করে ঘুরছে ক্যাপেলের মাথা। খুব সাবধানে সিট বেল্ট খুলল সে, আস্তে করে নেমে এল বিমানের ছাতে। পায়ের নীচে কী যেন নরম বাধল। চারপাশে ঘন অন্ধকার। উবু হয়ে জিনিসটা স্পর্শ করল ক্যাপেল, পরক্ষণে ঝট্ করে সরে গেল। একটা লাশ ছুঁয়েছে। আঙুলে চটচট করছে উষ্ণ কী যেন। মুহূর্তে বুঝে গেল, ওটা রক্ত!

'ক্যাপ্টেন শুমাখার?' নিচু স্বরে বলল ক্যাপেল। 'স্মিট?'

জবাবে বিমানের ভিতর বয়ে গেল হু-হু শীতল হাওয়া।

রেডিওর নীচের কেবিনেটটা হাতড়ে দেখল ক্যাপেল, ফ্ল্যাশলাইট পেয়ে জ্বালল। চোখে পড়ল হ্যানসেল মুয়েলারের লাশ। বিমান-হামলা শুরু হওয়ার শুরুতেই মারা যায় সে। আবার ক্যাপ্টেন ও স্মিটকে ডাকল ক্যাপেল। আলো ফেলল উল্টে থাকা ককপিটে। শুমাখার ও স্মিট এখনও ঝুলছে সিটের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায়, হাতগুলো অলস ভাবে দুলছে। মানুষগুলো যেন শিথিল কোনও পুতুল, চোখ খোলা, কিন্তু নড়ছে না!

ক্রল করে কাছে চলে গেল ক্যাপেল, ক্যাপ্টেনের কাঁধে হাত দিয়ে ধাক্কা দিল। মাথা ঝুলছে শুমাখারের, নিষ্প্রভ দুই নীল চোখে পাতা পড়ছে না। লালচে মুখ, উল্টে থাকায় প্রচুর রক্ত জমেছে বুক ও মস্তিষ্কে। আস্তে করে গাল স্পর্শ করল ক্যাপেল। ত্বক এখনও উষ্ণ, তবে টানটান ভাব হারিয়েছে পেশি। দুই গাল থলথলে। রেডিওম্যান/গানার স্মিটের উপর আলো ফেলল ক্যাপেল। সে-ও নেই। স্মিটের মাথা ঠুকে গেছে একটা বাল্কহেডে—ওখানে লেগে আছে এক পোঁচ রক্ত। ক্যাপ্টেন শুমাখারের ঘাড় ভেঙেছে বিমান উল্টে পড়বার সময়।

মাথা ঘোলাটে লাগছে ক্যাপেলের, তবে কিছুক্ষণ পর হঠাৎ টের পেল নাকে আসছে গ্যাসোলিনের কড়া গন্ধ। টলতে টলতে রওনা হলো সে, চলে গেল বিমানের পিছনে। মেইন ডোর ওখানে। ক্র্যাশ করবার সময় মুচড়ে গেছে কণ্ডোরের ফ্রেম। ক'বার কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দেয়ার পর ধুপ্ শব্দে খুলে গেল ধাতব দরজা। হোঁচট খেয়ে বরফের উপর পড়ল ক্যাপেল। পিছনের গ্লেসিয়ারে ছিটিয়ে রয়েছে ফিউজেলাজ ও ডানার অংশ। গভীর, দীর্ঘ দাগ তৈরি করেছে কণ্ডোর, এসে থেমেছে বহু দূরে।

হঠাৎ বিমানে আগুন ধরবে কি না, ঠিক বুঝতে পারছে না ক্যাপেল। তবে জানে, যত দ্রুত সম্ভব বিমান থেকে সরে যেতে হবে। এদিকে গ্লেসিয়ার ছুঁয়ে বইছে বরফ-শীতল হাওয়া। এখানে বেশিক্ষণ থাকলে টিকবে না। মাথা খেলাতে চাইল ক্যাপেল। কিছুক্ষণ পর বুঝল, আকাশ থেকে যে দালান দেখেছে, সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। নইলে... মৃত্যু! ওই বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করবে। যখন নিশ্চিত হবে কণ্ডোর বিস্ফোরিত হবে না, তখন আবারও ফিরবে। কপাল ভাল, ক্র্যাশ করবার সময় নষ্ট হয়নি রেডিও। ওটা যদি কাজ না করে, অন্য ব্যবস্থা রয়েছে। বিমানের লেজের কাছে রাখা আছে ছোট একটা ইনফ্লেটেবল বোট। যদি তীরের পাশ দিয়ে যায়, দু'তিন দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই পড়বে কোনও গ্রাম।

গত এক ঘণ্টা কেমন ভয়ের ভিতর দিয়ে কেটেছে, তা বুকের ভিতর পুঁতে ফেলল সে। পরিকল্পনা ঠিক হতেই খানিক সাহস ফিরেছে মনে। এখন মনোযোগ দিতে হবে আত্মরক্ষার ব্যাপারে। যখন নার্ভিকে নিরাপদে পৌঁছবে, তখন মৃত সঙ্গীদের নিয়ে ভাববে। ওর সঙ্গে কারও বাড়তি খাতির ছিল না। ও সবসময় লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকত। তবুও, মানুষগুলো ছিল একই

দলের।

ব্যথায় দপদপ করছে ক্যাপেলের মাথা-ঘাড়, এপাশ-ওপাশ ফিরাতে পারছে না। দূরের সেই পাহাড়ের দিকে মনোযোগ দিয়ে চাইল সে, তারপর ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করল। ওই পাহাড়ের ওদিকে রয়েছে সরু সেই ইনলেট। ওর জানা নেই এ গ্লেসিয়ার আকারে কী রকম, আর বরফে দূরত্ব বোঝাও কঠিন। ক্যাপেলের মনে হয়েছে গন্তব্য বড়জোর দুই কিলোমিটার, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, পাহাড়ে পৌঁছল না সে। বুটের ভিতর জমে যেতে চাইল আঙুলগুলো। তারপর হঠাৎ শুরু হলো ঝমঝম বৃষ্টি। কোট ভিজতেই বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে গেল বরফ। এক পা এগুলে ঠুস-ঠাস করে পড়ছে বরফ টুকরো, মড়মড় করে ভাঙছে বুটের নীচে।

বহুক্ষণ পর ক্যাপেলের মনে হলো, অনেক তো হলো, আর পারি না—বরং ফিরতি পথ ধরি, ঢুকি গিয়ে ওই কণ্ডোরের ভিতর। তারও অনেক পরে গ্লেসিয়ারের ধারে দেখল সেই দালান—এক অংশ বরফে ঢাকা। আরও কাছে চলে যাওয়ার পর আবছা আঁধারে মোটামুটি দেখা গেল ওটাকে। শীত লাগছে ওর, কিন্তু তার চেয়ে বেশি শিউরে উঠল ভিন্ন কারণে। সামনে ওটা কোনও দালান নয়!

বিশাল এক জাহাজের বো'র সামনে গিয়ে থেমেছে ক্যাপেল। ওটা পুরু কাঠ দিয়ে তৈরি, বেশির ভাগ অংশ তামা দিয়ে মোড়া। জাহাজের একদিকের অংশ চাপা পড়েছে গ্লেসিয়ারে। ক্যাপেল জানে অতি মন্থর গতিতে নড়ে গ্লেসিয়ার। কাজেই আন্দাজ করতে পারল, হয়তো কয়েক হাজার বছর আগে আটকা পড়েছে এ জাহাজ! আগে কখনও নিজ চোখে এ ধরনের কিছু দেখেনি ক্যাপেল। হঠাৎ একটা কথা মনে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে আনমনে মাথা নাড়ল। তা-ই কি হয়? ...কিন্তু, হতেও তো পারে? আগে এ

জাহাজের ছবি দেখেছে ও। ঠাকুরদা'র বাইবেলে। স্কেচ করা ছবি। এর সঙ্গে ছিল এক দীর্ঘ উপাখ্যান। যখন ছোট ছিল, ওকে পড়ে শোনাতেন দাদা। ওটা ছিল ওল্ড টেস্টামেন্টের অংশ। ক্যাপেলের মনে পড়ে, ওই গল্পে বলা হয়: সেই জাহাজের দৈর্ঘ্য ছিল এক শ' কিউবিট, চওড়ায় ছিল পঞ্চাশ কিউবিট, উঁচু ছিল তিরিশ কিউবিট!

'সে-জাহাজে একজোড়া করে প্রতিটি প্রাণী তোলেন নূহ্ নবী!'

এটাই কি সেটা?

দুই

তিন দিন হলো পুরনো লক্কর-ঝক্কর ফ্রেইটারটা নোঙর ফেলেছে অ্যাশকেলন নেভি বেসের বাইরে। বেশিরভাগ ফ্রেইটার ব্যবহার করে না এ বন্দর। তাই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে ওটাকে ইজরায়েলি নেভি। একটু আগে নেভাল বেস থেকে রওনা হয়েছে এক আর্মড প্যাট্রল বোট, তরতর করে চলেছে পাঁচ শ' ফুটি জাহাজটির দিকে।

এ ফ্রেইটারের নাম, দ্য লর্ভেমা অভ সগ্রি। রেজিট্রেশন হয়েছে তাইওয়ানে। জ্যাক স্টাফ থেকে ল্যাগ-ব্যাগ করছে ময়লা লাল-নীল পতাকা। নীলের জমিতে সাদা সূর্য, এখন হয়ে উঠেছে খয়েরী। জাহাজটা দেখলে বোঝা যায়, যৌবনে জেনারেল কার্গো ভেসেল ছিল, এখন বদলে নিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে কণ্টেইনার শিপ হিসাবে। ডেকের উপর থম মেরে হুকুমের প্রতীক্ষায় রয়েছে

পাঁচটি কার্গো বুম, একেকটা যেন ডাল ভাঙা গাছ। সামনের ডেকে তিনটে বুম, পিছনে দুটো। প্রতিটা ঘিরে ঝলমল করছে সব কন্টেইনার। সেগুলোর মিছিল শেষ হয়েছে গিয়ে ব্রিজের জানালার নীচে। ডেকে অজস্র কন্টেইনার, তবুও উঁচু হয়ে ভাসছে জাহাজ। ম্যাক্সিমাম-লোড নেয়ার দাগটা পানির পনেরো ফুট উপরে রয়েছে। এই অংশটা টুকটুকে লাল অ্যান্টিফাউলিং রং করা। জাহাজের নীল খোলে রঙের পোচ পড়েনি বহু দিন। আরেকটু উপরে ফ্যাকাসে সবুজ ও খয়েরী ছোপ। নানা রঙে বিশ্রী লাগছে জাহাজটাকে। কালিঝুলি দিয়ে ভরা চিমনি জোড়া। সত্যিকারের রং বুঝবার উপায় নেই। দুই চিমনি থেকে বেরিয়ে আসছে ছাই রঙের ধোঁয়া, স্থির হচ্ছে জাহাজের মাথার উপর। চারদিকে এক ফোঁটা বাতাস নেই।

লর্ভেমার ফ্যানটেইল থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে ধাতব পাটাতন, তার শেষ প্রান্তে ব্যস্ত কর্মীরা। গায়ে গ্রিজ মাখা কভারল, ঘামে ভেজা। মেরামত হচ্ছে ফ্রেইটারের রাডার বেয়ারিং।

কাছাকাছি চলে এসেছে ইজরায়েলি প্যাট্রল বোট, ওটার ক্যাপ্টেন বা এনসিও দু'হাতে মুখের সামনে তুলে ধরল মেগাফোন। 'অ্যাহয়, লর্ভেমা!' তারপর ইদ্দিশ ভাষায় এল ঘোষণা: 'আপনাদের জানানো যাচ্ছে, আমরা আপনাদের জাহাজে উঠব।' দ্বিতীয়বার একই বক্তব্যে ইংরেজি ব্যবহার করল হাগ্যাই এলফেনবেইন। মেরিটাইম ট্রেডে ইংরেজিকে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে মেনে নিয়েছে সবাই।

কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, তারপর ডেকে বেরিয়ে এল এক মোটা লোক, চলেছে গ্যাংওয়ের দিকে। লোকটার শার্টের বগল জবজব করছে ঘামে। এক অধস্তনের দিকে চেয়ে মাথা দোলাল সে। এবার জাহাজের পাশে নামতে লাগল সরু সিঁড়ি।

ডেকে উঠতে গিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে চাইল হাগ্যাই। ভাবছে, এ লোকের কাঁধে আবার ক্যাপ্টেনের এপোলেট! বিরক্ত বোধ করছে সে। নোংরার হদ্দ কোথাকার! ভদ্র পোশাক পর্যন্ত পরতে শেখেনি। আর দেখবার মত একটা পেটও বানিয়েছে হারামজাদা: উপচে পড়েছে বেল্টের দশ ইঞ্চি নীচে। সাদা ক্যাপের পাশে সাদা পাকা চুল। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শুধু জেহোভা জানেন, কেন এ লোককে চাকরিতে রাখা হয়েছে।

হাগ্যাইয়ের এক লোক প্যাট্রল বোট থেকে .৫০ ক্যালিবারের মেশিনগান বাগিয়ে ধরেছে। হাগ্যাই ইশারা করল আরেকজনকে। গ্যাংওয়ের সঙ্গে বোট বেঁধে ফেলল সে। আরেক সৈন্য জাহাজে উঠছে, দু'হাতে ধরেছে উজি সাবমেশিনগান। একবার আলতো করে হোলস্টারের ফ্ল্যাপ স্পর্শ করল হাগ্যাই, তারপর রেইলিং টপকে নামল ডেকে। এবার পিছু নিল বোটের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড। উস্কোখুস্কো চুল গোছাতে চাইছে জাহাজের ক্যাপ্টেন, তারপর ডলে ঠিক করতে চাইল কোঁচকানো শার্ট। এ কাজেও সফল হলো না সে।

ডেকের চারপাশে চাইল হাগ্যাই এলফেনবেইন। এখানে-ওখানে জাহাজের প্লেটিং খসে আসছে। শুধু জেহোভা জানেন কতদিন হলো এক পোচ রং চড়ে না জাহাজে। খোল ও ডেকে পুরু মরিচা। তবে কন্টেইনারগুলো ঝকঝকে নতুন। নিশ্চয়ই ক'দিন আগে তোলা হয়েছে, নইলে এ জাহাজের নাবিকরা ওগুলোর বারোটা বাজিয়ে দিত। এদের কর্তব্যজ্ঞান বলতে যদি কিছু থাকত! রেইলিঙের এখানে-ওখানে পাত নেই, সেসব জায়গা আটকেছে শিকল দিয়ে ঘায়ের মত জং দগদগ করছে সুপারস্ট্রাকচারে। একবার চাইলে মনে হয় এখুনি বুঝি সব খসে পড়বে।

বিরক্তি চেপে রাখল এলফেনবেইন, চৌকশ ভাবে খটাস করে স্যালিউট দিল ক্যাপ্টেনকে। খসখস শব্দে মোটা পেট চুলকে চলেছে ক্যাপ্টেন, তড়িঘড়ি স্পর্শ করল ক্যাপের বিল। ওটাই তার পাল্টা সালাম।

'ক্যাপ্টেন, আমি লেফটেনেণ্ট এলফেনবেইন, ইজরায়েলি নেভি। ইনি সাব-লেফটেন্যাণ্ট জিল গোল্ডবার্গ।'

'আসুন, দ্য লর্ভেমা অভ সগ্রিতে আপনাদের স্বাগতম,' বলল মোটা ক্যাপ্টেন। 'আমি অ্যালারিকো সেবাস্তিয়ান। আমি...'

কথা শেষ হবার আগেই এক লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল লেফটেন্যাণ্ট। কথার সঙ্গে ভক্ ভক্ করে অতি জঘন্য পচা দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে ক্যাপটেনের মুখ দিয়ে।

তাছাড়া স্প্যানিশ উচ্চারণের ইংরেজি এতই বিদঘুটে যে অতি কষ্টে বক্তব্য আন্দাজ করে নিল হাগ্যাই। তার চেয়ে তিন ইঞ্চি উঁচু সেবাস্তিয়ান, কিন্তু লোকটার দুই কাঁধে চর্বির তাল, পেটের টানে মেরুদণ্ড এমন বেঁকে গেছে, তাকে দেখতে লাগছে হাগ্যাইয়ের সমান। চোখের মণিদুটো কুচকুচে কালো, জ্বলজ্বল করছে। হাগ্যাইয়ের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করবার সময় হাসল সে, বেরিয়ে এল এবড়ো-খেবড়ো হলুদ দাঁতের সারি। একটু আগে মুখ দিয়ে যে ভয়ানক দুর্গন্ধ বেরুল, আন্দাজ করল হ্যাগাই, তা স্রেফ পচা দুধ থেকেই আসা সম্ভব।

'স্টিয়ারিং গিয়ারে কীসের সমস্যা?' জানতে চাইল সে।

কাকে যেন স্প্যানিশে অভিশাপ দিল ক্যাপ্টেন, ধীরে মাথা নাড়ল। 'বেয়ারিং বিগড়ে গেছে। এক মাসে এই নিয়ে তিনবার। জাহাজের মালিক হলো ফকিরের বাচ্চা ফকির! শিপইয়ার্ডে কাজ করাতে দেবে না। আমার নিজের লোকদেরকেই ঠিক করতে হবে। কথা ছিল দু'দিন আগে বন্দর ছাড়ব। হলো না। দেখি

আগামী কাল যেতে পারি কি না।'

'কোথায় যাবেন? সঙ্গে কীসের কার্গো?' বাতাসের দিকে নাক ফিরিয়ে জানতে চাইল সে।

ডানহাত তুলে একটা কণ্টেইনারে চড়াৎ করে চাপড় দিল ক্যাপ্টেন। 'খালি বাক্স। সবগুলো। লর্ভেমা এর বেশি আর কী পাবে।'

'আপনার কথা বুঝলাম না,' বলল হাগ্যাই।

'আমরা ইতালি থেকে ফাঁকা কণ্টেইনার নিই, পৌছে দিই হং-কঙে। ভরা কণ্টেইনার আসে, আনলোড করা হয়, কণ্টেইনার পড়ে থাকে ডকে। আবার ওগুলো তুলে নিই আমরা, নিয়ে যাই হং-কঙে। আবার রিলোড হয়।'

এবার বোঝা গেল জাহাজ কেন এত হালকা, ভাবল হাগ্যাই। খালি কণ্টেইনারের ওজন বড়জোর কয়েক টন। 'আর ফিরে আসবার সময় কী বহন করেন?'

'টুকটাক যা পাওয়া যায়, খরচ উঠলেই হলো,' তিক্ত শোনাল সেবাস্তিয়ানের কণ্ঠ। 'এমন কিছু থাকে না যে কেউ বীমা করবে।'

'আপনার ক্রু ম্যানিফেস্ট দেখব, সেই সঙ্গে কার্গো ম্যানিফেস্ট ও জাহাজের রেজিস্ট্রেশন।'

'কোথাও কোনও সমস্যা?' চট্ করে জানতে চাইল ক্যাপ্টেন।

'আগে আপনার কাগজ দেখি, তারপর জানতে পারব ঝামেলা আছে বা হয়েছে কি না,' ফালতু লোকটাকে ভড়কে দিতে চাইছে লেফটেন্যান্ট হাগ্যাই। বুঝল, সফল হয়েছে। 'আপনার জাহাজ কিন্তু ইজরায়েলি পানিতে। কাজেই জাহাজের প্রতিটা ইঞ্চি তল্লাসী করতে পারি, যদি চাই।'

'নো প্রোবলেমা, সেনোর,' সেবাস্তিয়ানের কথা থেকে গলে পড়ছে ঘি। হাসতে চাইল, তবে মনে হলো ভেংচি কাটছে। 'এই

গরমে দাঁড়িয়ে আছেন, আমার অফিসে চলুন।' একহাতে দেখিয়ে দিল সুপারস্ট্রাকচার।

এ বছর সত্যিই গরম পড়েছে। তার উপর আজ এক ফোঁটা হাওয়া নেই। স্টিলের ডেক হয়ে উঠেছে তপ্ত তাওয়া। এসব হচ্ছে ওই গ্রিন হাউসের বদ খেয়ালে।

'পথ দেখান,' প্রায় ধমকে উঠল হাগ্যাই।

দ্য লর্ভেমা অভ সগ্রির বাইরের অবস্থা যেমন, ঠিক তেমনই অভ্যন্তর। মেঝে থেকে উঠে গেছে লিনোলিয়াম, দেয়ালগুলো ন্যাংটো লোহার, এখানে-ওখানে নতুন রঙের পোচ। ছাতে জ্বলজ্বল করছে ফ্লুরেসেন্ট বাতি, কোনওটার শেড নেই। বেশ কয়েকটা জ্বলছে-নিভছে। প্যাসেজের সেসব জায়গা ছায়াচ্ছন্ন।

লেফটেন্যান্ট হাগ্যাই ও সাব-লেফটেন্যান্ট গোল্ডবার্গকে নিয়ে সরু কমপ্যানিয়ানওয়ে দিয়ে চলেছে অ্যালারিকো সেবাস্তিয়ান। পাশেই নড়বড়ে রেইলিং। ওটা পেরিয়ে সামনে পড়ল খাটো এক করিডোর। একটা দরজার সামনে থামল ক্যাপ্টেন, ওটা খুলে হাতের ইশারা করল। হাগ্যাই ও গোল্ডবার্গের পর নিজে ঢুকল অফিসে। ঘরের আরেক দিকে হাঁ করা এক দরজা। কেবিনের ভিতর অংশ চোখে পড়ছে। নোংরা বিছানা, বদলানো হয় না চাদর। এক প্রান্ত মেঝের উপর, তাতে জুতোর হিলের কাদাটে দাগ। একদিকের দেয়ালে বোল্টু দিয়ে আটকানো ড্রেসার। ওটার উপর আয়না, কোনাকুনি ফাটা।

ক্যাপ্টেনের অফিস আয়তাকার, একদিকের দেয়ালে একটা পোর্টহোল। ওখানে এত্র লবণ জমেছে যে কাঁচের ওপাশে চোখ চলে না। চার দেয়ালে ঝুলছে কিছু পোস্টার, নানা ভঙ্গি নিয়ে প্রায়-উলঙ্গ রমণী। দুই ছবির মাঝে এক সরু দরজা, খোলা। ওপাশে ছোট্ট টয়লেট। এমনই নোংরা যে ঢাকার পাবলিক টয়লেট

হার মানবে। অফিসে প্রচুর সিগারেট ফোঁকা হয়, সবকিছুতে লেপ্টে রয়েছে জঘন্য, বদ গন্ধ। হাগ্যাইয়ের মনে হলো তিতা লাগছে জিভ। সে নিজে ধূমপায়ী, কিন্তু এই ক্যাপ্টেন শালা বোধহয় গাঁজাও টানে।

ডেস্কের পাশে থামল ক্যাপ্টেন, ল্যাম্প জ্বালতে চাইল। সুইচ টিপতেই ছিটকে উঠল স্পার্ক। তবে মনে হলো বাতি জ্বলে ওঠায় সে খুশি। এবার ডেস্কের পিছনে নিজ আসনে ধপ্ করে বসে পড়ল। গুঙিয়ে উঠল চেয়ার। দুই পরিদর্শকের জন্য দুটো চেয়ার দেখিয়ে দিল সেবাস্তিয়ান।

শার্টের পকেট থেকে কলম বের করল হাগ্যাই, ওটা দিয়ে খুঁচিয়ে চেয়ারের উপর থেকে ফেলে দিল এক তেলাপোকার লাশ, তারপর সাবধানে বসল চেয়ারে; ভাবছে, ছারপোকা নেই তো?

ডেস্ক হাতড়াতে শুরু করেছে সেবাস্তিয়ান, দু'সেকেণ্ড পর হাতে তুলে নিল মদের বোতল। জুলজুল করে চাইল দুই অফিসারের দিকে। বিড়বিড় করে স্প্যানিশে কী যেন বলে বোতল রেখে দিল। 'অ্যাঁ? হ্যাঁ, এই তো পাওয়া গেছে ম্যানিফেস্ট।' হাগ্যাইয়ের দিকে বাইণ্ডার বাড়িয়ে দিল সে। 'যা বলছিলাম, আমরা কন্টেইনার ছাড়া কিছুই সঙ্গে নিই না। খালি হাতে ফিরতে হয় হং-কঙে।' একে একে বাইণ্ডারগুলো ডেস্কের উপর রাখছে সে। 'এটা আমার ক্রুদের ম্যানিফেস্ট। সব ক'টা অলসের হাড্ডি। আপনারা যদি দু'চারটাকে ধরে জেলে ভরতে চান, আমি খুশিই হবো। আর এগুলো লর্ভেমার রেজিস্ট্রেশনের কাগজ।'

ক্রুদের নামের লিস্ট পড়ছে হাগ্যাই। নোটবুকে কিছু তথ্য তুলে নিল। আরেকবার পরীক্ষা করে দেখল ক্রুদের জাতীয়তা ও পরিচয়-পত্র। জাহাজে তাইওয়ানিজ, চিনা, ইন্দোনেশিয়ান, ভারতীয়, বাংলাদেশি ও ইতালিয়ান নাবিক রয়েছে। এদের

কয়েকজনকে দেখেছে হাগ্যাই, লোকগুলো রাডার নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ক্যাপ্টেন নিজে স্পেনের বার্সেলোনার লোক। অরিয়ন-ওশন শিপিং অ্যাণ্ড ফ্রেইটারের সঙ্গে ঝুলে আছে গত বারো বছর ধরে। লর্ভেমার ক্যাপ্টেন হিসাবে ছয় বছর। একটু বিস্মিত হয়েছে হাগ্যাই, ভাবতে পারেনি লোকটার বয়স মাত্র পঁয়তাল্লিশ। দেখলে মনে হয় প্রায় ষাট।

সন্দেহ করবার মত কিছু পাওয়া গেল না। তবে হাগ্যাই ঠিক করেছে, পুরো জাহাজটা তল্লাসী করবে।

'এখানে বলা হয়েছে আপনারা আট শ' সত্তরটা কণ্টেইনার নিয়ে চলেছেন।'

'কমবেশি ওরকমই।'

'সব হোল্ডে রেখেছেন?'

'ডেকে যা আছে, সেগুলো ছাড়া বাকি সব।'

'আমি আপনাকে অপমান করতে চাই না, ক্যাপ্টেন, কিন্তু এ ধরনের জাহাজ কণ্টেইনার বহনের উপযুক্ত নয়। আমার ধারণা আপনার হোল্ডে আরও বেশি কিছু আছে। লুকিয়ে রেখেছেন। আমি ছয় হোল্ড ঘুরে দেখব।'

'নিশ্চয়ই দেখবেন, স্যর, যতক্ষণ আমার স্টিয়ারিং গিয়ার ঠিক না হয়, ততক্ষণ আমার কোনও কাজ নেই।' আরেকটু কুঁজো হয়ে বসল ক্যাপ্টেন। 'আপনি তো পুরো জাহাজ ঘুরে দেখতে চান? ওখানে লুকানোর কিছু নেই।'

হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল দরজা। এক চাইনিজ নাবিক ঢুকল, পরনে কভারঅল। ঝড়ের মত ক্যাণ্টোনিজ বলে চলেছে। তারই ফাঁকে কাকে যেন অভিশাপ দিল সেবাস্তিয়ান, অবিশ্বাস্য গতিতে চেয়ার থেকে টেনে তুলল ভারী শরীরটা। সতর্ক হয়ে উঠেছে দুই ইজরায়েলি, হোলস্টারের উপর চলে গেছে হাত।

তাদেরকে পাত্তাই দিল না সেবাস্তিয়ান, প্রায় দৌড়ে চলেছে। কে ভাববে এ লোকের ওজন হবে দুই শ' আশি পাউণ্ডের বেশি! মাত্র টয়লেটের দরজার কাছে গেছে, এমন সময় প্লামিঙের ভিতর থেকে ভয়ানক কাশির আওয়াজ শুরু হলো। থমকে দাঁড়াল মোটকু ক্যাপ্টেন, ঠাস্ করে দরজা বন্ধ করে দিল। কিন্তু যা ঘটবার ঘটে গেছে আগেই। বিচ্ছিরি আওয়াজ তুলেছে কমোড, সিলিঙে গিয়ে ছিটকে লেগেছে নোংরা হলুদ পানি। এবার নতুন ও ভয়ানক এক গন্ধ পাওয়া গেল স্রেফ দোজখ হয়ে উঠল এই বদ্ধ অফিস-ঘর।

'খুবই দুঃখিত, স্যর,' কাঁচুমাচু হয়ে বলল সেবাস্তিয়ান। 'আমাদের এই ফু-চুং সেপটিক সিস্টেম ঠিক করছে। তবে ওটা এখনও ঠিক হয়নি।'

ঊর্ধ্বতন অফিসারকে কানে কানে ইদ্দিশে বলল গোল্ডবার্গ, 'এরা যদি সত্যিই কিছু লুকিয়ে রেখে থাকে, আমার মনে হয় না সেটা খুঁজে পাওয়ার জন্য আমাদের জান দেবার দরকার আছে।'

'ঠিক,' বলল এলফেনবেইন। 'মেডিটারেনিয়ানে স্মাগলার নেই।' ক্যাপ্টেন সেবাস্তিয়ানের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে চাইল সে। চাপা স্বরে বলল, 'দেখছি জাহাজ ঠিক করতে জীবন দিচ্ছেন, ক্যাপ্টেন। ...আপনার কাগজ-পত্র ঠিকই আছে। আর আপনার সময় নিতে চাই না।'

'যা আপনাদের ইচ্ছা,' বিনয়ের সঙ্গে বলল সেবাস্তিয়ান। এক ভুরু উঠেছে কপালে। 'আপনারা চাইলে ঝটপট জাহাজটা ঘুরিয়ে দেখাতে পারি।'

উঠে দাঁড়াল হাগ্যাই এলফেনবেইন। 'তার আর কোনও প্রয়োজন দেখছি না।'

'ঠিক আছে,' দুই অফিসারকে পিছন থেকে প্রায় তাড়া করে অফিস থেকে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন। ফিরতি পথে চলেছে তারা।

প্রায়ান্ধকার হলওয়ে পেরিয়ে এল। মধ্য আকাশে জ্বলছে আগুনের গোলা, কফিনের মত সুপারস্ট্রাকচার থেকে বেরিয়ে অন্ধ হয়ে গেল প্রত্যেকে। কয়েক সেকেণ্ড পর সামলে নিল ওরা। অনেক দূরে চোখে পড়ল এক সুপারট্যাঙ্কার, হোল্ডগুলো টইটম্বুর ক্রুড অয়েলে। বোধহয় চলেছে সাইপ্রাসের দিকে।

গ্যাংপ্ল্যাঙ্কের মুখে থামল হাগ্যাই, নাক কুঁচকে করমর্দন করল ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। কড়া স্বরে বলল, 'কাল সকালের মধ্যে যদি স্টিয়ারিং ঠিক না হয়, আপনি অ্যাশকেলনের বন্দর কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করবেন। নেভি চায় না কেউ আমাদের বেসের এত কাছে থাকুক।'

'আশা করি সুস্থ হয়ে উঠবে এই বেটি,' একটু রাগ নিয়ে বলল সেবাস্তিয়ান। 'বুড়ি লর্ভেমার নাড়ির ভিতর এখনও অনেক প্রাণশক্তি।'

সন্দেহ নিয়ে একবার জাহাজের চারপাশে চাইল হাগ্যাই, তারপর গোল্ডবার্গ ও সৈন্যকে নিয়ে নেমে চলে গেল প্যাট্রল বোটে। ক্রুদের উদ্দেশে মাথা দোলাল লেফটেন্যান্ট। গ্যাংপ্ল্যাঙ্ক থেকে খুলে নেয়া হলো দড়ি, দ্রুতগতিতে রওনা হয়ে গেল বোট। দু'পাশে ছড়িয়ে গেল প্রপেলারের ঢেউ, মাথার উপর ফেনা।

রেইলিঙে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে সেবাস্তিয়ান, তবে নেভির কেউ ঘুরেও চাইল না তার দিকে। বামহাতে ভুঁড়ি চুলকে চলেছে সে। দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল বোট। এরপর সুপারস্ট্রাকচার থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। ক্যাপ্টেনের চেয়ে অনেক কম বয়স তার, বড়জোর তিরিশ। হাঁটছে ক্ষিপ্র চিতার মত। থামল সেবাস্তিয়ানের পাশে এসে।

'ভাল বুদ্ধি করেছিলি,' মৃদু হাসছে যুবক। 'মনে হলো একেবারে ছিটকে বেরিয়ে গেল ব্যাটারা প্রাণ হাতে নিয়ে।'

'তাই মনে হলো?' সঙ্গীকে নিয়ে সুপারস্ট্রাকচারের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে ক্যাপ্টেন। ইজরায়েলি নেভি বেসের কাছের অংশ এখান থেকে কম করে হলেও এক মাইল। ওদিকে আর চাইল না ক্যাপ্টেন, নিশ্চিন্ত। দুই পাটি দাঁতের পিছন থেকে বের করে আনল মেডিকাল গজ। ফোলা গাল সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ হয়ে গেল। ক্যাপ খুলতেই ওটার সঙ্গে উঠে এল তেলতেলে উইগ। এবার তাকে তরতাজা যুবক মনে হলো। আসল চুল চমৎকার ভাবে ছাঁটা। খোঁচা-খোঁচা দাড়িগুলো অবশ্য তার নিজেরই। তিন দিন শেভ করেনি। হয়তো আবারও প্রয়োজন পড়তে পারে অ্যালারিকো সেবাস্তিয়ান সাজার।

'শুনলাম প্যানিক বাটন টিপেছিস,' বলল সোহেল আহমেদ। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার সে। ট্রেনে বামহাত কাটা পড়বার পর তাকে সরিয়ে নেয়া হয় অ্যাকটিভ এসপিয়োনাজ থেকে। তবে অফিসে বসবার মন ওর কখনও ছিল না। আজকাল সুযোগ পেলেই প্রিয় বন্ধু মাসুদ রানার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে দুর্ধর্ষ সব অ্যাসাইনমেন্টে।

এ জাহাজে বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ক্যাপ্টেনের রয়েছে একটা কন্ট্রোলবক্স, ডেস্কের নীচে। তাতে রয়েছে বেশ কিছু সুইচ। তারই একটা ডেকে আনে লিউ ফু-চুংকে। একটু আগে সে ছিল কপাল-পোড়া এক ইঞ্জিনিয়ার, প্লামিঙের পাম্প চালিয়ে ঠিক করছিল নষ্ট কমোড। ওই পাম্প ব্যবহার করলে আগ্নেয়গিরির লাভার মত ছিটকে ওঠে কমোডের পানি। তাতে এমন কেমিক্যাল মেশানো, বেরোয় ভয়ানক দুর্গন্ধ।

'হাগ্যাই এলফেনবেইন শার্লক হোম্স্ হতে চাইল,' বলল মাসুদ রানা। 'তাকে অনিচ্ছুক না করে উপায় কী?'

'তোর কী মনে হয়, আবার আসতে পারে?'

'কাল সকাল পর্যন্ত এখানে বসে থাকলে, আসতেও পারে।'

'অতএব আজ রাতেই সব কাজ সারতে হবে,' একটু গম্ভীর হয়ে গেল সোহেল।

দুই বন্ধু থেমেছে একটা ইউটিলিটি ক্লজিটের সামনে। দরজা খুলতেই দেখা গেল ঝাড়ু, মপ ও ক্লিনিঙের নানা জিনিস। তবে কখনও ব্যবহার হয় না এসব। দুটো ঝাড়ু খানিক সরাতেই দেয়ালের গা থেকে উঠে এল গোল এক ডায়াল, মনে হলো ওটা কোনও সিন্দুকের। নির্দিষ্ট সংখ্যা ঘোরাতেই ক্লিক শব্দে খুলে গেল তালা, সরে গেল দেয়াল। সামনে চমৎকার কার্পেটে ঢাকা হলওয়ে। গাঢ় মেহগনি প্যানেল দু'পাশের দেয়ালে। নির্দিষ্ট দূরত্বে ঝাড়বাতি, বিলিয়ে চলেছে নরম আলো।

আবারও শিপিং টাইকুন চ্যাণ্ড্রো পাপাগোপালার কাছ থেকে মার্ভেলকে ধার নিয়েছে মাসুদ রানা, জরুরি এক অ্যাসাইনমেণ্টের জন্য। জাহাজটা বাইরে থেকে যা মনে হয়, আসলে মোটেই তা নয়। বর্তমান নামটা পর্যন্ত নকল। বো এবং স্টার্নে যে নাম, সেই অক্ষরগুলোকে ধরে রাখছে চুম্বক। সত্যিকার নাম দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস। মস্ত জাহাজ ব্যবসায়ী চ্যাণ্ড্রো পাপাগোপালা এটা নিজের জন্য তৈরি করিয়েছিলেন, কিন্তু কখনও ব্যবহার করেননি। কিছুদিন আগে যখন বিসিআইয়ের চিফ রাহাত খানের পরামর্শে তাঁর কাছে একটা আধুনিক জাহাজ চাইল মাসুদ রানা, এটাই তিনি ঘুরিয়ে দেখান। বলেন, 'তুমি আধুনিক জাহাজ চাইছ। তোমাকে দেব অত্যাধুনিক জাহাজ! কিন্তু তার বদলে...'

তখনই ঠিক হয়, প্রশান্ত মহাসাগরে যারা একের পর এক তাঁর সুপারট্যাঙ্কারগুলো ছিনতাই করছে বা ডুবিয়ে দিচ্ছে, তাদের শায়েস্তা করবে রানা। বিনিময়ে মার্ভেলকে যে-কোনও সময় যে-কোনও প্রয়োজনে ধার নিতে পারবে ও। সে-সময় এ জাহাজের

বাইরের অংশ পাল্টে ফেলা হয়। মার্ভেলে আগেই ছিল ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিন, যা জাহাজটাকে প্রায় উড়াতে সক্ষম। যোগ করা হয় স্ট্যাবিলাইযিং ফিন। এরপর মজবুত করা হয় বো, যাতে সহজে চলতে পারে বরফ ভেঙে। সাধারণ ওয়্যারিং ও যন্ত্রপাতি ফেলে বসানো হয় কয়েক শ' কিলোমিটারের বিশেষ ওয়্যারিং ও সফিস্টিকেটেড ইলেকট্রনিক্স। যোগাড় করা হয় মিলিটারি-গ্রেড রেইডার ও বারোটা ক্লোজড সার্কিট টেলি ক্যামেরা—সব নিয়ন্ত্রণ করে মাইক্রো সিস্টেমস্ সুপারকম্পিউটার।

সংযুক্ত হয় নানান ধরনের অত্যাধুনিক অস্ত্র। যোগ করা হয় দুটো টর্পেডো টিউব ও একটি ১২০ এমএম কামান। সঙ্গে এম১এ১ অ্যাব্রাম্স্ ব্যাটল্ ট্যাঙ্কের টার্গেটিং সিস্টেম। তিনটে জেনারেল ইলেকট্রিক ২০ এমএম গ্যাটলিং গান কেনা হয়। ভার্টিক্যাল লঞ্চের জন্য থাকে সারফেস-টু-সারফেস অ্যান্টিশিপ মিসাইল। এ ছাড়া ডেকের উপর ঝালাই করা এক ড্রামের ভিতর থাকে .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগান। জার্মানরা যেভাবে কে বোটে লুকিয়ে রাখত অস্ত্র, সেভাবে সব লুকানো হয় জাহাজের খোলে। দূর থেকে রিমোট-কন্ট্রোলের সুইচ টিপে প্রতিটি অস্ত্র ব্যবহার করা যায়।

জাহাজে আরও চমকের ব্যবস্থা রেখেছে রানা। একটা ফোর-প্যাসেঞ্জার রবিনসন ও আর-৪৪ হেলিকপ্টার আছে। পিছনের এক হোল্ডের ভিতর ওটার হ্যাঙার। ডেকের উপর হেলিপ্যাড উঠে আসে হাইড্রোলিক্যালি। জাহাজের অভ্যন্তরে বিশেষ কয়েকটি কামরায় রাখা হয় ছোট ছোট জলযান। ওখান থেকেই সাগরে নামানো যায় জোডিয়াক ও সিল অ্যাসল্ট বোট। এ ছাড়া মার্ভেলে তৈরি করা হয় বিশাল এক সুইমিং পুল বা মুন পুল। ওখান থেকে

প্রয়োজনে সাগরে নামাতে পারে মিনি-সাবমার্সিবল।

এরপর মার্ভেলের প্রস্তুতি শেষে জাহাজে ওঠে একদল প্রশিক্ষিত ক্রু। তারা কোনও জাহাজ কোম্পানির লোক নয়, বেশির ভাগ এসেছে বাংলাদেশ নেভি থেকে। তারপর জাহাজে ওঠে বিভিন্ন দেশের কয়েকজন সুপার-স্পাই। তারা সবাই রওনা হয় এক রুদ্ধশ্বাস অভিযানে।

'স্বর্ণ বিপর্যয়ে'র সেই অসমসাহসিক অভিযানে রানার সঙ্গে যারা মার্ভেলে ছিল, তাদের প্রায় সবাই এবারও এসেছে—নতুন আরেক অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে। নতুন মুখও আছে সঙ্গে।

প্যাসেজওয়ে পেরিয়ে কনফারেন্স রুমে ঢুকল মাসুদ রানা ও সোহেল আহমেদ। একটু আগে এখানে মিটিং চলছিল। ওরা যেইমাত্র সেকেণ্ডারি রেইডারে দেখেছে ইজরায়েলি প্যাট্রল বোট, কনফারেন্স রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেছে রানা। চটজলদি বনে গেছে ক্যাপ্টেন অ্যালারিকো সেবাস্তিয়ান।

এ মুহূর্তে ফ্ল্যাট-প্যানেল টেলিভিশনের স্ক্রিনে লেজার পয়েন্টার তাক করেছে লিউ ফু-চুং। সে কোনও প্লামার নয়, বাস্তবে চিনা সিক্রেট সার্ভিসের সেরা এজেন্টদের অন্যতম। অতুলনীয় এক রত্ন, জটিল সব মিশন সফল হয়েছে শুধু তার সহজ-সরল পরিকল্পনার জন্য।

প্রকাণ্ড কনফারেন্স রুমে ফু-চুং সহ রয়েছে ভারতীয় সিক্রেট সার্ভিসের তীক্ষ্ণধী স্পাই অনিল চ্যাটার্জী। কম্পিউটার জিনিয়াস বলা যায় তাকে। ঘরে সে ছাড়া রয়েছে ইন্দোনেশিয়ান নেভাল ইন্টেলিজেন্সের লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার উর্বশী দাশা। সাব-মার্সিবল পরিচালনার উপর ব্রিটিশ নেভির সার্টিফিকেট রয়েছে তার। এরপর রয়েছেন পাইলট হিসাবে বাংলাদেশ এয়ার ফোর্সের ক্যাপ্টেন (অবঃ) আলম সিরাজ, বিমান ও হেলিকপ্টার বিশেষজ্ঞ।

আরও রয়েছে অস্ত্রের ডিলার রানার বন্ধু ভিনসেন্ট গগল, লেবানিজ আর্মি ইন্টেলিজেন্সের সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট আতাসি, হল্যাণ্ডের ডাক্তার ফারা রাইনার ও দুর্ধর্ষ ছ'জন বাংলাদেশি কমাণ্ডো।

রানা পাশে বসতেই নিচু স্বরে বলল উর্বশী দাশা, 'ওখানে কী হলো, ইজরায়েলিদের তাড়িয়ে দিলে স্রেফ মুখের দুর্গন্ধ দিয়ে?' সে মার্ভেলের অপারেশন্স ডেপুটি ডিরেক্টর। লিউ ফু-চুং অন্য কাজে ব্যস্ত থাকলে কমাণ্ডোদের নেতৃত্ব দেবে।

'সত্যি দুঃখিত,' আসল দাঁতগুলোর উপর থেকে প্লাস্টিকের খাপ সরিয়ে নিল রানা, ও-দুটো চলে গেল প্যান্টের পকেটে। আরেক পকেট থেকে বেরুল মিন্ট লজেন্স, ফেলল মুখে। মেইন ডেকে যাওয়ার আগে লিমবার্গার পনির চিবিয়ে গিয়েছিল। চেয়ারে হেলান দিল এবার, মৃদু স্বরে বলল, 'বোধহয় মুখের দুর্গন্ধ আসল না, মনে হয় আমার ইংরেজির ধাক্কা সহ্য করতে পারেনি।'

মৃদু হেসে ফেলল ফারা রাইনার ও উর্বশী। দু'জনই অপূর্ব সুন্দরী ও যার যার কাজে অত্যন্ত যোগ্য। তবে এখনও তাদের ভিতর কোনও বিরোধ দেখা যায়নি।

দুই রূপসীর উল্টো দিকে বসেছে মার্ভেলের চালক, ভিনসেন্ট গগল। পরিচিতরা জানে, অদ্ভুত কঠোর মনের মানুষ সে, কিন্তু বন্ধুদের জন্য যে কোনও সময় প্রাণ দিতে প্রস্তুত। একবার মুখ দিয়ে কিছু বললে তা করেই ছাড়ে, সবসময়।

তার পাশে বিশালকায় আতাসি, মার্ভেলের চিফ কমিউনিকেশন্স অফিসার। কমাণ্ডো হিসাবে অত্যন্ত দক্ষ, মাসুদ রানার একটি কথায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে আগুনে। আরেকটা কাজে দক্ষ, প্রায় যে-কোনও তালা, তা সাধারণ হোক বা ইলেকট্রনিক, কয়েক সেকেণ্ডে খুলতে পারে।

রানার এক পাশে বসেছে সোহেল আহমেদ। রানা জাহাজে

না থাকলে এ দলের দায়িত্ব বর্তায় তার উপর। ও যখন অ্যাকটিভ এসপিয়োনাজে ছিল, রানা আর ওকে বলা হতো, পাকিস্তানের ব্রাইটেস্ট এজেন্ট।

'রানা কি ফিরেছে?' স্পিকার-ফোনে বলে উঠল গম্ভীর এক কণ্ঠ। সিকিওর চ্যানেলে বিসিআই হতে যোগাযোগ করেছেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান।

'জী, স্যর। ফিরেছি।'

'ইজরায়েলিরা কিছু সন্দেহ করছে, রানা?'

'খুব বেশি নয়, স্যর। ওদের নেভাল বেসের কাছেই থেমেছি। আশপাশে দু'চারটে জাহাজও আছে।'

'তোমরা যদি ফিরে আসতে চাও, কেউ কিন্তু দুষবে না,' বললেন রাহাত খান। 'আমরা জানি এটা সুইসাইডাল মিশন, কিন্তু...'

'আমরা কাজ শেষ না করে ফিরছি না, স্যর,' বলল রানা।

ও জানল না, তাঁর নিজ হাতে গড়া প্রিয় শিষ্যের কথা শুনে গর্বে বুক ফুলে উঠেছে বৃদ্ধ জেনারেলের।

বেশ কিছু দেশের সিক্রেট সার্ভিস চিফ ভরসা করছেন রানা ও তার বন্ধুদের উপর। কেউ কেউ পাঠিয়েছেন তাঁদের সেরা এজেন্টকে।

উপায়ই বা কী তাঁদের!

আজ থেকে এক মাস বারো দিন আগে খবর শুনে চমকে ওঠেন তাঁরা। তার তিন দিন আগে মাসুদ রানার মাধ্যমে ভয়ঙ্কর এক পশ্চিমা পরিকল্পনার কথা জানতে পারেন রাহাত খান। তখন লস অ্যাঞ্জেলেসে ছিল রানা, রানা এজেন্সির কাজে। হঠাৎ ওর অফিসে এসে ঢুকল কমপিউটার জাদুকর রায়হান রশিদ, হাতে মোটা এক ফাইল, কুঁচকে রেখেছে ভুরু।

'কী নিয়ে এলে?' জানতে চাইল রানা। খেয়াল করেছে, দু'দিন ধরে অফিসে কেমন যেন অস্বাভাবিক আচরণ করছে রায়হান রশিদ। চোখ-মুখ কী যেন বলতে চায়, আবার চেপেও যায়। রানার আন্দাজ, হয়তো বিয়ে করতে চলেছে ছোকরা।

'জানি সব শুনলে আমাকে কান ধরে রানা এজেন্সি থেকে বের করে দেবেন আপনি, মাসুদ ভাই,' বলল রায়হান। 'কিন্তু... সেটা কী ঠিক হবে?'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ ওর মুখ দেখল মাসুদ রানা, তারপর মৃদু হেসে বলল, 'খুলে বলো কী বিষয়!'

আস্তে করে রানার সামনে ফাইলটা নামিয়ে রাখল রায়হান। 'একবার পড়ে দেখুন কী দারুণ বিষয়।'

'গল্প লিখেছ?'

'ঠিক তা নয়। ওটা পেন্টাগনের ফাইল, মাসুদ ভাই। ইজরায়েল ও পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য তৈরি করা।'

'আবারও হ্যাকিং শুরু করেছ, রায়হান?' কড়া ধমক দেয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে রানা।

'এই একটু আর কী!' কানের লতি চুলকাতে লাগল রশিদ।

'তার মানে আবারও পিছনে লাগবে সিআইএ, এরপর সত্যিই খুন হয়ে যাবে তুমি ওদের হাতে!'

'তাতেও কষ্ট নেই, মাসুদ ভাই। একবার কাগজগুলো পড়ে দেখুন।'

রায়হান রশিদকে হাতের ইশারায় বসতে বলল রানা, চোখ বোলাতে শুরু করল প্রথম পৃষ্ঠার উপর। দু'মিনিট পেরুনোর আগেই চমকে উঠল। বুঝতে শুরু করেছে, ও পড়ছে এক ভয়ঙ্কর পরিকল্পনার নীলনক্সা।

এ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে ইজরায়েলকে দেয়া হবে দুটো

ট্রাইডেন্ট ইলেভেন সাবমেরিন। সঙ্গে দশটা ইন্টারকণ্টিনেন্টাল ইউজিএম ওয়ান-থ্রি-থ্রি ডি-ফাইভ ট্রাইডেন্ট ইলেভেন ব্যালেস্টিক মিসাইল। এসব বিনামূল্যে ইজরায়েলকে দান করছে আমেরিকা। এক মাস দশ দিন পর ইজরায়েলের নেভি বেস অ্যাশকেলন-এ পৌঁছবে এসব অস্ত্র। ততদিনে ইজরায়েল নেভির দুই গ্রুপ অফিসার ও নাবিক প্রশিক্ষিত হয়ে উঠবে ইউএস নেভাল বেসে।

এবার একের পর এক পৃষ্ঠা পড়তে শুরু করল রানা। একটু পর টের পেল, শুকিয়ে গেছে জিভ।

ফাইলের মূল বক্তব্য:

বেশি কিছু করতে হবে না ইজরায়েলকে। তারা শুধু দুটো করে আণবিক বোমা ফেলবে পাঁচটা দেশের উপর। তেহরানকে দিয়ে শুরু হবে, তারপর একে একে আরও চারটি তেলসমৃদ্ধ দেশের উপর। বদলে তেল আবিব পাবে ক্রুড অয়েলের ভাগ। এদিকে কিছু দেশে উস্কে দেয়া হয়েছে বিরোধী দলগুলোকে। যেমন হয়েছে মিশর, লিবিয়া ও সিরিয়ায়। পরবর্তী সময়ে এসব দলকেও শায়েস্তা করা হবে। মোটকথা অস্থির করে তোলা হবে গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে। এরপর যা করবার করবে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আরও কয়েকটি পশ্চিমা দেশ। সৌদি আরব, কুয়েত সহ অন্যান্য আরব দেশে একই সঙ্গে নামবে লক্ষ লক্ষ শ্বেতাঙ্গ সৈনিক। চাপের মুখে থাকা নড়বড়ে সরকারগুলো কিছু বুঝবার আগেই আধুনিক অস্ত্রের জোরে কেড়ে নেয়া হবে খনিগুলোর কর্তৃত্ব। সোজা কথায়, বেদখল হয়ে যাবে তেল-সমৃদ্ধ আরব বিশ্ব। পশ্চিমাদের রুখতে চাইবে রাশা, চিন ও ভারত; কিন্তু পিছিয়ে যেতে হবে তাদেরকেও। হুমকির মুখে থাকবে তারা নিজেরাও। পশ্চিমা বিশ্ব ক্রুড অয়েলের চালান বন্ধ করলে মুখ থুবড়ে পড়বে তাদের অর্থনীতি।

এ পরিকল্পনায় বিশদ পরিসংখ্যান দেখানো হয়েছে। বলা হয়েছে, ইরাক, আফগানিস্তান ও লিবিয়ায় যে অবস্থা তৈরি করা গেছে, ঠিক তেমনই করা হবে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি দেশে। বর্তমান বিশ্বে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তাতে এখনই সঠিক সময় পশ্চিমা দেশগুলোর গোটা পৃথিবীর অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কব্জায় আনার। নির্লজ্জ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কোনও দেশের জনগণ বিরোধিতা করতে চাইলে কীভাবে দমন করা সম্ভব। এতে বেশ কিছু শ্বেতাঙ্গ সেনাও মারা পড়বে, কিন্তু সেই মৃত্যুর বদলে তাদের দেশ পাবে আগামী কয়েক শ' বছরের অকল্পনীয় সমৃদ্ধি। শ্বেতাঙ্গ ছাড়া অন্য বর্ণ ও জাতির মানুষ কাটাবে ক্রীতদাসের জীবন।

পুরো ফাইল পড়বার পর রায়হানের দিকে চাইল রানা। শুধু এটুকু বলল, 'তুমি আমাদের সেফ হাউসে চলে যাও, তোমাকে যত দ্রুত সম্ভব আমার সঙ্গে দেশে ফিরতে হবে।'

'আমি কিন্তু ধরা খাইনি, মাসুদ ভাই,' হেসে ফেলল রায়হান। 'ওরা জানে না আমি হ্যাক করেছি।'

'তবুও।'

পরদিন রায়হান রশিদকে নিয়ে আমেরিকা ত্যাগ করল রানা। তার আগেই সিকিওর্ড ই-মেইলে বিসিআই-এ পাঠিয়ে দিয়েছে ওই ফাইল।

এরপর এশিয়ার শক্তিশালী কয়েকটা দেশ সফর করেন মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান। বেইজিঙে গোপন একটি মিটিং হয়। তাতে যোগ দেন বেশ কিছু দেশের সিক্রেট সার্ভিস চিফ। শুরু হয় প্রতিরোধ পরিকল্পনা প্রণয়ন। মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের পরামর্শে একটি গোপন মিশনের কথা ওঠে। ঠিক হয় সুপার-স্পাইদের একটি দল গঠন করা হবে। এবার বিসিআই

চিফ তুখোড় কয়েকজন এজেন্টের কথা তোলেন। আলোচনায় ঠিক হয়, 'মিশন ইজরায়েল'-এ যোগ দেবে সংশ্লিষ্ট এজেন্টরা। সিক্রেট সার্ভিসগুলোর প্রধানদের সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়, এসব এজেন্টদের দলনেতা হিসাবে থাকবে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুর্ধর্ষ এজেন্ট মাসুদ রানা। তার দলের কাজ ইজরায়েলি সাবমেরিন হামলা নস্যাৎ করা। এই মিশন সফল হওয়ার পর পরই পশ্চিমা দেশগুলোর সরকার প্রধানকে জানানো হবে, তাদের হীন ও নোংরা পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেছে। এবং সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে এশিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী।

এ মুহূর্তে ইজরায়েলি নেভি বেস অ্যাশকেলন-এ হাজির হয়েছে মাসুদ রানা, সোহেল আহমেদ, লিউ ফু-চুং, অনিল চট্টোপাধ্যায়, উর্বশী দাশা, আতাসি ও কর্তব্যপরায়ণ ক'জন বাঙালি কমাণ্ডো। এ ছাড়া রয়েছে বাংলাদেশ নেভির দক্ষ অফিসার ও নাবিকরা। রানার অনুরোধে এসেছে ভিনসেন্ট গগল ও ডক্টর ফারা রাইনার। জাহাজে উঠবার পর তারা জেনেছে যদি এ মিশন সফল না হয়, শুরু হবে পৃথিবী জুড়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

স্পিকার-ফোনে বলে উঠলেন রাহাত খান, 'তোমরা কখন রওনা হবে, রানা?'

'ঠিক মাঝ রাতে, স্যর।'

'বেশ, মিশন শেষ হলে জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা বলব আমি,' বললেন চিফ। 'গুড লাক বয়েজ অ্যাণ্ড গার্লস।'

কেটে গেল ফোন লাইন।

ভিনদেশি এজেন্টরা একটু গম্ভীর হলো। কেউ কেউ ভাবছে, বোঝাই যাচ্ছে, রানা ও সোহেলের জন্য কী পরিমাণ চিন্তিত ওদের বস। এভাবেই কি উদ্বিগ্ন হন আমার চিফ? না বোধহয়!

এ ঘরের সবাই ইতিমধ্যে জেনেছে, আগামীকাল অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে আলাপ করবেন বিসিআই চিফ রাহাত খান। উনি কথা বলে টের পেয়েছেন, আমেরিকান সরকার কী ঘটাতে চলেছে, এখনও জানেন না নুমার চিফ। কাজেই রানাদের যদি কোনও সাহায্য প্রয়োজন পড়ে, তা মিলতে পারে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন তথা নুমার কাছ থেকে।

'আশা করি কালকে এ সময়ে আমরা পাঁচ শ' মাইল দূরে,' বলল কমাণ্ডোদের একজন। 'চলেছি সুয়েজ খাল পেরিয়ে জিব্রাল্টার প্রণালীর দিকে।'

'না-ও হতে পারে,' আপত্তি তুলল বাংলাদেশ নেভির কট্টর অফিসার লেফটেন্যান্ট সানজিদা স্বর্ণা। ভাল কবিতা লেখে সে, কিন্তু তার চেয়ে ভাল পারে বেয়াড়া লোকদের পেটাতে। তটস্থ হয়ে রয়েছে পুরুষ কমাণ্ডোরা, খুব একটা কথা বলছে না। কে চাইবে মান খোয়াতে! 'শেষ খবর অনুযায়ী মেডিটারেনিয়ানে রয়েছে আমেরিকান আটলাণ্টিক ফ্লিটের এক অংশ।'

আস্তে করে মাথা দোলাল ফু-চুং। 'মিথ্যা নয়।'

'ওরা আমাদের থামাতে চাইবে? কেন?' প্রথমবারের মত মুখ খুলল ডক্টর ফারা রাইনার।

'তুমি তাদের প্রিয় দোসরের সর্বনাশ করবে, আর তারা সহজে ছেড়ে দেবে তোমাকে?' বলল সোহেল। 'তা ছাড়া, এই মিশন সফল হলে গালে চড় খাবে আমেরিকা ও তার বন্ধু দেশগুলো।'

নৈঃশব্দ্য নামল ঘরে।

'কারও কোনও প্রশ্ন?' খানিক পর জানতে চাইল রানা।

'ডেকের কন্টেইনার, রানা,' বলল সোহেল। 'আমরা ওগুলো সন্ধ্যার পর খুলে নেব, না অপারেশন শেষে? আরেকটা ব্যাপার, রং এবং অন্য ক্যামোফ্লেজের কী ব্যবস্থা?'

মার্ভেলের ডেকে যে কন্টেইনার, প্রতিটি নকল। সহজেই ভাঁজ করে রেখে দেয়া যায় মাত্র একটি হোল্ডে। জাহাজের খোলে যে নীল ও অন্য রং, সব পরিবেশ-বান্ধব পিগমেন্ট, চাইলেই ফায়ার-সাপ্রেশন ওয়াটার ক্যানন দিয়ে ধুয়ে নামিয়ে দেয়া যায়। ওসব রঙের নীচে লুকিয়ে রয়েছে অন্য রঙের পোঁচ। যে-কেউ দেখলে ভাববে, গত তিরিশ বছরে অন্তত পাঁচবার মালিকানা বদল হয়েছে এ জাহাজের। এবং কেউ যত্ন নেয়নি এটার। তবে আসল কথা হচ্ছে, ওই রং অত্যন্ত দামি এক ধরনের কোটিং। ওটা ফাঁকি দিতে পারে রেইডারকে। চিনের তৈরি এ জিনিস আমেরিকার স্টেলথ ফাইটার বিমানে ব্যবহার করা জিনিসের সম মানের।

এ ছাড়া মার্ভেলের বিভিন্ন অংশে যোগ করা হয়েছে ধাতব পাত, সেগুলো আকৃতি বদলে দিয়েছে জাহাজটির। এই মিশন শেষে মার্ভেলের বো থেকে নামিয়ে নেয়া হবে হালকা একটা খাপ। ওটা অন্য আঙ্গিক দিয়েছে জাহাজকে, দেখলে মনে হয় বো'র মুখ সুঁচালো। এরপর সরিয়ে নেয়া হবে জোড়া চিমনি। তার বদলে বসিয়ে দেয়া হবে পেট-মোটা এক চিমনি। ওটাই আবার রক্ষা করবে মেইন রেইডার ডোমগুলো। আপাতত সেসব রাখা হয়েছে জাহাজের ভিতর। শেষে ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক ভরে নিলেই টইটম্বুর হয়ে উঠবে মার্ভেল, দেখে মনে হবে মালামালে ঠাসা।

ক্রুদের সবাই চার ঘণ্টা খাটলে উধাও হবে দ্য লর্ভেমা অভ সগ্রি, বদলে হয়ে যাবে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস। এক মুহূর্ত ভাবল রানা, তারপর বলল, 'আজ রাতে চাঁদের কত অংশ উঠবে, গগল?'

'চার ভাগের এক ভাগ।' জাহাজের ন্যাভিগেটর ও ওয়েদার-ম্যান গগল। 'মিটিওরলোজিক্যাল রিপোর্ট অনুযায়ী মাঝ রাতের পর আকাশে থাকবে মেঘ।'

'তা হলে মাঝ রাতের পর কাজে নামুক ক্রুরা। আমরা ফিরব রাত দুটোর দিকে। তাও চার ঘণ্টা হাতে থাকবে জাহাজ পাল্টে নেয়ার জন্য। যদি নেভাল বেসে কোনও মস্ত ভুল করি, তা হলে তোমরা সবাই আগের মত করে নেবে জাহাজটা। ...কারও কোনও প্রশ্ন?'

কয়েকজন আস্তে করে মাথা নাড়ল। শুরু হলো খসখস আওয়াজ, সবাই প্ল্যানের কাগজ গুছিয়ে নিচ্ছে।

'রাত এগারোটার সময় মুন পুলে থাকব আমরা,' বলল রানা। 'যে যার ইকুইপমেণ্ট চেক করে নেব। মিনি-সাব নামানো হবে বারোটার আগে। যদি তার পরে রওনা হই, জোয়ার-ভাটার ফাঁদে পড়ব।' উঠে দাঁড়াল ও, একবার সবার উপর চোখ বুলিয়ে নিল। 'প্রতিটা ডিপার্টমেণ্টের হেড খেয়াল করো, বিশেষ করে শোর অপারেশন্স...' গগল ও অনিলের দিকে চাইল। 'জানি তোমরা পূর্ণ সতর্ক থাকবে। তারপরও, আমরা যদি ব্যর্থ হই, দেরি না করে উধাও হয়ে যাবে জাহাজ নিয়ে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল অনিল। 'আমাদের পরিকল্পনা খারাপ নয়। আশা করা যায় মসৃণভাবেই চলবে সব।'

'আমারও তাই আশা,' মৃদু স্বরে বলল রানা।

তিন

চট্ করে ভেঙে গেল রানার অগভীর ঘুম। বোর্ডরুমের কনফারেন্স থেকে বেরিয়ে নিজের কেবিনে ফিরে প্রথমেই সেবাস্তিয়ানের পোশাক খুলে সাবান মেখে স্নান সেরেছে, তারপর সন্ধে পর্যন্ত জরুরি কাজগুলো শেষ করেছে একের পর এক। ঠিক সাড়ে সাতটায় মোস্তফা আবুলের ডাক পেয়ে ডিনার খেয়ে নিয়েছে সবার সঙ্গে বসে। তারপর সোজা বিছানায়। মহাবিপদের দিকে চলেছে, তবে এ নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই—ঘুমিয়ে পড়েছে এক মিনিট পেরুনোর আগেই।

ওর কোনও অ্যালার্ম ঘড়ির দরকার পড়ে না, ঠিক তিন ঘণ্টা পর জেগে উঠেছে। আর পঞ্চাশ মিনিট পরেই ডাক পড়বে মুন পুলে।

বিছানা ছেড়ে সোজা বাথরুমে ঢুকল রানা, শাওয়ার নেবে। ইলেকট্রিসিটির অভাব নেই মার্ভেলে, সারাক্ষণই চালু থাকে গিজার। শাওয়ার খুলে গা-পোড়ানো গরম পানির নীচে দাঁড়াল রানা, তবে তা মাত্র দু'মিনিটের জন্য। আরেকটা বোতাম টিপতেই নামল বরফ-ঠাণ্ডা পানির বর্ষণ। তিন মিনিট পর তোয়ালে দিয়ে শুকিয়ে নিল দেহ, শেভ করে নিল চটপট। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফ না থাকায় নিজেকে ভদ্রলোক মনে হলো। পোশাক পরে এসে ঢুকল বেডরুমে।

ঠিক তখনই সুইটের দরজায় টোকা পড়ল। পরক্ষণে খুলে

গেল দরজা, নিঃশব্দে ঢুকল মার্ভেলের বাবুর্চি মোস্তফা আবুল। হাসি মুখে বলল, 'আপনার মিডনাইট কফি, স্যর।'

বাংলাদেশ নেভির বাবুর্চি ছিল, রিটায়ার করেছে কিছুদিন আগে—রান্নার উপর ডিপ্লোমা কোর্স করেছে অস্ট্রেলিয়ান এক কুকিং কলেজ থেকে। কঞ্চির মত চিকন এক লোক, গোঁফ দেখে মনে হয় বদমেজাজি কোনও জেনারেল। পরনে সর্বক্ষণ কালো কোট, সুতির সাদা শার্ট—কখনও কোঁচকানো দেখা যায় না। কাহিনি বলার ওস্তাদ, জাহাজে কে কী করছে, কার মনে কী চলছে সব খুঁটিনাটি তার নখদর্পণে। একটু সুযোগ পেলেই একজনের কথা জানিয়ে দেয় আরেকজনকে।

'ডেস্কের উপর নামিয়ে রাখুন,' বেডরুম থেকে বলল রানা। পাশেই ওর ছোট্ট স্টাডিরুম। এটা সাজানো হয়েছে দামি হোটেলের ঘরের মত। স্টাডিরুমের চার দেয়াল ও সিলিঙে কালচে মেহগনির প্যানেল, ডেস্ক ও কেবিনেটগুলো সেগুনকাঠের। একদিকের দেয়ালে বিশাল এক ছবি, ভয়ঙ্কর ঝড়ের ভিতর দিয়ে চলেছে অকুতোভয় জাহাজ।

রুপোর ডিশগুলো ডেস্কে নামিয়ে রাখল মোস্তফা। ঢাকনি খুলে ফেলল সে। তার হিরোকে কখনও শুধু কফি দেয় না সে। সঙ্গে রয়েছে অমলেট, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, পাউরুটির টোস্ট আর মোটাসোটা এক টুকরো বিফ স্টেক। কেবল রান্না করেই নয়, পরিবেশন করেও আনন্দ পায় রন্ধনশিল্পী। গন্ধে ম-ম করে উঠল সুইট। ট্রের পাশেই রেখেছে রেড ওয়াইন। প্রায় ছুটে এল রানা।

চেয়ারে বসে স্টেকে কাঁটাচামচ গাঁথতেই বলল আবুল, 'জলিল খানের শেষ খবর জানেন, স্যর?' কমাণ্ডো জলিল খানের কথা উঠলেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মোস্তফার চেহারা।

'জানি না তো।'

'আর্জেণ্টিনার মেয়েটি এখনও ইন্টারনেটে যোগাযোগ রাখছে। জলিল খান প্রথমে ভেবেছে ওই মেয়ে তাঁর জীবনের শেষ প্রেম, তবে এখন সন্দেহ করছে, সে আসলে মেয়েই নয়!' প্রায় ফিসফিস করল বাবুর্চি।

মুচকি হাসল রানা। ডেস্কের পিছনের অ্যান্টিক সেফ খুলছে।

'মন ভেঙে গেছে জলিল খানের। কাসেম বক্সের কাছে সেই মেয়ের বা লোকের—যাই হোক—একটা ছবি দেখেছি। তার ধারণা ফোটোশপ দিয়ে বানানো হয়েছে ছবি। চ্যাট রুমে কপাল খুলছে না জলিল খানের।'

সিন্দুকের ভারী দরজা খুলে ফেলল রানা। ভিতরে নানা ধরনের অস্ত্র। মার্ভেলের আর্মারির পাশেই সাউণ্ডপ্রুফ শুটিং রেঞ্জ, তবে রানা নিজের অস্ত্রগুলো এ ঘরে রাখে। সিন্দুকে রয়েছে মেশিন পিস্তল, অ্যাসল্ট রাইফেল ও বিভিন্ন হ্যাণ্ডগান।

'ডক্টর রাইনারের কাছে গেছে এবার জলিল খান। ছবি দিয়ে বলেছে, একবার দেখুন তো এ ছেলে না কি মেয়ে...' বলে চলেছে মোস্তফা।

ওয়ালথার তুলে নিল রানা, একবার চেম্বার চেক করে কোমরে গুঁজে রাখল। স্টেক শেষ, দু'কামড় অমলেট নিল এবার। টের পেল শিরার ভিতর দ্রুত চলছে রক্ত। আনমনে প্রশ্ন করল, 'ডক্টর রাইনার কী বললেন?'

'মন্তব্য করেননি। এখন কথা হচ্ছে জলিল খান কী করবে।'

উঠে দাঁড়াল রানা।

'সন্দেহ ঢুকে গেছে মানুষটার মনে। কাশেম বক্স অবশ্য সাহস যোগাচ্ছেঃ তুই চালিয়ে যা, জলিল। কোনও ভয় করবি না। আমরা তোর পিছনে আছি। তুই মরলে নিজ হাতে কবরে শুইয়ে দেব।'

'তাই বলেছে?'

'জী, স্যর।' ডিশগুলো ট্রে-তে তুলে নিল বাবুর্চি। 'বুঝলেন স্যর, কাশেম বক্সের মন পাথরের মত শক্ত। গর্ব করে বলে, কখনও কোনও মেয়ের প্রতি দুর্বল হয়নি।' দরজার কাছে গিয়ে ঘাড় ফেরাল মোস্তফা। 'স্যর, সকালে কী নাস্তা দেব?'

তার মূল বক্তব্য: স্যর, আপনারা সহি সালামতে ফিরে আসুন, আমার তৈরি সেরা ব্রেকফাস্ট তৈরি থাকবে।

'কিছু দিয়ো।'

প্রায় একই সঙ্গে সুইট থেকে বেরিয়ে এল মোস্তফা আবুল ও রানা। বাবুর্চি বাঁক নিল গ্যালির দিকে। বামদিকের করিডোর ধরল রানা। এলিভেটরে উঠে তিনতলা নেমে এল, দরজা খুলে যেতেই সামনে পড়ল বিশাল এক গুহার মত ঘর। ফ্লাডলাইটে জ্বলজ্বল করছে চারপাশ। সাগর থেকে আসছে নোনা জলের গন্ধ। একটু দূরে প্রকাণ্ড এক সুইমিং পুল, এখন খালি। তার পাশেই শক্তিশালী ক্রেন। ওটা থেকে ঝুলছে সাবমারসিবল, ডিসকভারি-১০০০। জিনিসটা দৈর্ঘ্যে পঁয়ষট্টি ফুট। পাইলট, কো-পাইলট সহ ওটার ভিতর আঁটে ছ'জন। বো'র দিকে রয়েছে তিনটে পোর্টহোল, সঙ্গে আর্মার্ড যেনন ল্যাম্প, আর একটি বাহু। ওই বাহু দিয়ে ইস্পাতের পাতও ছেঁড়া যায়। পানির নীচে এক হাজার ফুট নামতে পারে ডিসকভারি-১০০০। সে-তুলনায় ডিসকভারি-৯৯৯ অনেক কম নীচে নামতে পারে—মাত্র এক শ' ফুট। আপাতত উপরের এক ক্রেডলে রাখা আছে ওটা। তবে ওটার সঙ্গে রয়েছে ছোট একটা ডাইভিং চেম্বার, ফলে পানির নীচ দিয়ে ঢুকতে বা বেরুতে পারে সাঁতারুরা।

ডিসকভারি-১০০০-এর নীচের ডেক থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে গ্রেইটিং, নীচে হাঁ হয়ে রয়েছে গহ্বর—সেই মার্ভেলের

কীল পর্যন্ত। এখনও খোলা হয়নি জাহাজের নীচের দিকের দরজা। তবে পাম্পগুলো দ্রুত ভরে তুলছে সুইমিং পুল। কিছুক্ষণ পর রওনা হবে সাবমারসিবল।

কালো ওয়েট সুট পরছে ফু-চুং, আতাসি ও সোহেল। ওটার নীচে সুইম ট্রাঙ্ক। ইতিমধ্যে সবার স্কুবা ইকুইপমেন্ট তোলা হয়েছে সাব-এ। পাশে দাঁড়িয়ে তদারকি করছে উর্বশী।

ওয়েট সুট পরতে গিয়ে হাঁসফাঁস করছে আতাসি।

কাছে গিয়ে তার কাঁধ চাপড়ে দিল রানা। 'তোমার পেট বড় হয়ে উঠছে। এখনই সামলে নেয়ার সময়।'

'লোভটুকু না হয় আমার, বস্, কিন্তু আসল দোষ আপনার ওই বাবুর্চির,' বলল আতাসি। 'প্যাটিস-পেস্ট্রি খাইয়েই তো...'

পাশের বেঞ্চে বসে পড়ল রানা, ওয়েট সুটের বদলে পরছে ড্রাই সুট। 'উর্বশী, প্রিলঞ্চ চেক শেষ করেছ?'

'রওনা হতে পারি।'

'আর ক্রেডল?'

'সব সিকিওর করা হয়েছে।'

পাশে চলে এসেছে এক ইঞ্জিনিয়ার, তার কাছ থেকে হেডসেট নিল রানা, যোগাযোগ করল অপারেশন্স সেন্টারে। ওখানে আতাসির বদলে রয়েছে বাংলাদেশ নেভির লেফটেন্যান্ট মুর্তোজা। 'রানা বলছি। বাইরের অবস্থা কী?'

'সব ধরতে গেলে সুনসান, মাসুদ ভাই। শুধু একটা কন্টেইনার শিপ থেমেছে মেইন ডকে। তাও দু'ঘণ্টা হলো।'

'নেভাল বেস থেকে কোনও নড়াচড়া?'

'নেই। সব ফ্রিকোয়েন্সি চেক করেছি। মেডিটারেনিয়ান থেকে আসছে জাহাজে জাহাজে ভ্যাজর-ভ্যাজর। জরুরি কিছু নয়।'

'গগল, অনিল, তোমরা তৈরি তো?'

গগল ও অনিল টিম হিসাবে কাজ করছে। ওদের দায়িত্ব ন্যাভিগেশন ও ওয়েপন্স সিস্টেম-এর উপর নজর রাখা।

'আমরা তৈরি,' প্রায় একইসঙ্গে বলল ওরা দু'জন।

'আমরা ডিসকভারির ভিতর ঢুকলে আরেকবার কমিউনিকেশন চেক করতে হবে।'

'ঠিক আছে।'

ফু-চুং, আতাসি ও সোহেল তুলে নিয়েছে ওদের অস্ত্র ও গিয়ারের ব্যাগ, উঠে পড়েছে মিনি-সাবের উপর। গোল হ্যাচ দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা। ওদের পর পর উর্বশী ও রানাও। ভারী হ্যাচ ভিতর থেকে আটকে নিল রানা। এক ঘণ্টা লাগবে ওদের তীরের কাছে পৌঁছতে। যে যার সিটে বসে পড়ল রানা, সোহেল, ফু-চুং ও আতাসি। যাওয়ার পথে ওরা ভাগ করে নেবে স্কুবা ইকুইপমেন্ট।

সোহেল ও রানাকে পাশ কাটাল উর্বশী, গিয়ে বসে পড়ল পাইলটের সিটে। ওটা নিচু একটা চেয়ার, চার দিকে অসংখ্য সুইচ, ডায়াল ও মনিটর। চারদিক থেকে আসছে সবুজ আভা, দেখে মনে হয় ভিনগ্রহের মানুষ উর্বশী। 'মার্ভেল, কী অবস্থা?' হেডসেট পরে নিয়ে জানতে চাইল।

'ফাইভ বাই ফাইভ,' মার্ভেলের কমিউনিকেশন সিস্টেম ১৩২-বিট এনক্রিপশন-এ চলে। প্রতি সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে চলে সাইকেল। অর্থাৎ ইণ্টারসেপ্ট বা ডিক্রিপশনের সুযোগ নেই।

সাব-এর সবাই কমিউনিকেশন চেক করে নিল। ওরা যে ডাইভ হেলমেট সঙ্গে নিয়েছে, তার সঙ্গে রয়েছে ইণ্টিগ্রেটেড আলট্রাসনিক ট্র্যান্সিভার, ফলে নিজেদের ভিতর যোগাযোগ করতে পারবে। চাইলে ডিসকভারি-১০০০ বা মার্ভেলের সঙ্গেও কথা বলা

সম্ভব।

'এবার আমাদের নামিয়ে দেয়া যায়,' নির্দেশ দিল উর্বশী।

মুন পুলের আলো মৃদু হয়ে উঠল, পানির গভীরে যাবে না স্রেই প্রভা। এদিকে ধীরে ধীরে খুলছে কীলের দরজা। মন্থর গতিতে নড়ল সাবমারসিবল। যেন হোঁচট খেল, পরক্ষণে নামতে লাগল। পোর্টহোলগুলোকে চুমু দিল মেডিটারেনিয়ানের পানি। অতি ধীরে পানিতে নেমে গেল সাব, পেল নিউট্রাল বয়্যান্সি। এবার সরে গেল ক্ল্যাম্পগুলো, একটু টলমল করে উঠল সাব।

ব্যালাস্ট পাম্প অ্যাকটিভেট করল উর্বশী, ভরে উঠছে ট্যাঙ্ক, তারপর ধীরে মার্ভেলের নীচ থেকে বেরিয়ে এল সাব। প্র্যাকটিস করেছে অন্তত বারো বার, তবুও খুব সাবধানে নামতে শুরু করল উর্বশী। ডেপথ গজ দেখছে, খেয়াল রাখছে লেজার ফাইণ্ডারের উপর। কীলের কাছ থেকে সরে এসে বলল, 'ডিসকভারি সরে এসেছে।'

সাবমারসিবল এখন জাহাজের বিশ ফুট নীচে।

মার্ভেল থেকে বলা হলো, 'এবার দরজা বন্ধ হবে। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

আরও চল্লিশ ফুট নেমে এল উর্বশী, আর মাত্র তিন ফুট নীচে সাগর তল। এবার নেভাল বেসের দিকে রওনা হয়ে গেল ও। প্রপেলারের আওয়াজ যেন যতটা সম্ভব মৃদু হয় তাই অতি মন্থর গতিতে চলেছে। পানির ভিতর জেগে থাকতে পারে অ্যাক্টিভ সোনার। হয়তো টের পাবে কোনও অপারেটর। অ্যাশকেলন বন্দরে জাহাজের আসা-যাওয়া নেই বললেই চলে। কাজেই একটু অ্যাকুস্টিক ওয়েভ পেলেই টের পেয়ে যাবে ইজরায়েলিরা।

ভিযুয়াল ডিটেকশন হতে পারে। পানির গভীরতা বড় জোর ষাট-পঁয়ষট্টি ফুট। ডিসকভারি-১০০০-এর বাইরের আলো নিভিয়ে

রাখা হয়েছে। লাইট ডিটেকশন অ্যাণ্ড রেঞ্জিং সিস্টেমের রিফ্লেকটেড লেজার ব্যবহার করছে উর্বশী। লিডার সিস্টেম-এ সামনের দিক থেকে যোগান মিলছে তথ্যের। কাজ করে চলেছে থ্রি-ডিমেনশনাল কম্পিউটার। সামনের দিক সহজেই দেখাবে লিডার। একটা কোকের ক্যান পড়ে থাকলেও।

'আপনাদের পাইলট বলছি,' কাঁধের উপর দিয়ে চাইল উর্বশী। 'আমরা পানির আটষট্টি ফুট নীচ দিয়ে চলেছি। গতি ঘণ্টায় তিন নট। আমরা গন্তব্যে পৌঁছব মোটামুটি বাষট্টি মিনিট পর। এই সময়ে অ্যাপ্রুভড ইলেকট্রনিক্স ব্যবহার করতে পারেন। কিছু চাইলে অ্যাটেণ্ডেন্টের কাছে বলুন।'

'আমার বিয়ার গরম কেন?' আপত্তি তুলল সোহেল।

'আমার একটা কম্বল দরকার, সেই সঙ্গে বালিশ,' আবদার জুড়ল ফু-চুং। 'তা ছাড়া আপনাদের মেয়েটি এখনও ডাবল স্কচ দিয়ে গেল না!'

'ওসব হবে না,' কড়া স্বরে বলল উর্বশী। 'আপনারা টিকেটবিহীন যাত্রী, ঘাড় ধরে ফেলে দেয়া হবে বিমান থেকে।'

পরবর্তী আধঘণ্টা সবার হাসি-ঠাট্টা থেকে মনেই হলো না, এরা আসলে ইজরায়েলের সবচেয়ে হেভিলি সিকিওর্ড নেভি বেসে ঢুকছে। যেন কোনও বিপদই হতে পারে না। তবে জানে কী ধরনের ঝুঁকি নিতে চলেছে। ওরা পেশাদার, মনের উপর চাপ না দিয়েই দায়িত্ব পালন করতে অভ্যস্ত।

পরবর্তী আধঘণ্টা হাসি-ঠাট্টা চলল না। রানা, সোহেল, ফু-চুং ও আতাসি নিজ নিজ স্কুবা গিয়ার পরতে ব্যস্ত থাকল। সবাই চেক করল সবার গিয়ার, সেগুলো রি-চেক করা হলো। সুট পরা হলে রানা ও সোহেল ঢুকে পড়ল ফোন বুদ আকৃতির লকারে। এ চেম্বারের উপর রয়েছে একটা হ্যাচ, খোলা যায় ককপিট থেকে।

এয়ার লক থেকেও অপারেট করা যায়। চেম্বারের দু'পাশে সমান প্রেশার তৈরি হলে খোলা যায় আর্মার্ড দরজা। সময় নষ্ট না করে নিজে চেম্বারের কণ্ট্রোলগুলো অপারেট করল রানা। চেম্বার ভরে উঠছে সাগরের পানিতে। লবণ-পানি ঘিরে ফেলছে রানা ও সোহেলকে। সুটগুলো সেঁটে গেল দেহে। ড্রাই সুটের কোঁচকানো ভাঁজগুলো ঠিক করে নিল রানা। এ জিনিস সহজেই ছেঁড়ে। দু'জন বারকয়েক চোয়াল নাড়ল, ঠিক হয়ে গেল কানের ভিতরের প্রেশার। গলার কাছে পানি চলে আসতেই আবারও সুইচ টিপল রানা। এবার ডাইভ হেলমেট পরে নিল ওরা।

'আপনাদের কোনও অসুবিধে?' জানতে চাইল আতাসি। মনে হলো অনেক দূর থেকে অস্পষ্ট ভাবে ভেসে এল ওর কণ্ঠ।

'সব ঠিক,' বলল রানা। 'ফু-চুংকে নিয়ে চেম্বারে আঁটবে তুমি, নাকি একজন একজন করে বেরুবে?'

'উনি চেপ্টে যাবেন, হাতির চাপে পিঁপড়ের যা হয়। তবে বাঁচতেও পারেন।'

'রানা, লিডার তথ্য দিচ্ছে,' বলল উর্বশী। 'সামনে সাবমেরিন পেনের দরজা। আমরা ওটা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে।'

'ঠিক আছে, উর্বশী। ড্রাই ডকের দরজার ডানে রাখো।'

'রজার।'

এক মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, তারপর থরথর করে নড়ে উঠল ডিসকভারি-১০০০। দু'মিনিট পর নেমে এল বালির উপর। 'অপ্রয়োজনীয় ইকুইপমেণ্ট বন্ধ করে দিলাম। এবার তোমরা নেমে পড়তে পারো।'

'চল্,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, চল্।' হেলমেট দোলাল সোহেল।

একবার হেলমেটের লকিং রিং পরীক্ষা করল রানা। সুটের

ভিতর ঢুকবে না পানি। ট্যাঙ্ক থেকে আসছে তরতাজা বাতাস। হাতের ইশারা করে ডাইভ সিগনাল দিল সোহেল। ও-ও তৈরি। এবার সুইচ টিপল রানা, সঙ্গে সঙ্গে পানিতে ভরে উঠল এয়ার লকের সিলিং। বাতি নিভিয়ে দিয়েছে আগেই, এবার খুলতে শুরু করল হ্যাচ।

উপরের দিকে খুলে গেল গোলাকার দরজা। ভিতরে সামান্য বাতাস ছিল, সেটুকু টলতে টলতে রওনা হলো উপরের দিকে। আবছা আলোয় মনে হলো সব হীরার টুকরো। তবে পিয়ারের পাশে মিলিয়ে যাবে, খেয়াল করবে না কেউ।

ডাইভ চেম্বার থেকে উঠে এল রানা, থামল সাবমারসিবলের উপরের ডেকে। ওর পাশে এসে থামল সোহেল। ওরা কোনও আলো জ্বালছে না, সাগরের পানি যেন কুচকুচে কালো কালি। হ্যাচ আটকে দিল সোহেল। ফু-চুং ও আত্তাসির জন্য অপেক্ষা করছে। একবার আণ্ডারওয়াটার ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল রানা, উপর দিক ঢেকে রেখেছে বাম হাত দিয়ে।

সাবমেরিন পেন তৈরি করতে গিয়ে ছয় শ' গজ মাটি খুঁড়েছে ইজরায়েলিরা। পেনের প্রবেশ পথ এক শ' গজ চওড়া। বিরাট এলাকা ঢেকে দিয়েছে রিইনফোর্সড-কংক্রিট দিয়ে। আন্দাজ আট ফুট চওড়া দেয়াল। সরাসরি বোমা পড়লেও ধসবে না। উত্তর থেকে দক্ষিণে গেছে নেভাল বেসের ড্রাই ডক। পুব-দক্ষিণ ও পশ্চিমে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দালান। এরপর দুই মাইল জুড়ে ব্যারাক।

পেনের দরজা সাগরের দিকে। প্রকাণ্ড দুটো কবাট, হাইড্রোলিক পাওয়ারে বাইরের দিকে খোলে। দরজার সঙ্গে রয়েছে ইনফ্লেটেবল ব্লাডার। সেগুলো দরজা ও সিমেন্টের মাঝখানে থাকে। দরজা বন্ধ হলে দালানে ঢোকে না পানি। বোমা

মেরে উড়িয়ে দেয়া ছাড়া দরজা দিয়ে ঢুকবার উপায় নেই। অবশ্য অ্যাসেটিলেন কাটিং টর্চ দিয়ে কাটা সম্ভব, কিন্তু কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে তাতে।

ফিন নেড়ে দরজার কাছ থেকে সরে এল রানা, পিছু নিয়েছে ওর ছোট্ট দল। একটু পর পর টর্চ জ্বালছে রানা, দেয়ালের পাশ দিয়ে চলেছে। গুগলি-শামুকে ছাওয়া দেয়াল। ওটাই সাগরের আক্রমণ ঠেকিয়ে রেখেছে। পঞ্চাশ ফুট যাওয়ার পর আলো পড়ল একটা চারকোনা জায়গার উপর। এটাই খুঁজছে রানা। দেয়ালের উপর বসানো চার ফুট বর্গাকার কালভার্ট। ওই কালো খোড়ল দিয়ে ড্রাই ডকের পানি বের করে দেয় পাম্প। টর্চের উপর দিকে হাত রেখে আলো তাক করল রানা কালভার্টের উপর। কংক্রিটের বুকে বসানো হয়েছে স্টিলের গ্রিল। কেউ চাইলে কণুইট দিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারবে না। স্টিলের গায়ে সামান্য জং ধরেছে। এক মিনিট পর পেয়ে গেল যা খুঁজছিল। গ্রিলের উপর-নীচে ছ'টা রডে রয়েছে তারগুলো।

কালভার্টের সঙ্গে মোশন ডিটেক্টর নেই। থাকবার কথাও নয়, বারবার আসবে কৌতূহলী মাছ, ফলে একটু পর পর বাজতে থাকবে অ্যালার্ম। তার চেয়ে ভাল গ্রিলের সঙ্গে ইলেকট্রিক সংযোগ দেয়া। যদি কেউ কেব্‌ল্ বা গ্রিল কাটে, টের পেয়ে যাবে গার্ডরা।

আতাসিকে তারগুলো দেখিয়ে দিল রানা। ওগুলোর সামনে থামল আতাসি, প্রায় অন্ধকারে চলছে দু'হাত। দুটো রডে বাইপাস করল ও, নীচের অংশে আটকে দিল অ্যালিগেটর ক্ল্যাম্প। সঙ্গে ইলেকট্রিক তার। ওগুলোর ভিতর দিয়ে চলবে বিদ্যুৎ। এবার ডাইভ ব্যাগ থেকে বের করে নিল দুটো স্কুইজ টিউব। একটার মুখ খুলে ভিতরের ধূসর জিনিসটা মাখিয়ে দিল রডগুলোর নীচে ও উপরের দিকে দ্বিতীয় টিউব থেকে বেরুল

হলুদ জিনিস, সেগুলো লাগিয়ে দিল ধূসর ক্রিমের উপর।

শুরু হলো দুই কম্পাউণ্ডের প্রতিক্রিয়া। দ্রুত তৈরি হলো কস্টিক অ্যাসিড। এক মিনিট পেরুনোর আগেই ক্ষয় ধরল স্টিলে। রড দুটো দুই হ্যাঁচকা টানে খুলে নিল আতাসি। ওর রাখা তার ও অ্যালিগেটর ক্ল্যাম্পের ভিতর দিয়ে বইছে বিদ্যুৎ। সার্কিট ঠিকই আছে, কাজেই বাজবে না অ্যালার্ম। রডগুলো নামিয়ে রাখল বালির উপর। আরও দুটো রডে বসাল অ্যালিগেটর ক্ল্যাম্প ও তার, দু'মিনিট পর সরিয়ে নিল রডগুলো। সাবমেরিন পেনে ঢুকবার পথ তৈরি। রানা, সোহেল ও ফু-চুং ঢুকে পড়ল কালভার্টের ভিতর। ওদের পিছন পিছন আতাসি। সামনে পড়ল মোটা পাইপ, ধীরে উপরের দিকে গেছে।

এখন কেউ উপর থেকে ওদের দেখবে না, নিশ্চিন্তে ডাইভ টর্চ জ্বালল রানা। এগুতে শুরু করল ওরা। সামনে গিয়ে পড়ছে গোলাকার আলোর আভা।

হঠাৎ রানার দিকে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে এল একটা ছায়া। জিনিসটা মাঝারি আকৃতির। প্রায় অন্ধের মত টর্চ দিয়ে গুঁতো লাগিয়ে দিল রানা। পরক্ষণে স্যাঁৎ করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ছায়া। পলকের জন্য চোখে পড়ল ত্রিকোণ পাখনাটা।

হাঙর!

'কপাল ভাল, বড় না,' ফোঁস করে শ্বাস ফেলল ফু-চুং। 'আর দুটো বছর পর ওর সঙ্গে কিছুতেই দেখা করতে চাই না!'

ধক্-ধক্ করছে রানার হৃৎপিণ্ড, দু'সেকেণ্ড পর আবার এগুতে শুরু করল। যেন শেষ নেই এ পাইপের। বদ্ধ পরিবেশ।

কিছুক্ষণ পর শেষ হলো পাইপ, সামনে বড়সড় একটা ভালভ। ড্রাই ডক শূন্য থাকলে বন্ধ থাকে এটা। গত তিন দিন ধরে এই ফ্যাসিলিটি দেখছে ওরা। একবারও মনে হয়নি

ইজরায়েলিরা পাম্প চালু করেছে, বা সাব পেন খালি করছে। কয়েক দিন হলো এখানে এসে ঢুকেছে দুটো ট্রাইডেন্ট ইলেভেন সাবমেরিন, সঙ্গে আণবিক বোমাবাহী মিসাইল।

বাটারফ্লাই ভালভ, ওটার ভিতর দিয়ে একে একে পেরিয়ে এল ওরা। সামনে পড়ল প্রকাণ্ড পাম্প। এটাই শুকিয়ে ফেলে সাবমেরিন পেন। পাম্পের হাব থেকে ঝিকঝিক করছে ব্লেডগুলো, ফেরোব্রোঞ্জের।

বল্টু খুলবার যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওরা। পাখাগুলো ঝালাই করা থাকতে পারে, কাজেই ছোট্ট অ্যাসেটিলিন কাটিং টর্চও এনেছে সঙ্গে। কোমরের পাউচ থেকে অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ বের করল রানা, মনোযোগ দিল বল্টুগুলোর দিকে। বিদঘুটে অ্যাঙ্গেলে রয়েছে প্রতিটি বল্টু। একটা পাখার সঙ্গে রয়েছে বারোটা বল্টু। পাখাগুলো সরিয়ে নিলেই চলবে। নতুন উদ্যম নিয়ে কাজে নামল রানা। এগারোটা বল্টু ঢিলা করে ফেলল তিন মিনিট পেরুনোর আগেই। কিন্তু শেষেরটা খুলতে চাইল না। রেঞ্চে চাপ বাড়িয়ে দিল রানা। প্রচণ্ড শক্তি ব্যয় করছে, বুঁজে ফেলেছে চোখ। টের পেল চোখের পিছন অংশে লাল-নীল নক্ষত্র ছুটছে। দশ সেকেণ্ড পর হঠাৎ খুলে এল বল্টু। রেঞ্চটা ঝটাং করে গিয়ে পড়ল দূরে। ছিটকে পড়েছে বটে, তবে যাওয়ার আগে কেটে দিয়ে গেছে রানার হাত। টর্চের আলোয় ছড়িয়ে পড়ছে লালচে ধোঁয়া।

'তুই কি চাস রক্তের গন্ধ পেয়ে ফিরে আসুক হাঙরটা?' পরিস্থিতি হালকা করতে চাইল ফু-চুং।

'আমার আপত্তি নেই, আসুক না,' বলল রানা। 'তুই যতক্ষণ আমার পিছনে, আমার ভয় কী?' একে একে বল্টু খুলছে। পাঁচ মিনিট পেরুনোর আগেই খুলে ফেলল তিনটে পাখা, নামিয়ে রাখল

পায়ের কাছে। স্কুবা ট্যাঙ্ক নিয়ে ঢোকা যাবে না, ওটা পিঠ থেকে খুলে ফেলল রানা, পাম্পের হাবের ভিতর ছেঁচড়ে ঢুকে পড়ল। এ পাশে চলে এসে পিঠে ঝুলিয়ে নিল ট্যাঙ্ক, ঘুরে চাইল। দু'মিনিট পর ওর পাশে চলে এল সোহেল, ফু-চুং ও আতাসি।

'সত্যিই বড় হয়ে গেছে পেট, বস্,' প্রায় নালিশ করল আতাসি। 'আরেকটু হলে পাম্পের ভিতর আটকা পড়তাম!'

'ব্যায়াম শুরু করো,' বলল রানা। সামনে লম্বা পাইপ, নব্বুই ডিগ্রি কোনাকুনি উঠেছে। টর্চ নিভিয়ে দিল রানা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, চোখ অন্ধকারে সয়ে আসতেই এগুতে শুরু করল। সামনের বাঁক থেকে আসছে মৃদু আভা। সাঁতরে চলেছে রানা, সামনে বাঁক। ওখানে থামল, ওদিক দেখবার জন্য চট্ করে উঁকি দিল।

সামনে ড্রাই ডক। উপরের ছাত থেকে আসছে ফ্লুরেসেন্ট বাতির আলো। গার্ডরা টহল দেবে, তাই বোধহয় কিছু আলো জ্বলছে। কোনও টেকনিশিয়ান কাজ করছে না সাবমেরিনের উপর। পেনের বেশিরভাগ টিউব নেভানো। খুশি হয়ে উঠল রানা, বাড়তি গার্ড থাকবার কথা নয়। দু-চারজনকে ঠাণ্ডা করে দেবে ওরা।

পাইপের ভিতর থেকে সাঁতরে বেরিয়ে এল রানা, মেঝের কাছে থাকছে। ওর পিছু নিয়েছে সোহেল, ফু-চুং ও আতাসি। পাহাড় সমান দরজা, ওটার দিকে চলেছে। গার্ডদের ওদিকে থাকবার কথা নয়। একবার কব্জি উল্টে ডাইভ কম্পিউটার দেখে বলল রানা, 'আমরা এক মিনিটের জন্য দশ ফুট গভীরতায় থামছি।' এতক্ষণ নাইট্রোজেনের বুদ্বুদ তৈরি হয়েছে রক্তে, সেগুলো মিলিয়ে গেলে আবারও রওনা হবে ওরা।

কুমির যেমন পানি থেকে মাথা তোলার আগে ধৈর্যের সঙ্গে

সন্তর্পণে এগোয় শিকারের দিকে, ঠিক তেমনি ভঙ্গি নিয়েছে চারজনের এই দল। ওদের হেলমেটের সঙ্গে রয়েছে ছোট্ট পেরিস্কোপ, তাতে দেখছে উপরের দিক। অত্যন্ত শক্তিশালী স্কোপ এগুলো, থার্ড জেনারেশন অপটিকস। নক্ষত্রের দিকে তাক করলে টিমটিমে সেই আলোও মনে হয় দিনের আলোর মত। ডায়াল ঘুরিয়ে দূরে দেখছে ওরা, পানির নীচ দিয়ে এগিয়ে চলেছে সাবধানে। প্রথম কাজ ড্রাই ডক ভাল ভাবে দেখে নেয়া। বুঝে নিতে হবে এখানে কী ধরনের সিকিউরিটির ব্যবস্থা রেখেছে ইজরায়েলিরা।

পাশাপাশি দুটো সাবমেরিন রাখবার পর আরও দুটো রাখার জায়গা আছে এই ড্রাই ডকে। ট্রাইডেণ্ট সাবমেরিন দুটো উঁচু কংক্রিট জেটির পাশে ভিড়ানো। দালানের পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে জেটি। এখানে-ওখানে ইকুইপমেণ্ট, ব্যারেল ভরা লুব্রিকেণ্ট, তারপুলিনের নীচে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি। বেশ কিছু ছোট আকারের ইলেকট্রিক গলফ কার্ট চোখে পড়ল। দু'দিকে রয়েছে তিনটে ফর্কলিফট। দালানের দক্ষিণ জুড়ে উঁচু এক প্ল্যাটফর্ম। ওখানে কিছু অফিস ঘর, দেয়ালগুলো কাঁচের। বোধহয় অবযার্ভেশন রুম। সেগুলোর উত্তর দিকে স্টোরেজের জন্য জায়গা। এক পাশে একটা ওভারহেড ক্রেন, রেইল দিয়ে চলে। পুরো ডক কাভার করতে পারে ওটা।

পিয়ারের এক ধারে মোটা ম্যানিলা দড়ি দিয়ে বাঁধা কালো রঙের ট্রাইডেণ্ট অ্যাটাক সাবমেরিন দুটো। এ জিনিস আমেরিকার সেরা যুদ্ধাস্ত্রগুলোর অন্যতম। যখন ব্যাটারি দিয়ে চলে, ওটা হয়ে ওঠে প্রায় নিঃশব্দ। সফিসটিকেটেড প্যাসিভ সোনার লাগানো জাহাজও টের পায় না হঠাৎ কীভাবে একদম গায়ের কাছে এসে হাজির হয়েছে মৃত্যুদূত। গায়ে ফিট করা ছয়টি টর্পেডো টিউব।

দুই মাসের বেশি সময় ধরে টহল দিতে পারে সাগরের নীচে।

পাঁচ মিনিট এদিক ওদিক দেখবার পর জানতে চাইল রানা, 'কী মনে হয়?'

'আমি গুনে পেয়েছি ছয়জন,' বলল আতাসি।

'আমিও তা-ই দেখেছি,' বলল ফু-চুং।

'সোহেল?'

'বোধহয় সামান্য ভুল হয়েছে,' বলল সোহেল। 'বামদিকে আরেকটা আছে। ছায়ার ভিতর ঘুমে কাদা। এখান থেকে বস্তার মত লাগছে।'

ওদিকে চাইল সবাই। খুব খেয়াল করলে বোঝা যায় ওখানে শুয়ে আছে মোটা কেউ। মনে মনে সোহেলের তারিফ করল রানা, ফু-চুং ও আতাসি। লোকটা হঠাৎ উঠে বসল। চারপাশ কিছুক্ষণ দেখল, বাম হাতে চুলকে চলেছে ডান বগল। তারপর আবারও শুয়ে পড়ল।

'তোর চোখ ঘাড়-ছেলা শকুনের মত, সোহেল,' বলল ফু-চুং। খানিকটা লজ্জিত।

'দোতলায় চারজন,' বলল রানা। 'পারসোনেল এক্সিট ডোরের সামনে দু'জন। আর রইল ঘুমন্ত রাজপুত্র। আতাসি, ফু-চুং, দোতলা তোমাদের। সোহেল, তুই রাজকুমারকে গভীর ঘুমের দেশে পাঠিয়ে দিবি। দরজার দু'জনকে নেব আমি।' একবার ঘড়ি দেখে নিল রানা। রাত-একটা একত্রিশ। মনে হয় না ভোরের আগে বদল হবে ডিউটি। 'আমরা এক ঘণ্টা পর ডিসকভারির কাছে পৌঁছব। রাত দুটোর সময় মার্ভেলের কাজ ধরবে ওরা। কাজেই যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

আবারও ডুব দিল ওরা, যে যার নির্দিষ্ট জায়গার দিকে চলেছে। কিছুক্ষণ পর জেটির মাঝামাঝি পৌঁছে গেল সোহেল।

একটু দূরেই ঘুমিয়ে থাকা লোকটা। ডকের পারে থামল সোহেল, উঁচু করছে না মাথা। পাশেই কালো রঙের সাবমেরিন।

এদিকে পিয়ারের বামদিক দিয়ে ছায়ার মত চলেছে আতাসি ও ফু-চুং। খানিক দূরে ধাতব সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলার বারান্দায়।

আর রানা পৌঁছে গেছে কয়েকটা ক্রেটের কাছে। পানি থেকে উঠে ডকে থামল। ক্রেটগুলো থেকে অন্তত এক শ' গজ দূরে আলোকিত ভেস্টিবিউল। দরজার সামনে বিমর্ষ চেহারা করে বসে রয়েছে দুই গার্ড।

নিঃশব্দে স্কুবা গিয়ার ও ড্রাই সুট খুলে ফেলল রানা। নীচে পরা ইজরায়েলি সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম। কমব্যাট রিবনগুলো নিঃশব্দে জানিয়ে চলেছে, ও ব্রিগেডিয়ার। প্রায় সবই ঠিক, তবে পায়ে ডাইভ বুট। এটা মেনে নিয়েছে রানা। কোমরের বেল্টের সঙ্গে ঝুলিয়ে নিয়েছে হোলস্টার, এবার ক্যাপ পরে নিতেই মনে হলো, ও সত্যিই ইজরায়েল আর্মির অফিসার। দলের সবাইকে আরও এক মিনিট সময় দিল রানা, এতক্ষণে যার যার অবস্থানে পৌঁছে যাওয়ার কথা। এবার ক্রেটগুলো ঘুরে রওনা হয়ে গেল ও, নিঃশব্দে চলেছে গার্ডদের লক্ষ্য করে।

দেখতে না দেখতে গার্ডদের বিশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেল রানা। ঠিক তখনই গার্ডদের একজন টের পেল, কাছাকাছি রয়েছে অন্য কেউ। ঝট করে চেয়ার ছাড়ল সে, ঘুরে চেয়েই হাঁ হয়ে গেল। দু' সেকেণ্ড পর মনে পড়ল এম ফরটিন রাইফেল ঠেস দিয়ে রেখেছে টেবিলে। এদিকে এগিয়ে আসছে লোকটা! আর দেরি করল না সে, ছোঁ মেরে তুলে নিল রাইফেল, পরক্ষণে তাক করল লোকটার বুকে। চাপা স্বরে সাবধান করল সঙ্গীকে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সে-ও। হাতে পেতে চাইল অ্যাসল্ট রাইফেল, তবে

বাম হাত পেঁচিয়ে গেল স্লিঙের সঙ্গে।

'চ্যালেঞ্জ করবার মানেটা কী?' কড়া স্বরে বলল রানা। নিখুঁত ইদ্দিশ ভাষা। 'অ্যাই উল্লুক! আমি ইজরায়েল আর্মির ব্রিগেডিয়ার হাউয়াজি পেরন। বেস কমাণ্ডার অ্যাডমিরাল ইতামার পোলার্ডের দাওয়াতে এসেছি। চ্যালেঞ্জ করছ যে?'

রানার দিকে উজবুকের মত চেয়ে রইল দুই গার্ড, ক' সেকেণ্ড পর বামদিকের জন বলে উঠল, 'কে... আপনি... স্যর?'

'ব্রিগেডিয়ার হাউয়াজি পেরন,' ত্যাড়া ভঙ্গিতে বলল রানা। 'হায় নবী মুসা! গত পুরো একটা সপ্তাহ ধরে অন্তত বিশবার এসেছি এই দালানে। দেখোনি আমাকে? অ্যাডমিরাল পোলার্ড ডেকেছেন নতুন সাবমেরিনের ডেমনস্ট্রেশন দেখতে। মুসলিম কুকুরগুলো এবার বুঝবে কাদের সঙ্গে লড়তে চায়!'

রানা জানে, যেভাবে দ্রুত বলেছে, অর্ধেক কথা বুঝতেই পারেনি দুই গার্ড। এদের বিশ্বাস করাতে হবে ও আসলে এখানে থাকতেই পারে, তা যত রাতই হোক। টেবিলের উপর উপচে পড়া অ্যাশট্রের পাশে একটা ওয়াকি-টকি। আরেক দিকে সুপের দুটো বাটি ও পুরনো নিউজ পেপার। লোক দুটো যদি বেস সিকিউরিটির সঙ্গে আলাপ করতে চায়, মুহূর্তে খেলা শেষ।

গার্ডদের চোখে এখনও সন্দেহ, তবে উচ্চপদস্থ অফিসারের উপস্থিতি নাড়িয়ে দিয়েছে তাদের। একবার পরস্পরের দিকে চাইল। কী করবে ভাবতে চাইছে। এম ফরটিনের ব্যারেল নাড়ল তরুণ গার্ড, পরক্ষণে চাইল রানার আইডেন্টিফিকেশন।

প্যান্টের পকেট থেকে বিলফোল্ড বের করল রানা, এগিয়ে দিল বয়স্ক গার্ডের দিকে। চোখের কাছে নিয়ে পড়তে শুরু করেছে লোকটা। এবার রানার বুক পকেট থেকে বেরুল ডানহিল সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার দিয়ে জ্বেলে নিল একটা শলা।

লোক দুটো স্থানীয় সস্তা সিগারেটে অভ্যস্ত, কম বয়স্ক সৈনিকের চোখ আটকে গেছে চ্যাপ্টা প্যাকেটের উপর। বয়স্কজন বিলফোল্ড ঘাঁটছে, এবার হাতে তুলে নিল ওয়াকি-টকি।

একই সময়ে সিগারেট দিতে চাইল রানা।

দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেল লোকটা।

পুরো প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়েছে রানা।

'সিকিউরিটি স্টেশনে জানানো উচিত,' বলল তরুণ সৈনিক।

'বটে,' মুখ ভরা ধোঁয়া উগরে দিল রানা। 'সিগারেটের ধোঁয়া গিলে নাও, একটু পর কড়া ধমক মিলবে সিকিউরিটি স্টেশন থেকে। বিলফোল্ডের লেখা তো দেখেইছ।'

লাজুক ভঙ্গি নিল দুই সৈনিক। প্যাকেট নিল তরুণ গার্ড, একটা সিগারেট নিয়ে ঝুলিয়ে নিল ঠোঁটে। তার দেখাদেখি বয়স্ক সৈনিকও। লাইটার দিয়ে ধরিয়ে দিল রানা। মাত্র এক টান দিয়েছে লোকদুজন, কিন্তু তামাকের সঙ্গে রয়েছে নার্কোটিক, কাজ শুরু করল নিমেষের মধ্যে। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল লোকদুটোর নার্ভাস সিস্টেম। একটা কথা বলবার সুযোগ পেল না, কাত হয়ে পড়ে গেল মেঝের উপর।

নিজের সিগারেট ফেলে দিল রানা, বুটের হিল দিয়ে নেভাল। গার্ডদের সিগারেটগুলোও নিভিয়ে তুলে রেখে দিল প্যাকেটে। প্রমাণ রইল না। আগামী পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকবে দুই গার্ড। তারপর শুনবে তাদের বিরুদ্ধে নেশা করার গুরুতর অভিযোগ এনেছে অফিসাররা।

পরিকল্পনা করবার সময় সবাইকে জানিয়েছে রানা, একান্ত বাধ্য না হলে কাউকে হত্যা করবে না।

দরজার দিকে পিঠ দেবে রানা, এমন সময় হঠাৎ খুলে গেল ধাতব কবাট। দ্রুত ভিতরে ঢুকল এক টেকনিশিয়ান, পিছনে দুই

গার্ড। সবার চোখ গিয়ে পড়ল মেঝের উপর। টেবিলের পাশে অচেতন দুই গার্ড! তৃতীয় লোকটার ইউনিফর্ম নেভির নয়, আর্মির! এত রাতে এ লোক এখানে কী করছে? সন্দেহ নিয়ে অ্যাসল্ট রাইফেল তুলল ডানদিকের গার্ড, চ্যালেঞ্জ করবে।

সঙ্গীকে হড়বড় করে বলল দ্বিতীয়জন, 'স্যরকে জানাতে চললাম।' ঘুরেই দৌড়াতে শুরু করল সে।

পাঁচ মিনিট পেরুনোর আগেই নরক হয়ে উঠবে এ জায়গা, ভাবল রানা। ব্যারাক থেকে ছুটে আসবে তিন হাজার নৌ সেনা! পিঁপড়ের বাসার মত হয়ে উঠবে গোটা ড্রাই ডক!

চার

দরজার দিকে ছুটছে দ্বিতীয় গার্ড। তবে তার সঙ্গীর বুক সই করছে খুদে এক বিন্দু লাল আলো, চট্ করে সরে গেল অস্ত্রের স্টকের উপর—ছুটে এল নিঃশব্দ বুলেট। ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল এম ফোরটিন। ছিন্নভিন্ন হয়েছে সৈনিকের ডান পাঞ্জা, রক্ত ঝরছে ঝর্নার মত।

দোতলার বারান্দা থেকে গার্ডকে আহত করেছে ফু-চুং বা আতাসি, বোকা বনে যাওয়া টেকনিশিয়ানকে কাভার করবে ওরা, কাজেই সময় নষ্ট করল না রানা, পলায়মান সৈনিকের পিছনে ছুটতে শুরু করল। আগে কখনও এমন দৌড় দিইনি, ভাবছে। লোকটাকে ধরতেই হবে। নইলে, আমরা শেষ! অন্ধকার লক্ষ্য

করে দৌড়ে চলেছে লোকটা। হারিয়ে যেত, কিন্তু বিপত্তি ডেকে এনেছে তার খাকি ইউনিফর্ম।

দু' সেকেণ্ড পর পিছু নিয়েছে রানা। আট কদম ফেলবার পর আকাশে উড়াল দিল ও, সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে দু'হাত। পরক্ষণে পেঁচিয়ে ধরল লোকটার দু' হাঁটু। অ্যাসফল্টের উপর ধুপ করে পড়ল দু'জন। রানা পড়েছে লোকটার নিতম্বের উপর, কিন্তু সৈনিকের কপাল মন্দ—পাকার উপর বিশ্রী শব্দ তুলে পড়ল কপালটা, ছেঁচড়ে গেল আধ ফুট। ততক্ষণে ছিঁড়ে গেছে ডান গাল। তবে মন্দের ভাল, জ্ঞান হারিয়েছে ব্যথা পাওয়ার আগেই।

ধড়মড় করে উঠে বসল রানা, চট্ করে চাইল চরদিকে। একটু দূরে দুটো ওয়্যারহাউস, তবে সেখানে আলো জ্বলছে না। কারও থাকবার কথা নয়। বাঁ দিকে বেশ দূরে চারতলা অফিস বিল্ডিং। তিনতলার কয়েকটা জানালা আলোকিত। যা ঘটেছে, মনে হয় না কেউ খেয়াল করেছে। কোমর থেকে ফ্লেক্সিকাফ খুলে নিল রানা, দুই কব্জি আটকে দিল অজ্ঞান সৈনিকের। কাঁধে তুলে নিল শিথিল দেহ, তারপর দ্রুত ফিরতে লাগল সাবমেরিন পেন লক্ষ্য করে।

দালানে ঢুকে ভিতর থেকে দরজাটা আটকে দিল রানা। ততক্ষণে টেকনিশিয়ানের দুই কব্জি হ্যাণ্ডকাফে আটকে দিয়েছে ফু-চুং, মুখে গুঁজে দিয়েছে ব্যাণ্ডেজ। ছেঁচড়ে নিয়ে চলে গেল দালানের বাঁ কোণে। ফু-চুঙের পিছু নিল রানা, অচেতন দেহগুলোর পাশে নামিয়ে দিল ওর কাঁধের বোঝা। দোতলার গার্ডদের আগেই বেঁধেছে আতাসি, এক মিনিট আগে হাজির হয়েছে নীচতলায়।

'আরেকটু হলে, বস্,...' আর কিছু বলল না ও।

'কেউ দেখেনি তো, রানা?' বলল ফু-চুং।

'অ্যালার্ম বেজে ওঠেনি, কাজেই...' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'উপরতলার কী অবস্থা?'

'একজন রাইফেল ধরতে গেছিল। তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে আতাসি। তবে বাঁচবে।'

দরজার দিকে চলেছে ওরা, এমন সময় এল সোহেল। 'সব ঠিক তো?'

'এখন পর্যন্ত,' বলল রানা। 'তোর কী খবর?'

'আমাদের রাজপুত্র গভীর ঘুমে। ছয় ঘণ্টার আগে উঠবে না।'

'তা হলে চল মিসাইল আর সাবমেরিনের ব্যবস্থা করি।'

উঁচু প্ল্যাটফর্মের প্রথম দুটো ঘর বিশাল। একটার ভিতর সাবমেরিনের যন্ত্রাংশ, দ্বিতীয় ঘরে দশটা ইণ্টারকণ্টিনেণ্টাল ইউজিএম ওয়ান-থ্রি-থ্রি ডি-ফাইভ ট্রাইডেণ্ট ইলেভেন ব্যালিস্টিক মিসাইল, একের পর এক কেবিনেট ও কম্পিউটার। মিসাইল ধরনের আধুনিক অস্ত্র রয়েছে মার্ভেল জাহাজেও। যেমন মার্ক-৪৮ অ্যাডক্যাপ টর্পেডো। চোরাই মার্কেটে দাম আঠারো লাখ ডলার। এক আমেরিকান ঘুষখোর ভাইস অ্যাডমিরালকে তেরো লাখ ডলার দিয়ে কিনেছে গগল।

প্রথম ঘরে বেশ কিছু ওঅর্ক বেঞ্চ, টেবিলে ডায়াগনস্টিক কম্পিউটার ও নানা ইলেকট্রনিক গিয়ার। সেসবের ভিতর প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ বসাতে শুরু করল ফু-চুং ও আতাসি।

এ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রানা ও সোহেল। দ্বিতীয় ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড এক নিচু জলচৌকির মত, তার উপর তারপুলিনে ঢাকা রয়েছে কিছু। চারদিকে চাইলে মনে হয় এ স্রেফ কোনও মর্গ, বড়সড় কেবিনেটের ভিতর লাশ। জলচৌকির সামনে গিয়ে থামল রানা ও সোহেল, সরিয়ে দিল তারপুলিন। প্রথম দর্শনে মনে হলো যান্ত্রিক ট্রলির উপর ওগুলো আমেরিকান টেস্ট-৯৭

টর্পেডো। তবে লেজে কোনও প্রপেলার নেই, বদলে ত্রিকোণ পাখা। পরস্পরের দিকে চাইল ওরা। মিসাইলগুলো একেকটা সাড়ে নয় ফুট লম্বা।

'কী বুঝলি?' বন্ধুর দিকে চাইল রানা।

'ছবিতে যা দেখেছি ঠিক তাই। আগে হলে বিশ্বাস করতাম না, এ জিনিস ইজরায়েলিদের দিয়েছে আমেরিকান সরকার। তার মানে, ভুল তথ্য পাইনি আমরা।'

'আয়, কাজ সেরে ফেলি।'

'তোর কাজ শেষ হওয়ার আগেই দেখবি আমার কাজ শেষ।' একটু দূরে টেবিলে কম্পিউটার টার্মিনাল, ওটার দিকে পা বাড়াল সোহেল।

কোমরের থলে থেকে স্ক্রু ড্রাইভার ও সি-ফোর বের করল রানা। ভাবছে, দেখাই যাক কে আগে শেষ করে! ঠিক করেছে, ডানদিকের মিসাইল থেকে কাজ ধরবে।

কম্পিউটার চালু হতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল সোহেল। সঙ্গে এনেছে পাইরেট ড্রাইভ, ওটা দিয়ে সাইফন করা যায় সিস্টেমের সবকিছু। লাল রঙের লগ বুক পেয়ে কপি করতে শুরু করল ও, সেইসঙ্গে পড়ছে। মিসাইল ও সাবমেরিনের উপর যা তথ্য পাবে, সব তুলে নেবে ড্রাইভে।

পনেরো মিনিট পর ঘরে এসে ঢুকল আতাসি, চলে গেল ঘরের এক পাশে। নানা দিকে বসিয়ে দেবে বাড়তি প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। ইতিমধ্যে দুই সাবমেরিনে সেট করে এসেছে সি-ফোর। বিস্ফোরণের ফলে দুই সাবমেরিন ড্রাই ডকে ডুবে থাকবে বাকি জীবন। কাজের ফাঁকে বলল, 'মিসাইল কি একটা নেবেন, বস্, না দুটো?'

সিক্রেট সার্ভিসের প্রধানরা ঠিক করেছেন, এ ধরনের অন্তত

একটা মিসাইল সরিয়ে নেয়া হবে, সম্ভব হলে দুটোই। গালফ অভ ওমান থেকে আসছে এমভি বাংলার গৌরব তাজউদ্দীন। সে জাহাজে তুলে দেয়া হবে মিসাইলগুলো। চলে যাবে সুদূর বাংলাদেশে। ইউজিএম-এক শ' তেত্রিশ ডি-ফাইভ ট্রাইডেন্ট ইলেভেন মিসাইল নিয়ে গবেষণা করবে বাংলাদেশ, চিন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও আরবের বিজ্ঞানীরা।

মিসাইলের উপর থেকে এক পলক চোখ তুলল রানা, কাজ বন্ধ করে বলল, 'একটা নেব।'

'তুই বোধহয় জানিস না বাঁ দিকের দুটো পুরো আর্মড,' কম্পিউটার স্ক্রিন থেকে চোখ তুলল না সোহেল। 'পুরো ফিউয়েল ভরা।'

'তা হলে দুটোই নেব,' বলল রানা। 'ওদুটো রেডি রেখেছে তেহরানে ফেলবে বলে।'

জানতে চাইল আতাসি, 'সাবধানে নিলেই হলো, তাই না, বস্?'

'তা-ই তো মনে হয়।'

দ্রুত হাত চলছে ওদের, ডুবে গেল যে যার কাজে।

কিছুক্ষণ পর খোলা দুটো মিসাইলের ওঅরহেড সরিয়ে নিল রানা, বিস্ফোরক বসিয়ে টাইমার চালু করে দিল। নতুন করে আটকে দিল ওঅরহেডগুলো। মিসাইলগুলো নষ্ট হবে, তবে ড্রাই ডকে যে ফিউল রয়েছে, সে পর্যন্ত পৌঁছবে না আগুন। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে না, কাছাকাছি কেউ না গেলে মারা পড়বে না বিস্ফোরণে।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা, আরও বহু কাজ পড়ে রয়েছে। দোতলায় দেখতে পেল ফু-চুংকে। সে উপর থেকে জানাল, সাগরের দিকের দরজা খুলবার মেকানিজম পেয়ে গেছে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছে রানা, ওকে পাশ কাটিয়ে নেমে গেল ফু-চুং। ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করছে আতাসির সঙ্গে।

দোতলায় উঠে এসেছে রানা, খানিক দূরে লোহার মই, গিয়ে মিশেছে আরও উঁচু এক ক্যাটওয়াকে। ওখানে ওভারহেড ক্রেনের কণ্ট্রোল কেবিন। দ্রুত পায়ে মই বেয়ে উঠল রানা, গিয়ে ঢুকল ধাতব হলুদ কেবিনে। আগেও ব্যবহার করেছে এ ধরনের ক্রেন। দু মিনিটের মধ্যে চালু হয়ে গেল মেশিন। ছাত থেকে নেমে এল ক্রেন, ঘড়ঘড় করে চলেছে ডকের দিকে। কিছুক্ষণ পর নির্দিষ্ট ঘরের সামনে পৌঁছে গেল ক্রেন।

ততক্ষণে ঘর থেকে মিসাইল দুটো বের করে এনেছে আতাসি ও ফু-চুং। যান্ত্রিক ট্রলির উপর স্থির হলো রানার ক্রেনের হুক। নীচের ওরা ডানদিকের মিসাইলে আটকে দিল স্লিং কেবলগুলো। কাজ শেষ হতেই উপরে চাইল ফু-চুং, দু'বার হাত নেড়ে সরে গেল আতাসিকে নিয়ে। পরে নিতে যাচ্ছে স্কুবা গিয়ার।

ট্রলি থেকে মিসাইল তুলে নিল রানা, সাবমেরিনগুলোর কাছ থেকে সরিয়ে নিল ক্রেন, তারপর নিয়ে চলল সামনের দিকে। প্রকাণ্ড দরজার বিশ ফুট দূরে থামল ঝুলন্ত মিসাইল। মোটা কেবলগুলো নামছে। কিছুক্ষণ পর পানি স্পর্শ করল মিসাইল। খুব সাবধানে কেবল নামিয়ে চলেছে রানা, কিছুক্ষণ পর ঢিল পড়ল কেবলে। নীচের মেঝে ছুঁয়েছে মিসাইল। কণ্ট্রোল নাড়তে শুরু করল রানা। যেই বুঝল একটু টান ধরছে কেবলে, থেমে গেল। জেটির পাশ দিয়ে হেঁটে এল ফু-চুং, পরে নিয়েছে ট্যাঙ্ক, হেলমেট ও রেগুলেটর; এবার ডক থেকে নেমে পড়ল পানিতে। ওখানে কয়েকটা বুদ্বুদ দেখতে পেল রানা। এক মিনিট পেরিয়ে গেল, তারপর পানির উপর ভেসে উঠল ফু-চুং, ইশারা করল ডানহাত তুলে।

হুক তুলে নিতে শুরু করল রানা, কাজ শেষ হতেই পিছিয়ে নিল ক্রেন। ট্রলির দিকে চলেছে। থামল গিয়ে দ্বিতীয় মিসাইলের উপর। ওটা নিয়ে অপেক্ষা করছে আতাসি। আবারও নেমে এল হুক। কিছুক্ষণ পর মিসাইল ও কেবলগুলো থেকে সরে গেল আতাসি। রেইল বেয়ে ধীরে চলল ক্রেন। অভযার্ভেশন প্ল্যাটফর্মে ফু-চুংকে দেখতে পেল রানা। সে ঝুঁকে পড়েছে কম্পিউটারের উপর। আতাসির মাথার অনেক উপরে জ্বলে উঠল সবুজ বাতি। কয়েক সেকেণ্ড পর খুলতে শুরু করল সাগর মুখো প্রকাণ্ড দরজা। সঠিক কম্বিনেশন পেয়েছে ফু-চুং। এবার কী করতে হবে উর্বশী জানে, LIDAR সিস্টেম ওকে বলে দেবে মেঝের ঠিক কোথায় রয়েছে মিসাইল। অপেক্ষা করবে ও, রানা যখনই বলবে, কাজে নামবে।

কিছুক্ষণ পর মিসাইল নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেল ক্রেন, কেবল নামাতে শুরু করল রানা। এদিকে ফু-চুং ফিরে এসেছে, ওকে সাহায্য করতে হাজির হয়েছে আতাসি। সঙ্গে সবার ডাইভ ইকুইপমেন্ট। বাদ পড়েনি রানার স্কুবা রিগ ও ড্রাই সুট। ড্রাই ডকের শেষ মাথায় নামিয়ে রাখল ওগুলো। একবার কাঁধের উপর দিয়ে চাইল রানা, কাজ এখনও শেষ হয়নি সোহেলের। তবে শিগগির ফিরবে ওরা। তার আগে সঠিক পজিশনে ক্রেন রাখতে হবে, পানির নীচে নামিয়ে দিতে হবে মিসাইলটা। কাজ শেষ হলেই ক্রেন ফিরিয়ে নেবে, রওনা হওয়ার আগে কারিগরি করবে খুদে কন্ট্রোল প্যানেলে। ড্রাই ডক নতুন করে চালু করতে হলে অন্তত কয়েক ঘণ্টা লাগবে ইজরায়েলিদের। এদিকে বিশাল দুই কবাটের নিয়ন্ত্রক কম্পিউটার বিস্ফোরিত হবে। ওটার ভিতর সি-ফোর বসিয়েছে ফু-চুং। বেকায়দা ভাবে আটকে থাকবে বিশাল দরজা।

মিসাইল দুটো সরিয়ে দেয়া সংক্রান্ত সমস্ত কাজ শেষ হতেই সময় নষ্ট করল না রানা, আগের জায়গায় নিয়ে গেল ক্রেন। পটাপট ছিঁড়ে ফেলল কন্ট্রোল প্যানেলের তারগুলো। কষ্ট করে নেমে এল না মই বেয়ে—সোজা চেপে বসল বিশাল আই বিমের উপর। জিনিসটা গেছে দালানের প্রস্থ জুড়ে। এক মিনিট পেরুলো না, তার আগেই কেবল স্পুলের কাছে পৌঁছে গেল রানা। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল কেবল, তার পর নামতে শুরু করল দ্রুত। একবার কাঁধের উপর দিয়ে চাইল, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে সোহেল, এগিয়ে চলেছে ফু-চুং ও আতাসির দিকে। একইসঙ্গে কাজ শেষ করেছে ওরা, ভাবল রানা। পানি থেকে দশ ফুট উপরে চলে আসতেই হাত ছেড়ে দিল ও, প্রায় নিঃশব্দে ডুবে গেল। ভেসে উঠল দশ সেকেণ্ড পর।

সাহায্য করতে তৈরি আতাসি, সঙ্গে রয়েছে রানার ইকুইপমেণ্ট। দ্রুত হাতে রানার পিঠে ঝুলিয়ে দিল ট্যাঙ্ক, পরিয়ে দিল হেলমেট।

'উর্বশী, শুনছ?' হেলমেটের মাধ্যমে বলল রানা। পানি কেটে ভাসছে। ওর হেলমেটের সঙ্গে এমন ভাবে ডাইভ সুট তৈরি, ওদুটো একসঙ্গে না থাকলে পানির নীচে যোগাযোগ করা অসম্ভব। সেই ড্রাই সুট রয়েছে এখন আতাসির বগলের নীচে।

'শুনছি, রানা,' বলল উর্বশী। 'ভালই ডাইভ দিয়েছ। পানিতে পড়ার শব্দ শুনে মনে হলো, স্কোর করেছ নয় পয়েণ্ট দুই।'

'মাত্র ওইটুকু মনে হলো? রিভার্স ডাবল হাফ টুইস্ট, সঙ্গে ফুল গেইনার,' বিনা দ্বিধায় মিথ্যা বলল রানা। ভাল করেই জানে, নীরব থাকবে আতাসি, ফু-চুং ও সোহেল। 'আমাদের সঙ্গে দুটো মিসাইল, উর্বশী। রিকভারি অপারেশন শুরু করো। দুই দলে এয়ার লকে ঢুকছি আমরা।'

'অ্যাফারমেটিভ।'

ওরা সবাই নেমে পড়েছে পানিতে, দুলে উঠল সবার দেহ। ডিসকভারি নিয়ে সামনে বাড়ছে উর্বশী।

রানার সঙ্গে ডাইভ মাস্ক নেই, কাজেই ওকে হাত ধরে নিয়ে চলল আতাসি, পৌছে দিল এয়ার লক পর্যন্ত। প্রথমে ভিতরে ঢুকল রানা, তারপর ওর সাগরেদ। পরে ঢুকেছে, কাজেই হ্যাচ আটকে দিল আতাসি।

ভাবছে রানা, 'বাপু দানব, আমি না চ্যাপ্টা হয়ে মরি!'

তবে কষ্ট করে বাড়তি খানিক জায়গা করে দিল আতাসি। কিছুক্ষণ পর এয়ার লকের দেয়ালে ইণ্ডিকেটার সবুজ হয়ে উঠল। চেম্বার থেকে পানি সরাতে শুরু করেছে ভালভগুলো।

থুতনি পর্যন্ত পানি নেমে আসতেই হেলমেট খুলে ফেলল রানা। ঠাণ্ডা, কনকনে মনে হলো বাতাস। তাও ভাল লাগছে। এক ঘণ্টার বেশি হলো কেমিক্যালের গন্ধওয়ালা ড্রাই ডকে আটকে ছিল। বদ্ধ এয়ার লকে খানিক মোচড়া-মোচড়ি করে পিঠ থেকে ট্যাঙ্ক নামিয়ে ফেলল রানা। কিছুক্ষণ পর খালি হয়ে গেল চেম্বার, দরজা খুলে ঢুকে পড়ল সাবমারসিবলের ভিতর। ভেজা পোশাক নিয়ে ককপিট সিটে বসে পড়তেই জিজ্ঞেস করল উর্বশী, 'কী অবস্থা? বোধহয় বড় কোনও সমস্যা হয়নি?'

'সামান্যই, তবে সামলে নেয়া গেছে,' বলল রানা।

দু'জনের মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে কম্পিউটার মনিটর। মিনি সাবের নীচ হতে আসছে ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশনের ছবি। লো-লাইট ক্যামেরা দেখিয়ে দিল প্রথম মিসাইলের কাছ থেকে সামান্য ডানদিকে রয়েছে সাব। টুকটাক অ্যাডযাস্টমেণ্ট করল উর্বশী, নড়ে উঠল ধাতব বাহু। টাংস্টেন ও স্টিলের আঁকশি দু'দিক দিয়ে ধরল মিসাইলকে। কিছুক্ষণ পর জিনিসটা এসে

মিশে গেল ডিসকভারির পেটের সঙ্গে। হুকগুলো আটকে নিল মিসাইলকে।

উর্বশীকে সাহায্য করছে রানা। ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক কিছুটা খালি করতেই আবার নতুন করে ভারসাম্য ফিরে পেল ডিসকভারি।

ডিরেকশনাল থ্রাস্টার দিয়ে সাবকে সরাতে শুরু করেছে উর্বশী, দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছে নীচের ঠোঁটের কোনা। সুন্দর মুখটা এখন গম্ভীর। বিড়বিড় করে নিজেকে একটা গালি দিল, দ্বিতীয় মিসাইলের খানিকটা সামনে চলে গেছে। নিচু স্বরে বলল, 'জোয়ার এসেছে।' একটু পিছিয়ে এল রিভার্স পাওয়ারে।

এয়ার লক কন্ট্রোল প্যানেলে টিপটিপ করে জ্বলছে লাল বাতি, হঠাৎ সবুজ হয়ে উঠল। সাবমারসিবলে ঢুকেছে ফু-চুং-আতাসি।

স্রোতের দ্বিতীয় ধাক্কায় আবারও কিছুটা সামনে চলে গেল ডিসকভারি। মিসাইল একটু পিছনে। মোটরের গতি খানিক বাড়াল উর্বশী। ড্রাই ডকের ভিতর ঢুকছে জোয়ারের জোরালো ঢেউ, সেই গতি সামলে নিয়ে সঠিক জায়গায় থাকতে হবে। ছোট্ট সাবমারসিবল নিয়ে খেলছে উল্টোপাল্টা স্রোত।

রানা জানে সামলে নেবে উর্বশী, নইলে আগেই জানিয়ে দিত ড্রাই ডকে ঢোকা সম্ভব হবে না। তা ছাড়া, এখনও সাহায্য চায়নি ও। ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশনে চোখ রেখেছে রানা। তৃতীয়বার ভুল হলো না উর্বশীর, খানিকটা ব্যালাস্ট ছেড়ে দিল, সাব স্থির হলো মিসাইলের উপর। আঁকশিগুলো জড়িয়ে নিল গোলাকার মিসাইল, নিয়ে চলে গেল ডিসকভারির পেটে রাখতে। ট্যাঙ্ক থেকে খানিক বাতাস বের করে দিয়ে ভারসাম্য ঠিক করে নিল উর্বশী। নিচু স্বরে বলল, 'তিনবার চেষ্টার পর!'

সামনের দিকে বাড়িয়ে রাখা বাহু গুটিয়ে নিল রানা, সেটা চলে গেল ডিসকভারির থুতনির কাছে। কাজটা শেষ হতেই

জয়স্টিক নাড়তে শুরু করল উর্বশী। ঘুরছে সাব। লিডার সিস্টেম থেকে তথ্য এল, আংশিক খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল উর্বশী বাইরের সাগরে। ডানদিকে রওনা হলো সাব।

জানতে হবে ব্যাটারির শক্তি, ডিসকভারির গতি এবং পানির গতিবেগ। কম্পিউটারে তথ্য দিতেই জানিয়ে দিল ডিসকভারি কতদূর যেতে পারবে। রানা ও উর্বশীর পিছনে ওয়েট সুট ছাড়ছে ফু-চুং ও আতাসি, ঝটপট পরে নিল শুকনো পোশাক।

ওরা যে হিসাব করেছে তার চেয়ে জোর গতিতে এসেছে জোয়ার। সাবমারসিবলে রয়েছে মাত্র দুই ঘণ্টা চলবার মত ব্যাটারি। মার্ভেলে পৌঁছুনোর পর খুব বেশি শক্তি অবশিষ্ট থাকবে না। মন কু ডাকছে রানার। অনুভব করছে, ইজরায়েলিদের কাছ থেকে যত দ্রুত সম্ভব সরে যেতে হবে।

'ডিসকভারি থেকে মার্ভেল,' রেডিও করল রানা।

'গলা শুনে খুশি লাগছে, মাসুদ ভাই,' জানাল বাংলাদেশ নেভির লেফটেন্যান্ট মুর্তোজা। 'সব ঠিক মত চলেছে?'

'বাচ্চার হাত থেকে মোয়া কেড়ে নেবার মত। জাহাজের রূপ পাল্টে নেয়ার কাজ চলছে?'

'ঘড়ি ধরে, মাসুদ ভাই। বো'র মাথা থেকে খাপ সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আগের মত হয়ে গেছে চিমনি। কণ্টেইনার খোলার কাজ চলছে।'

'গুড। মুর্তোজা, গগলকে জানিয়ে দাও তোমরা আধ ঘণ্টা পর রওনা হবে। তিন নট গতি তুলবে।' ডিসকভারি চলেছে ঘণ্টায় চার নট গতিতে। 'তোমরা বন্দর থেকে বেরিয়ে গেলে দেখা করব আমরা।'

'বন্দরের দিকে আসছে দুটো জাহাজ, আপনাদেরকে তুলে নেয়া কঠিন হবে।'

'তবুও। চলার পথে উঠব আমরা।' মুন পুলে উঠে যাওয়া এমনিতেই কষ্টসাধ্য, তার উপর অনেক বেশি বিপজ্জনক চলন্ত জাহাজে ওঠা।

'এ না করলেই নয়?' দ্বিধা নিয়ে বলল উর্বশী।

কোনও ব্যাখ্যা দিল না রানা।

আগের নির্ধারিত সময়ের দু'ঘণ্টা পর মার্ভেলের নীচে হাজির হলো ডিসকভারি। সরে এসেছে ইজরায়েলি উপকূল থেকে। জাহাজের চল্লিশ ফুট নীচে হাঁ হয়েছে মুন পুলের দরজা, মিশে গেছে খোলের সঙ্গে। মার্ভেলের ভিতর জ্বলছে লাল ব্যাটল ল্যাম্প, মুন পুলের পানির উপর পড়ছে রক্তিম আলো। সাব থেকে ওদের মনে হলো দোজখের দরজা লক্ষ্য করে চলেছে।

মার্ভেলের শ্লথ গতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে উর্বশী, দরজার মাঝ দিয়ে উঠবার জন্য প্রস্তুতি নিল। সাধারণত মুন পুলে নামে ডাইভাররা, কেবল দিয়ে বেঁধে দেয় ডিসকভারিকে। জাহাজে তুলে নেয়া হয় উইঞ্চ দিয়ে। কিন্তু এখন গতি মাত্র তিন নট হলেও, যথেষ্ট জোরে বইছে ঢেউ এবং স্রোত, কাজেই ঘেরা জায়গায় ডাইভিং করা অসম্ভব।

গতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার পর ডায়াল করে ব্যালাস্ট কমিয়ে আনল উর্বশী, ট্যাঙ্কে পাম্প করছে। ধীরে ধীরে ভেসে উঠতে শুরু করল ডিসকভারি।

'তাড়াহুড়ো করবেন না, লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার,' কম লিঙ্কে জানাল মুর্তোজা। 'তবে উপরে উঠতে চার মিনিট পাবেন। এরপর সরে যেতে হবে শিপিং লেন থেকে। সামনে থেকে জাহাজ আসছে।'

'একে বলে মানসিক চাপ,' বিড়বিড় করে বলল উর্বশী। চোখ সরছে না কম্পিউটারের স্ক্রিন থেকে। আরও ব্যালাস্ট রিলিজ

করল। আলতো করে ধরেছে জয়স্টিক ও থ্রটল। ছোট ছোট টোকা দিয়ে কারেকশন করে চলেছে।

চোখের সামনে বিশাল হয়ে উঠছে লাল গহ্বর।

'সুন্দর ভাবে চলছে সব,' কো-পাইলটের সিট থেকে বলল রানা।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে মুন পুলের দরজার নীচে এসে থামল ডিসকভারি। শুনতে পেল ওরা জাহাজের অত্যাধুনিক ইঞ্জিনের গুঞ্জন, সঙ্গে ড্রাইভ টিউবে বয়ে চলা পানির শোঁ-শোঁ আওয়াজ। সামান্য গতি কমাল উর্বশী, চাইছে মুন পুলের পিছন দিকে ভেসে উঠতে। এখন সাব-এর ফিন ও প্রপেলারগুলো ইস্পাতের দেয়াল থেকে মাত্র এক ফুট দূরে।

'আমরা চললাম,' নিচু স্বরে বলল উর্বশী। পরক্ষণে টিপে দিল সুইচ। হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল ধাতব সমস্ত ব্যালাস্ট, সাগরের বুকে গিয়ে পড়ল পাঁচ শ' কেজি ওজনের লোহার বল।

হঠাৎ বিদ্যুদ্বেগে উঠতে শুরু করল ডিসকভারি, ভুস করে ভেসে উঠল মুন পুলে। হাঁড়ির ভিতর যেন ফুটছে পানি। মার্ভেল তিন নট গতিতে চলেছে, ফলে দ্রুত নড়ছে পুলের পানি। সামনের দিকে রওনা হয়ে গেল ডিসকভারি। দ্রুত ইমার্জেন্সি রিভার্স থ্রাস্টার চালু করল উর্বশী। দৈর্ঘ্যে ডিসকভারি সুইমিং পুলের ঠিক অর্ধেক, কাজেই মুহূর্তে চলে আসছে সামনের দেয়াল! সংঘর্ষ হতে পারে, তাই ওদিকে রাখা হয়েছে ইনফ্লেটেবল ফেণ্ডার। তবে সামলে নিল উর্বশী, ডিসকভারি শুধু টোকা দিল দেয়ালে।

দু'জোড়া পা উঠে এল সাবের উপর। হার্ডপয়েন্টে লিফটিং লাইন আটকে দিল টেকনিশিয়ানরা। অনেক নীচে এরইমধ্যে বন্ধ হতে শুরু করেছে মুন পুলের দরজা।

ফোঁস করে শ্বাস ফেলল উর্বশী, থ্রটল থেকে সরিয়ে নিল

হাত।

‘ওয়াণ্ডারফুল!’ নিচু স্বরে বলল রানা।

‘থ্যাঙ্কস,’ উর্বশীর ক্লান্ত চোখ দুটো রানার দিকে চাইল। ‘এখনকার মত যথেষ্ট। চললাম, আমাকে ডাকছে বাথটাব।’

‘বিশ্রাম নাও,’ সিট থেকে পিছলে বেরিয়ে এল রানা, প্লাস্টিকের মেঝের উপর জমছে পানি। ‘পরে দেখা হবে।’

হ্যাচের কাছে দাঁড়াল ওরা। ক্রেডলে ঝুলিয়ে দেয়া হলো ডিসকভারিকে। উপর থেকে খুলে গেল হ্যাচ। ‘চলে আসুন,’ বলল এক টেকনিশিয়ান।

‘লেডিজ ফার্স্ট,’ একটু সরে দাঁড়াল সোহেল।

প্রথমে উঠে গেল উর্বশী, তারপর একে একে ওরা। মেঝেতে নেমে পড়তেই রানার দিকে হেডসেট বাড়িয়ে দিল এক টেকনিশিয়ান।

অপারেশন্স সেন্টারে যোগাযোগ করল রানা, ‘গগল, তুমি কি হেলম্-এ?’

‘হ্যাঁ,’ জবাব দিল গগল।

‘মুন পুলের দরজা বন্ধ হলে গতি তোলো আঠারো নট-এ। সরে যেতে চাই ইজরায়েলি উপকূল থেকে। পনেরো ঘণ্টা পর বাংলার গৌরব তাজউদ্দীনের সঙ্গে রন্দেভু।’

‘ঠিক আছে।’

নির্দিষ্ট সময়ে মিসাইল সরিয়ে দিতে হবে, নইলে পশ্চিমা স্পাই স্যাটালাইটগুলো তাদের মালিকদের জানিয়ে দেবে কী ঘটেছে।

‘মুর্তোজাকে বলো ইজরায়েলি মিলিটারি ওয়েভ লেংথে কান রাখুক। আমি কেবিনে ফিরছি। অস্বাভাবিক কিছু শুনলে যেন সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ঘুম থেকে তোলে।’

ডিসকভারি থেকে মিসাইল সরিয়ে নেবে ফু-চুং ও অনিল, মটোরাইযড কার্ট দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে নিরাপদ জায়গায়। এরইমধ্যে কম্পিউটার ড্রাইভ একটা ওয়াটারপ্রুফ হার্ড কেসে রেখেছে সোহেল। ওটা যাবে বাংলাদেশি জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে।

'বসের সঙ্গে কথা বলবি না, রানা?' বলল সোহেল। 'হয়তো রাতে ঘুমাতেই পারেননি। একটু পর অফিসে পাবি।'

'তুই কথা বল্। তারপর ঘুমাতে যা।'

কব্জি ঘুরিয়ে চট্ করে ঘড়ি দেখল সোহেল। 'প্রায় পাঁচটা বাজে। আর শোবো না। ক্রুদের সঙ্গে লেগে থাকি, মার্ভেল বদলে নেয়ার কাজ শেষ হতেই আসছে বাবুর্চির গ্র্যাণ্ড নাস্তা।'

'চললাম তা হলে,' দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল রানা।

Posh শব্দটা এসেছে ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সময়কালে। সে সময়ে মুম্বাই ও দিল্লির ইমপিরিয়াল পদ-প্রাপ্ত জাহাজ-যাত্রীরা এ দেশে আসবার সময় জাহাজে বুক করত পোর্টসাইডের কেবিন। ইংল্যাণ্ড ফিরবার সময় পছন্দ ছিল স্টারবোর্ড কেবিন। এর কারণ ছিল তাদের কেবিন সবসময় থাকত ছায়ার ভিতর। বুকিং এজেন্টরা, 'পোর্ট আউট, স্টারবোর্ড হোম'কে সংক্ষেপে বলত পশ। এর ফলে ইংরেজি ভাষায় যোগ হয় ওই নতুন শব্দ।

রানার কেবিন মার্ভেলের স্টারবোর্ড সাইডে, কিন্তু পশ্চিমদিকে রওনা হওয়ায় পোর্টহোল দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে সকালের রোদ। মুখের উপর আলো পড়তে হঠাৎ জেগে গেল রানা। এক সেকেণ্ড বুঝল না কেন ভেঙেছে ঘুম। পরক্ষণে শুনতে পেল টেলিফোনের টিট-টিট।

বিছানা থেকে চোখ পড়ল বিরাট গোল দেয়াল-ঘড়ির উপর। উঠে বসল ও। এখনও সকাল আটটা বাজেনি। হ্যাণ্ডসেট তুলে নিল। 'হ্যালো, রানা বলছি।'

'আতাসি, বস্। খেল-খতম, পয়সা হজম। ইজরায়েলি মিসাইল, সাবমেরিন সব খতম।'

ভাল সংবাদ, তবুও ভুরু কুঁচকে গেল রানার। চিফকে এতক্ষণে জানিয়ে দিয়েছে সোহেল, সফল হয়েছে ওদের অ্যাসাইনমেণ্ট। তার মানে, এশিয়ার দেশগুলো থেকে পশ্চিমা দুনিয়াকে এবার জানানো হবে—তোমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। আমরা লড়তে তৈরি। কিন্তু তা হলে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করল কেন আতাসি?

'আতাসি, কোনও সমস্যা?'

'পাঁচ মিনিট আগে শুনলাম অ্যাশকেলন থেকে চেঁচামেচি হচ্ছে। তারপর সব চুপ।'

কী ঘটেছে বুঝতে সময় নিয়েছে বেস কমাণ্ডার, তারপর যোগাযোগ করেছে তেল আবিবের সঙ্গে। নিশ্চয়ই উঁচু পর্যায় থেকে নেভাল বেসকে বলা হয়েছে, তারা যেন রেডিও বা অনিরাপদ টেলিফোন ব্যবহার না করে। যোগাযোগ করতে হলে ল্যাণ্ড ফোনে কথা বলবে তারা।

প্রথম গালফ যুদ্ধে আমেরিকা দুনিয়াকে দেখিয়ে দিয়েছে কীভাবে কান পাতা উচিত। স্যাটেলাইট ও গ্রাউণ্ড লিসেনিং স্টেশনগুলো বা এনএসএ প্রায় প্রতিটি মোবাইল টেলিফোন, রেডিও ব্রডকাস্ট, ফ্যাক্স ট্র্যান্সমিটাল ইত্যাদি ধরেছে, এবং সেসব তথ্য নিজেদের কাজে লাগিয়েছে আমেরিকা। তারা আগেই জানত সাদ্দাম হোসেন কী কমাণ্ড দিয়েছেন, কী করতে চলেছে প্রতিটি ফ্যাসিলিটি। তখন প্রতিটি দেশ স্পষ্ট বুঝেছে

আমেরিকানদের শক্তিশালী টেকনোলজি তাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। যে কারণে দেশগুলো কোটি কোটি টাকা খরচ করে মাটির নীচে বসিয়েছে কেবল। সরাসরি ট্যাপ না করলে এখন নিরাপদ থাকবে তাদের বার্তা।

অ্যাশকেলন নেভাল বেসে প্রথম কিছুক্ষণ তারা খোলাখুলি কথা বলেছে, যে কারণে ইণ্টারসেপ্ট করতে পেরেছে মার্ভেল।

'যা শুনেছ তা থেকে কী বুঝলে?' জানতে চাইল রানা।

'বলেছে তাদের ড্রাই ডকে ঢুকে পড়ে একদল কমাণ্ডো। ওখানে বেশ কিছু বিস্ফোরণ ঘটে। বিধ্বস্ত হয়েছে কণ্ট্রোল রুম। তলিয়ে গেছে দুটো সাবমেরিন। পাখিগুলো আর নেই। ফাটিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'ওরা বোধহয় মিসাইলের নাম দিয়েছে পাখি।'

'তারপর নির্দেশ আসে ডিফেন্স মিনিস্ট্রি থেকে। বলা হয়, নবী মুসার কণ্ঠ অনুসরণ করুন।'

'তার মানে মিলিটারি কমিউনিকেশন লাইনে আলাপ করতে বলেছে।' কর্ডলেস ফোন কাঁধ ও ঘাড়ের মাঝে গুঁজল রানা, বিছানা ছেড়ে উঠে দ্রুত হাতে পরতে শুরু করেছে পোশাক। 'আর কিছু, আতাসি?'

'না। আর কিছুই না।'

ও নিজে ইজরায়েলি জান্তা হলে কী করত, ভাবতে চাইল রানা। 'ওদের প্রথম কাজ অ্যাশকেলন বন্দর বন্ধ করে দেয়া। তন্নতন্ন করে খুঁজবে প্রতিটি জাহাজ। সম্পূর্ণ সতর্ক রাখবে নেভিকে। উপকূল থেকে পঞ্চাশ মাইলের ভিতর যত জাহাজ, যে-কোনও মূল্যে থামাবে সেগুলোকে, সার্চ করবে।'

'আমরা কিন্তু সেই বৃত্তের ভিতর, বস্,' বলল আতাসি।

'গগলকে জানিয়ে দাও যত দ্রুত সম্ভব ভাগতে হবে। পাঁচ

মিনিটের মধ্যে অপারেশন্স সেন্টারে আসছি। সিনিয়ার স্টাফদের ওখানে থাকতে বলো।' মাত্র দুই ঘণ্টা আগে আতাসি ছাড়া সবাই ডিউটি শেষ করেছে, কিন্তু রানা চাইছে ইজরায়েলিদের নাগালের বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকুক ফু-চুং, সোহেল, অনিল ও উর্বশী। যে-কোনও সময় দরকার পড়তে পারে ওদেরকে।

মার্ভেল জাহাজটা যখন মিস্টার পাপাগোপালার কাছ থেকে নিল রানা, প্রচণ্ড পরিশ্রম দিয়ে বদলে নেয় অপারেশন্স সেন্টারকে। বলা যায় জাহাজের মগজ ওটা। ইঞ্জিন, ওয়েপন্স সিস্টেম, ফায়ার-সাপ্রেশন স্প্রিংলার থেকে শুরু করে কমিউনিকেশন সিস্টেম পর্যন্ত সবই নিয়ন্ত্রণ করা যায় ওখান থেকে। জাহাজের বাইরের অংশ যেমন ধচা-পচা, ঠিক তার উল্টো ভিতরটা—রয়েছে বর্তমান সময়ের প্রতিটি হাই-টেক যন্ত্র। সামনের দেয়ালে রয়েছে প্রকাণ্ড এক ফ্ল্যাট-প্যানেল 'স্ক্রিন, ওখানে একইসঙ্গে দেখা যায় বারোটা দৃশ্য। জাহাজের ক্যামেরা, সাবমারসিবল, আনম্যান্‌ড্ রোভ বা রবিনসন আর-৪৪ হেলিকপ্টার থেকেও আসে ছবি।

ফ্ল্যাট প্যানেলের ঠিক নীচে রয়েছে ওয়েপন্স স্টেশন ও হেলম্, পাশে আতাসির কমিউনিকেশন কন্সোল। খানিকটা পিছনে সোহেলের চেয়ার। প্রধান সোনার ওয়াটারফল ডিসপ্লে জ্বলজ্বল করে অন্ধকার ঘরে, ওটার সামনে থাকে উর্বশী। মাঝখানে রয়েছে রানার চেয়ার। নিজের জন্য শখ করে কেনেন ওটা পাপাগোপালা। ওখান থেকে ঘরের সবকিছু নজরে আসে। প্রয়োজন পড়লে যে-কোনও স্টেশনের নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নিতে পারবে রানা।

অপারেশন্স সেন্টারের ছাত বেশ নিচু, বারোটা কম্পিউটার ডিসপ্লে থেকে আসছে নানান রঙের আলো। দেখলে মনে হয় জায়গাটা নাসার তৈরি মিশন-কন্ট্রোল রুম।

ইতিমধ্যে এসে নিজের চেয়ারে বসেছে পরিশ্রান্ত সোহেল।

রানা আসবার তিরিশ সেকেণ্ড আগে হাজির হয়েছে গগল, অনিল, ফু-চুং ও উর্বশী। নিজের সিটে বসে দাড়ি হাতড়ে চলেছেন পাইলট আলম সিরাজ। কিছু দিন হলো এমআইটি থেকে পিএইচডি নেয়ার চেষ্টা করছেন। সর্বক্ষণ মাথার ভিতর ঘুরছে জটিল সব অঙ্ক।

কম্পিউটারের ডিসপ্লে কাত করে ওটার দিকে চাইল রানা, এমন সময় ওর ডান হাতের পাশে পৌঁছে গেল বাষ্প ওঠা কফি।

নিঃশব্দে হাজির হয়েছে বাবুর্চি মোস্তফা আবুল। 'আপনার জন্য কফি, স্যর।'

'ধন্যবাদ।'

'নাস্তা এখানে দেব?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

নীরবে বিদায় নিল বাবুর্চি। কাপের উপর দিয়ে সামনের দিকে চাইল রানা। চারপাশের সাগর চোখে পড়ছে রেইডার দিয়ে। স্ক্রিনের উপর অংশে ইজরায়েলি উপকূল। সুয়েজ খাল থেকে মেডিটারেনিয়ান সাগরে বেরিয়ে এসেছে দুটো সুপারট্যাঙ্কার। পুবে অনেকটা দূরে বিশাল এক জাহাজ। ওটা সম্ভবত আমেরিকান এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার।

মার্ভেলের গতি ও দিক লক্ষ করল রানা। এবার দেখে নিল সাগরতল কত নীচে। গভীরতা চার শ' ফুট। সহজে আসতে পারবে ইজরায়েলি সাবমেরিন। হামলা আসতে পারে হেলিকপ্টার বা বিমান থেকেও। চট্ করে একবার স্ক্রিনের দিকে চাইল রানা। ক্যামেরাগুলো ফিড দিয়ে চলেছে। মার্ভেলের বাইরের অংশ স্বাভাবিক। যেমন হওয়া উচিত। মোটা চিমনি দিয়ে বেরুচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়া। নাম পাল্টে নেয়া হয়েছে। জ্যাক স্টাফে উড়ছে গ্রিসের পতাকা। মাস্তুলের উপরের ক্যামেরা থেকে একটা ট্যাঙ্কার

দেখা গেল। কিছুক্ষণ আগে ওটাকে পেরিয়ে এসেছে মার্ভেল। পশ্চিম দিকে আধ মাইল দূর দিয়ে চলেছে এক কন্টেইনার জাহাজ।

'সোনারে কিছু, উর্বশী?'

'আশপাশে নয়টা জাহাজ আওয়াজ তুলছে, আর তেমন কিছুই নয়।' আরও কী যেন বলতে গিয়ে চুপ হয়ে গেল উর্বশী, কুঁচকে উঠেছে ভুরু।

'ব্যাপারটা যত ছোটই হোক, বলে ফেলো,' বলল রানা।

'এখানে আসবার সময় আতাসির কাছে শুনেছি অ্যাশকেলন-এ থেমে যায় আলাপ। তার আগে ট্র্যান্সমিট করা হয়। বন্দর থেকে অনেক দূর সাগরে যোগাযোগ করে।'

'তারপর আর যোগাযোগ করেনি?' আতাসির দিকে চাইল রানা।

আস্তে করে মাথা নাড়ল বেদুঈন। 'মাত্র ওই একবার।'

এ তথ্য কী প্রমাণ করে, নিজেকে জিজ্ঞেস করল রানা। এক মুহূর্ত পর বলল, 'কোনও জঙ্গি বিমান বা হেলিকপ্টার?'

'আমাদের পুবে একটা এএসডাব্লিউ প্লেন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার থেকে ওঠে,' বলল আতাসি। 'একঘণ্টা আগে আমাদের মাথার উপর চক্কর কেটেছে। তবে ইজরায়েল থেকে কিছু নয়।'

তবে বিপদ নাও হতে পারে, ভাবল রানা।

পরক্ষণে উর্বশীর উঁচু কণ্ঠ শুনতে পেল: 'সোনার কন্ট্যাক্ট! সাত হাজার গজ! টর্পেডো আসছে! আমাদের অ্যাম্বুশ করেছে ওরা! বো ডোর খোলা, টিউব ভরে গেছে পানিতে।'

টর্পেডো থেকে এখনও পাঁচ মাইল দূরে মার্ভেল, রানা জানে ওরা বিপদ এড়াতে পারবে। শান্ত স্বরে বলল, 'ট্র্যাক করো। আগে দেখো ওটা কোনদিক দিয়ে আসছে। পরে ঠিক করা যাবে কী

করা যায়।'

'সোনার কণ্ট্যাক্ট!' আবারও বলে উঠল উর্বশী। 'পানিতে আরেকটা টর্পেডো! মোটামুটি সঠিক টার্গেট দিল কম্পিউটার। প্রথম মাছ কণ্টেইনার শিপের দিকে চলেছে। জাহাজটার নাম এক্সপ্লোরেশন। সুয়েজ থেকে বেরিয়ে চলেছে সাইপ্রাসের দিকে।'

ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে পরিস্থিতি।

'আমেরিকান ফ্লিট থেকে সতর্ক করা হলো,' বলে উঠল আতাসি। 'ওরা টর্পেডো রওনা হওয়ার আওয়াজ পেয়েছে। আকাশে বিমান তুলছে।'

'কপাল মন্দ, দু'দলের মাঝে আটকা পড়ছি,' বলল অনিল।

থমথম করছে অপারেশন্স সেণ্টারের ভিতর। তারপর চাপা স্বরে বলল উর্বশী, 'নতুন কণ্ট্যাক্ট! তৃতীয় টর্পেডো রওনা হয়েছে! অর্ধ-চন্দ্রের মত ঘিরতে চাইছে আমাদের। পিছনে কণ্টেইনারশিপ আর সুপারট্যাঙ্কার।'

একটা টর্পেডো এলে সহজে সামলে নিত রানা। দুটো হলেও পাশ কাটাতে চাইত। কিন্তু তিনটে টর্পেডো উদয় হওয়ায় উদ্ধার পাবে সে-সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। ওরা দ্রুতগতি তুলে কণ্টেইনার শিপ ও ট্যাঙ্কারকে মাঝখানে রাখতে পারে। কিন্তু সরাসরি ও-দুটোর উপর হামলে পড়বে টর্পেডো। সুপারট্যাঙ্কারের হোল্ড ভরা ক্রুড অয়েলে, কাজেই যে করে হোক রক্ষা করতে হবে ওটাকে।

'চার নম্বর লঞ্চ করেছে,' প্রায় অবিশ্বাস নিয়ে বলল উর্বশী। 'চারটে! কণ্টেইনার শিপ থেকে প্রথম টর্পেডো ছয় হাজার গজ দূরে। অন্যগুলোর চেয়ে ধীরে আসছে শেষ মাছটা।'

'অপেক্ষা করছে, অন্যগুলো ফস্কে গেলেও ভুল যেন না হয়,' বলল সোহেল।

প্রথম তিন টর্পেডো টার্গেটে না পৌঁছলে, বা যদি ডেটোনেট

না হয়, হাতে থাকবে আরেকটা। ওই টর্পেডো প্রস্তুত থাকবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে।

এ ধরনের ট্যাকটিক সম্বন্ধে পড়েছে রানা। কিন্তু ওর হাতে এমন কোনও অস্ত্র নেই, যা দিয়ে রক্ষা করবে নিজেদের।

ইজরায়েলি টর্পেডো ডুবিয়ে দেবে মার্ভেলকে, উপায় নেই কোনও!

পাঁচ

ভূমধ্যসাগর।

প্রমোদ-তরী এমভি গোল্ড অভ মার্স।

ভয়ঙ্কর এক দানব খামচে ধরেছে হেলেন জিলের নাক-মুখ। যতই চেষ্টা করুক, শ্বাস নিতে পারছে না সে। চোখে আঁধার দেখছে, বুকের উপর যেন চেপে বসেছে দৈত্য। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে সে। হঠাৎ নাক দিয়ে টেনে নিতে পারল সামান্য বাতাস। তবে ওটুকু যথেষ্ট নয়। যে-কোনও সময়ে জ্ঞান হারাবে। বামদিকে কাত হলো হেলেন, তারপর ডানে! আর কয়েক সেকেণ্ড, তারপর চেতনা হারাবে। উদ্ধার পাওয়ার উপায় কী? মন বলছে, পানির নীচে ডুবে মরছে। এ কথা ভাবলে ভীষণ ভয় লাগে। এর চেয়ে ভয়ঙ্কর মৃত্যু কী হতে পারে? শীতল পানি, তার ভিতর শ্বাস নেয়ার উপায় নেই! বুকে ভীষণ কষ্ট! ভাল হতো কেউ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওকে খুন করলে।

তাই তো করছে এখন!

শেষবারের মত চেষ্টা করল হেলেন জিল। লাফিয়ে উঠে বসতে চাইল।

ফোঁস করে বেরিয়ে এল শ্বাস, হঠাৎ ঘুম ভাঙল হেলেনের। বিন্দু বিন্দু ঘাম ভিজিয়ে দিয়েছে মুখ ও গ্রীবা। বিছানার উপর প্রায় বসে পড়তে চাইল। কিন্তু গায়ের উপর ভারী চাদর ও কম্বল। প্লাস্টিকের পাইপ দিয়ে নাকে ঢুকছে নিখাদ অক্সিজেন। কিন্তু গলা জড়িয়ে ধরেছে পাইপ, সেজন্যই ভেঙেছে ঘুম। ক'দিন ধরে হাঁপানি বেড়েছে তার, বারবার অ্যাটাক হচ্ছে।

দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙবার পর আসছে অ্যাটাক। সাইড টেবিলে চলে গেল হেলেনের হাত। ওখানে ইনহেলার। আবছা ভাবে জানে, ও রয়েছে জাহাজের হাসপাতালে। মাউথপিস তুলে নিল হেলেন, দু'ঠোঁটের ভিতর গুঁজল—দু'বার ওষুধ নেয়ার পর একটু ভাল লাগল।

অস্থির ফুসফুসকে শান্ত করছে ভেন্টোলিন। একটু সহজ হলো শ্বাস-প্রশ্বাস। আরও দু'বার পাম্প করল ওষুধ। এবার শান্ত হবে মন, মিলিয়ে যাবে অ্যাটাকের সিম্পটমগুলো। তবে এখনও ধড়ফড় করছে বুক। কী ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছে সে! নাক থেকে ক্যানিউলার এক অংশ খুলে গেছে বলেই এই অবস্থা। প্লাস্টিকের টিউব লাগিয়ে নিতেই ঠিক ভাবে এল বাতাস। বিছানার পাশে মনিটর, ওটার দিকে চাইল। সরবরাহ বেড়েছে অক্সিজেনের। দু'হাতে মসৃণ করল চাদর, কাজ শেষে শুয়ে পড়ল গর্ত হয়ে যাওয়া বিছানায়।

আজ তিনদিন ডিসপেনসারির ভিতর বন্দি। এভাবে শুয়ে থেকে মহাবিরক্ত হয়ে উঠেছে হেলেন। বারবার গাল দিচ্ছে ওর ফুসফুসকে। অবশ্য বান্ধবীরা নিয়মিত দেখা করছে। কিন্তু ও তো

জানে, কেউ খুশি মনে আসে না। নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়! সেজন্য ওদের দোষ দেবে না। কারই বা ভাল লাগবে? ওকে বিশ্রী লাগে অ্যাটাকের সময়ে। ও যেন কোনও মাছ, পানি থেকে তুলে নেয়ায় খাবি খেয়ে চলেছে! নিজের জন্য কষ্ট লাগছে ওর। কীই বা করবে? শরীরে এতটুকু শক্তি নেই! নিঃসঙ্গ নার্সকে একটু সাহায্য করবে, তা-ও পারে না। তিনদিন হলো বদলানো হয়নি চাদর। শরীরে ঘামের গন্ধ!

হেলেন টের পেল না হঠাৎ কখন পর্দা ঠেলে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেছেন ডক্টর ম্যাক্স কেইন। তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি। ছিলেন ইংল্যাণ্ডের নামকরা হার্টের সার্জন। স্ত্রীর সঙ্গে তালাক হওয়ায় হাসপাতাল থেকে অবসর নেন, চাকরি নেন ডায়মণ্ড ক্রুজ লাইনস-এ। তারপর থেকে রয়েছেন এমভি গোল্ড অভ মার্সে। এখন তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীকে সমস্ত টাকা দিয়ে দিতে হয় না, সেটাই তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা। হাসপাতালে যা রোজগার করতেন, তার চার ভাগের এক ভাগ পেয়েও তাই খুশি। এ জাহাজে রয়েছে স্বাধীনতা ও মানসিক স্বস্তি।

'চেঁচিয়ে উঠলে মনে হলো?' বললেন ডক্টর কেইন। রোগিণীর উপর চোখ নেই, চেয়ে রয়েছেন মনিটরে। 'কোনও সমস্যা?'

'আবার অ্যাটাক,' ঠোঁটে কষ্টসাধ্য হাসি ফুটিয়ে তুলল হেলেন। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার মিষ্টি সুর ওর কণ্ঠে, 'তিনদিন ধরে এ-ই তো চলছে। তবে আগের চেয়ে কষ্ট কম। বোধহয় সুস্থ হয়ে উঠছি?'

'সে সিদ্ধান্ত আমি নেব,' পেশেন্টের দিকে চাইলেন ডাক্তার, চোখে দুশ্চিন্তা। 'তুমি যখন এলে নীল ছিল মুখ। আমার মেয়েরও ক্রনিক অ্যাজমা, তবে তোমার মত এত বেশি নয়।'

'অভ্যেস হয়ে গেছে,' কাঁধ ঝাঁকাল হেলেন। 'আমার প্রথম

অ্যাটাক হয় পাঁচ বছর বয়সে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমার জীবনের চার ভাগের তিন ভাগ কাটিয়ে দিয়েছি এই রোগ নিয়ে।'

'আমার জানা দরকার, তোমার পরিবারে হাঁপানি আর কার কার ছিল।'

'আমার ভাই-বোন নেই, বাবা-মার এ-রোগ ছিল না। তবে মা বলতেন আমার নানী ছোট বেলায় খুব ভুগেছেন।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন কেইন। 'পরিবার থেকে পেয়েছ। সাগরে তুমি বাজে পরিবেশ থেকে অনেক দূরে, কাজেই কমে আসবে সিম্পটম।'

'তাই মনে করতাম,' বলল হেলেন, 'সাগরে যেতে পারব জেনেই জাহাজের ওয়েট্রেস হই। শুনেছি সাগরে মুক্তি মেলে হাঁপানি থেকে। তা ছাড়া, আমাদের শহরও এতই ছোট, কোনও কাজ ছিল না ওখানে। শুধু বন্দরের দিকে চেয়ে থাকা, আর একটা-দুটো নৌকা দেখা।'

'তোমার বাবা-মার কথা খুব মনে পড়ে, তা-ই না?'

'দু'বছর আগে মারা গেছেন তাঁরা,' হেলেনের কালো চোখে ছায়া ঘনাল। 'সড়ক দুর্ঘটনা।'

'সত্যিই দুঃখিত।' প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললেন কেইন, 'তোমার ত্বকের রং ফিরছে। শ্বাস নেয়া সহজ হয়ে উঠছে।'

'তা হলে আমাকে এবার ছেড়ে দেবেন?' জানতে চাইল হেলেন।

'ঠিক এখনই নয়। তোমার অক্সিজেন নেয়ার মাত্রা এখনও অনেক কম। আরেকটু সুস্থ না হলে ছাড়া যাবে না।'

'আপনার বোধহয় ক্রু সোশ্যাল সম্পর্কে কোনও আগ্রহ নেই,' হতাশ হয়ে বলল হেলেন। দেয়াল-ঘড়ি অনুযায়ী আর তিন ঘণ্টা পর শুরু হবে দারুণ সেই পার্টি।

একুশ দিন আগে ফিলিপিন্স ছেড়েছে জাহাজের হোটেলের স্টাফরা। এতদিনে প্রথমবারের মত নাচবার সুযোগ মিলছে। ওয়েটার, ওয়েট্রেস, মেইড ও অফ ডিউটি ক্রুরা দারুণ ফুর্তি করবে। এ ক্রুজে দুর্দান্ত সুপুরুষ ক'জন নরওয়েজিয়ান ক্রু এসেছে। এদের সঙ্গে পরিচিত হতে ব্যস্ত হেলেনের বান্ধবীরা। আসছে কমবয়সী অনেক প্যাসেঞ্জার। গত এক সপ্তাহ ধরে আলাপ চলছে পার্টি নিয়ে।

'না, আসলেই কোনও আগ্রহ নেই,' বললেন ডাক্তার কেইন।

খুদে হাসপাতালের ওয়ার্ডে কে যেন ঢুকছে। আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা। এক মুহূর্ত পর হেলেনের বিছানার পাশে এসে থামল দুটি মেয়ে। গা থেকে ভুরভুর করে আসছে কড়া পারফিউম। এরা এলেন ও জ্যানিক। গোল্ড অভ মার্স-এ আসবার পর এই দু'জনের সঙ্গে ভাল বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে হেলেনের। মিউনিকের মানুষ ওরা। এলেনের বয়স একটু বেশি। তিন বছর হলো ক্রুজ লাইনে। আর জ্যানিক এক মাস আগে এসেছে। ও পেস্ট্রি শেফ। ওরা তিনজন একই ডাইনিং রুমে কাজ করে।

ওরা এসব পোশাক পরেছে পুরুষগুলোকে খুন করতে, মনে মনে বলল হেলেন। এলেনের পরনে কালো ড্রেস, সঙ্গে স্প্যাগেটি স্ট্রিপ। বুকের বিশাল অংশ খোলা। জ্যানিক পরেছে ট্যাঙ্ক ড্রেস, কাপড়ের নীচে আঁটোসাঁটো রাখবার লাইন নেই! ভারী মেকআপ নিয়েছে ওরা, হেসে ফেলছে সামান্য কথাতেই।

'তোমার কী অবস্থা?' বিছানার কিনারায় বসল এলেন। পাত্তাই দিল না ডক্টর কেইনকে।

'জ্বলছি হিংসায়।'

'আমাদের সঙ্গে পার্টিতে যাবে না?' ভ্রূকুটি করে ডাক্তারের দিকে চাইল জ্যানিক। সব দোষ যেন ওই লোকের! ডাক্তার যদি

হেলেনের হাঁপানি নিয়ন্ত্রণে রাখত, তা হলে আজ...

কপালের উপর থেকে ঘাম-ভেজা চুল সরিয়ে দিল হেলেন। 'আমি যদি যেতাম, তাও তো তোমাদের এসব পোশাকের কাছে ড্যাম ডিফিট খেতাম!'

'তোমার কী মনে হয় আমাকে পছন্দ করবে জ্যাকব?' ঠোঁট ফোলাল জ্যানিক।

'বেচারা পুরো পাগল না হয়ে যায়,' বলল এলেন।

'ঠিক জানো তো সে আসছে?' বলল হেলেন। হতাশা কাটাতে চাইছে, এদিকে বুক আঁকড়ে আসছে কষ্টে। ওরা যেসব টেবিলে খাবার সার্ভ করে, সেখানে আসে ওই যুবক। ক্যালিফোর্নিয়ার লোক। ঝলমলে সোনার মত চুল। চোখ দুটো সাগরের মত নীল। পেশিবহুল দেহ, নিয়মিত ব্যায়াম করে। মহিলা স্টাফরা রায় দিয়েছে, ওই জ্যাকব স্মিথ এ জাহাজের সেরা সুপুরুষ। হেলেন জানে, কয়েকবার জ্যানিকের সঙ্গে ডেটও করেছে জ্যাকব।

দু'হাত দিয়ে পোশাক মসৃণ করতে চাইল জ্যানিক। 'আমাকে বলেছে ও আসবেই।'

আলাপে বাধা দিলেন কেইন, 'তুমি নিশ্চয়ই জানো সে রেসপন্সিভিস্ট?'

কড়া চোখে ডাক্তারের দিকে চাইল জ্যানিক। 'আমি বড় হয়েছি চারটে ভাই আর তিন বোনের সঙ্গে। আমার মনে হয় না বাচ্চা না নেয়া খারাপ কিছু হতে পারে।'

'ওরা কিন্তু বাচ্চা না নেয়ার বাইরেও অনেক কিছু করে,' বললেন কেইন।

ডাক্তারের কথা আপত্তিকর মনে হয়েছে জ্যানিকের। তা ছাড়া ও কি জানে না এই গোষ্ঠী কী বিশ্বাস করে? জোর দিয়ে বলল জ্যানিক, 'নিশ্চয়ই জানেন, ওরা মানুষকে সাহায্য করে? পরিবার

পরিকল্পনা নিতে বলে। তৃতীয় বিশ্বের লাখ লাখ অসহায় মেয়েকে সঠিক পথ দেখায়। দুনিয়া ভরা বাড়তি মানুষের কষ্ট কমিয়ে দিতে চায়। উনিশ শ' সত্তর সালে যখন ডক্টর লিঙ্ক চ্যাপেল এই সংস্থা গড়ে তোলেন, তখন দুনিয়া জুড়ে ছিল তিন বিলিয়ন মানুষ। আর আজ? তার দ্বিগুণ। ছয় বিলিয়ন! এবং এখন পর্যন্ত জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা একটুও কমছে না। গত এক হাজার বছরে যত লোক পৃথিবীতে জন্মেছে বা মরেছে, তাদের সবাইকে ধরলে যা হবে, আজকের পৃথিবীর জনসংখ্যা ঠিক ততই! একথা নিশ্চয়ই জানা আছে আপনার?'

'দেখেছি, প্ল্যাকার্ডে এসব লিখেছে,' বললেন ডক্টর কেইন। 'তোমার কি মনে হয়, ওরা যা করছে সব জেনে বুঝে করছে? জ্ঞান দিতে চায় মানব সমাজকে, যে সমাজ কোটি-কোটি বছর ওদের সাহায্য ছাড়াই গড় গড় করে চলে এসেছে এই বর্তমান পর্যন্ত? ...শুনেছি এদের সঙ্গে চলতে হলে যে-কোনও মেয়েকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়, সে বেঁধে নেবে তার ফ্যালোপিয়ান টিউব। সব শুনে আমার মনে হয়েছে এরা অন্ধের মত চলেছে বিপজ্জনক, অন্ধকার পথে। কাল্ট তৈরি করছে আসলে ওরা।'

'জ্যাকবকে এই একই কথা বলেছে অসংখ্য লোক, শুনেছি,' আড়ষ্ট স্বরে বলল জ্যানিক। যেমন করে হোক পছন্দের পুরুষের ধ্যান ধারণাকে রক্ষা করতে প্রস্তুত। 'আপনি সব তথ্য না জেনেই তো কারও ধ্যান-ধারণা-বিশ্বাসকে উড়িয়ে দিতে পারেন না।'

'তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু...' থেমে গেলেন ডাক্তার কেইন। কথা বলে লাভ কী? বিশ-বাইশ বছরের একটা মেয়েকে বোঝাবে কে? রীতিমত খেপে আছে। একে তপ্ত মস্তিষ্ক, তার উপর শরীরে প্রচুর হরমোনের দৌড়ঝাঁপ—এদের কিছু বলে লাভ আছে? 'হ্যাঁ, আসলে কারও বিশ্বাসকে উড়িয়ে দেয়া... যাই হোক, এবার

তোমরা হেলেনকে বিশ্রাম নিতে দাও। পার্টি শেষে জানিয়ে যেয়ো কী কী ঘটেছে।'

'তুমি ভাল থাকবে তো, সুইট গার্ল?' হেলেনের কাঁধে হাত রাখল এলেন।

'কোনও অসুবিধে নেই। যাও, মজা করোগে। কাল কিন্তু কী কী ঘটল সব খুলে বলতে হবে।'

'ভাল মেয়েরা মুখ ফুটে বলে কেউ তাকে চুমু দিয়েছে?' হেসে ফেলল জ্যানিক।

'তা হলে আমি চাই তোমরা খারাপ মেয়ে হয়েই থাকো।'

দুই বান্ধবী পাশাপাশি রওনা হয়ে গেল, কিন্তু দু'সেকেণ্ড পর ফিরে এল জ্যানিক। 'হেলেন, আমি বোধহয় ওই কাজটা করব।'

জ্যানিক কী বলতে চাইছে, জানে হেলেন। সত্যি জ্যাকবের প্রেমে পড়েছে এ মেয়ে। দু'একবার চুমু নয় ব্যাপারটা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়েছে তারা। নিজের বিশ্বাস নিয়ে দীর্ঘ আলাপ করেছে যুবক।

'জ্যানিক, ওটা হবে চোখ বাঁধা অবস্থায় উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়ার মত। তুমি কিন্তু জ্যাকবকে ভাল করে চেনোই না।'

'আমি আসলে কখনও বাচ্চা চাইনি। টিউব কেটে ফেললেই বা কী যায়-আসে?'

দুর্বল লাগছে, তবুও সাবধান করল হেলেন, 'ওর মিষ্টি কথা শুনে নিজের ক্ষতি কোরো না, ভাই।' ভাল করেই জানে জ্যানিক ভাল মেয়ে, কিন্তু মনের দিক থেকে যথেষ্ট শক্ত নয়।

'জ্যাকব কিন্তু আমাকে পটিয়ে কিছু করাচ্ছে না,' বড় দ্রুত বলল জ্যানিক। 'বহু দিন ধরে এ নিয়ে ভাবছি। আমি তিরিশ বছর বয়সে বুড়ি হতে চাই না। আমার মাকে তো দেখেছি! তার বয়স

এখন পঁয়তাল্লিশ, কিন্তু দেখলে মনে হয় সত্তর। আমি ওরকম হতে চাই না। তা ছাড়া...' হাসিতে ঝলমল করে উঠল ওর চোখ। 'তা ছাড়া আমরা গ্রিসে না নামা পর্যন্ত কিছুই ঘটবে না।'

জ্যানিকের হাত শক্ত করে ধরল হেলেন। 'এটা এমন এক সিদ্ধান্ত যেটা তোমার বাকি জীবন বয়ে বেড়াতে হবে। আরও গভীর করে ভেবো, ঠিক আছে?'

'বেশ,' বলল জ্যানিক। শুনে মনে হলো প্রতিজ্ঞা করছে মা'র কাছে।

'ঠিক আছে, গুড,' হাত চাপড়ে দিল হেলেন। 'এবার ফুর্তি, ঠিক না? আমার হয়ে বাড়তি মজা কোরো?'

'তা-ই করব।'

দুই বান্ধবী চলে যাওয়ার অনেক পরেও বাতাসে ভেসে রইল তাদের কড়া পারফিউম।

চিন্তা করে চলেছে হেলেন, কুঁচকে উঠেছে দুই ভুরু। কয়েক দিন পর জাহাজ ভিড়বে গ্রিসের পায়েরিয়াসে। আশা করা যায় তার আগেই জ্যানিককে বোঝাতে পারবে ওরা। নিশ্চয়ই বুঝবে, হুট করে মাতৃত্বের অধিকার হারানো উচিত নয়? রেসপনসিভিস্ট হওয়ার প্রথম শর্ত, বাবা বা মা হওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করা। পুরুষের জন্য ভ্যাসেকটমি, মেয়েদের জন্য টিউবাল লিগেশন। তাদের প্রতিজ্ঞা করতে হয় তারা কখনও সন্তান চাইবে না। এ দলের বক্তব্য: পৃথিবীতে এমনিতেই অনেক বেশি মানুষ, আর জনসংখ্যা বাড়ানো উচিত নয়। তারপরও যদি রেসপনসিভিস্টদের কেউ কেউ সন্তান কামনা করে, সেটা অসম্ভব কিছু নয়, যদিও খুবই জটিল অপারেশন করতে হবে, তাতে খরচ পড়বে লাখ লাখ ডলার। আর বয়স যদি বেড়ে গিয়ে থাকে, সন্তান পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। আসলে জ্যানিকের বয়স এতই কম যে সে

জানেও না সুন্দর চেহারা দেখে পটে গিয়ে সর্বনাশ করতে চলেছে নিজের।

কখন যেন ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেল হেলেন। ঘুম ভাঙল কয়েক ঘণ্টা পর। জাহাজের ইঞ্জিনের চাপা গর্জন শুনতে পেল। জাহাজে দুলুনি নেই বললেই চলে। ভাবতে চাইল জ্যানিক ও এলেন এখন কী করছে। নিশ্চয়ই দারুণ জমেছে পার্টি... ভীষণ মজা করছে ওরা।

আরও এক ঘণ্টা পর আবারও ঘুম ভাঙল, চারপাশ দেখল হেলেন। বিশ্রী লাগছে হাসপাতালে থাকতে। নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হলো। একবার ভাবল বিছানা ছেড়ে নেমে পড়বে। কটের নীচে রেখেছে ওর বাসি পোশাক। ওটা পরেই যদি হাজির হয় বলরুমে? না, থাক। দুর্বল লাগছে শরীর। আবার চোখ বুজল হেলেন।

কিছুক্ষণ পর ঘুমের ঘোর কেটে গেল। ভাবছে: না, মোটেই ভাল লাগছে না! গলা পেঁচিয়ে ধরছে প্লাস্টিকের টিউব। আবার হাঁপানির অ্যাটাক শুরু হলো? ইনহেলারের দিকে হাত বাড়াল হেলেন। ঠিক তখনই ডাক্তারের অফিস থেকে উজ্জ্বল আলো এল। দিন হয়ে উঠল ওর কেবিন। হাঁপানির টান বেড়ে যাওয়ায় ঠিক বুঝল না কী দেখছে। টলতে টলতে ঘরে এসে ঢুকেছেন ডাক্তার কেইন। পরনে বাথরোব, খালি পা। মুখ ভেসে যাচ্ছে রক্তে। চাপ-চাপ রক্ত রোবের বুকে। লোভীর মত ইনহেলার ব্যবহার করল হেলেন। চোখ পিটপিট করে সরাতে চাইল দুঃস্বপ্ন।

ডাক্তার কেইন যেন জবাই করা গরু, ঘড়ঘড় আওয়াজ করছেন। মুখ থেকে ভলকে ভলকে বেরিয়ে আসছে রক্ত। বোকার মত চেয়ে রইল হেলেন। আরও দু'পা সামনে বাড়লেন কেইন, মনে হলো হাত-পা তাঁর রাবারের। মেঝের উপর পিছলে পড়ে গেলেন ধপ করে। কিলবিল করছে সমস্ত পেশি, ত্বকের নীচে যেন

ঘুরছে কেঁচো। কয়েক সেকেণ্ড পর থমকে গেলেন ডাক্তার, পড়ে রইলেন নিজের রক্তের ভিতর—মৃত!

বামহাতে চাদর আঁকড়ে ধরল হেলেন, ইনহেলারে শ্বাস নিচ্ছে। আরেকজন এসে ঢুকল ঘরে। পরনে সেই কালো ছোট্ট পোশাক। এলেন। বারবার কেশে চলেছে, ঝাঁকি লাগছে শরীরে। ঝর্নার মত মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে রক্তের স্রোত। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, এবার চেঁচিয়ে উঠল হেলেন, কাশতে শুরু কবল নিজেও। কী দেখছে এসব!

কী যেন বলতে চাইল এলেন। কিন্তু বদলে কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল গরগরার মত আওয়াজ। দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিল, যেন কারও কাছে নালিশ করছে। রক্তশূন্য আঙুলগুলো এগিয়ে এল হেলেনকে ধরতে। সাহায্য চাইছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ছিটকে পিছিয়ে গেল হেলেন। বান্ধবীর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়নি বলে নিজেকে দুষছে। ভীষণ ভয় লাগছে ওর, কিন্তু চোখ সরাতেও পারছে না হেলেন। এলেনের দুই চোখ রক্ত-লাল হয়ে উঠল, দুই গাল ভাসিয়ে নামল রক্ত। মুখ দিয়ে গলগল করে পড়ছে, ভেসে যাচ্ছে বুক।

কয়েক সেকেণ্ড আগে ডাক্তার কেইনের যা ঘটেছে, ঠিক তা-ই হলো এবার ওর। ভারসাম্য রাখতে পারল না এলেন, পড়ে গেল মেঝের উপর। ততক্ষণে চড়চড় করে ফাটতে শুরু করেছে ত্বক। মেঝের উপর গড়িয়ে পড়ছে রক্ত।

মারা গেল এলেন! যেমন গেছেন ডাক্তার কেইন!

প্রচণ্ড শক পেয়ে থমকে গেল হেলেন জিল। বুঝল, তীব্র ভয় উন্মাদ করে দেবে ওকে! দাঁতে দাঁত চেপে চোখ মুদল।

ছয়

হাতে সময় নেই, তবুও সামনের বাল্কহেডের দিকে চাইল রানা। পরিস্থিতি দেখিয়ে চলেছে ট্যাকটিকাল ডিসপ্লে। ইজরায়েলি সাবমেরিন থেকে ছোঁড়া তিন টর্পেডো ছড়িয়ে পড়েছে, ছুটে আসছে টার্গেট লক্ষ্য করে। এদিকে কম্পিউটার ও সোনার পুরোপুরি নিশ্চিত নয় কোথায় রয়েছে চতুর্থ টর্পেডো।

কন্টেইনার শিপ থেকে মাত্র দুই মাইল দূরে প্রথম টর্পেডো। দ্বিতীয়টা দুই লাখ টনি সুপারট্যাঙ্কার থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে। এদিকে মার্ভেলের দিকে চল্লিশ নট গতি তুলে ছুটে আসছে তৃতীয় টর্পেডো।

রানা জানে সরাসরি বিস্ফোরণ ঘটলেও সামলে নেবে মার্ভেল। পুরো খোল জুড়ে রয়েছে আর্মার। টর্পেডো এলে ওটা বাইরের দিকে বিস্ফোরিত হবে। অনেক কমে আসবে ডেটোনেটিং ফোর্স। তবে ক্রিটিকাল সিস্টেমগুলোর ক্ষতি ঠেকানো যাবে না।

আরেক কাজ করা যায়, ওরা প্রচণ্ড গতি তুলতে পারে, দৌড়ে হারাতে পারে টর্পেডোকে। কিন্তু সেক্ষেত্রে কন্টেইনার শিপ বা সুপারট্যাঙ্কারে আঘাত হানবে টর্পেডো। ফলাফল: জাহাজ দুটো ডুবে যাবে। এমন কোনও উপায় রানার জানা নেই, যেটা রক্ষা করবে দুই বাণিজ্য-তরী ও মার্ভেলকে। বিশেষ করে যখন আসছে চতুর্থ আর একটি টর্পেডো!

একটা নিচু কণ্ঠ শুনতে পেল রানা, আতাসি রেডিওতে সাবধান করে দিল দুই জাহাজকে। ওরা জেনেছে টর্পেডো আসছে, কিন্তু কী করবে? বিশেষ করে সুপারট্যাঙ্কার? ওটা ঘুরতে প্রকাণ্ড এলাকা নেয়। যে গতিতে চলেছে, থামতে লাগবে পাঁচ মাইল।

'ইজরায়েলি সাবমেরিন আশির দশকের, তবে টর্পেডোগুলো বোধহয় আধুনিক,' বলল উর্বশী। 'মার্কিন ক্যারিয়ার থেকে দুটো বিমান আকাশে উঠেছে। সম্ভবত এস-থ্রিবি ভাইকিং। অ্যান্টি ওয়ারফেয়ার বিমানে থাকে মার্ক-৪৬, অথবা মার্ক-৫০ টর্পেডো। কিন্তু আমেরিকান যুদ্ধ-জাহাজ মনে হয় না ডুবিয়ে দেবে ইজরায়েলি সাবমেরিনকে।'

'আমাদের হাতে পাঁচ মিনিটও নেই,' বলল অনিল।

'উর্বশী, ওই টর্পেডোর রেঞ্জ কত?' জানতে চাইল রানা।

'ছয় হাজার গজ।'

'সুপারট্যাঙ্কার থেকে কত দূরে?'

'তিন হাজার দুশো গজ।'

দেখাই যাক না কী হয়, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। শান্ত স্বরে বলল, 'গগল, স্পিড বাড়াও। চল্লিশ নটে রাখো। সুপারট্যাঙ্কার আর টর্পেডোর মাঝখানে চলো।'

'ঠিক আছে, রানা।'

'অনিল, সামনের গ্যাটলিং গানের পোর্ট খোল্। মাস্টার সোনার প্লট অনুযায়ী কাজ করুক কম্পিউটার। মাস্তুলের ক্যামেরার মাধ্যমে টার্গেট করতে হবে টর্পেডোকে।'

'এক মিনিট, রানা...'

'হাতে সময় নেই,' একটু আড়ষ্ট শোনাল রানার কণ্ঠ।

কোনও দিকে মনোযোগ নেই অনিলের। কী যেন দেখছে

ল্যাপটপ কম্পিউটারে। এইমাত্র চালু হয়েছে সিস্টেম। 'আয় সোনা, শিখে নে,' চাপা স্বরে বলল।

'তুই কী করছিস?' জানতে চাইল রানা। কাত হয়ে গেল। সাগরে বাঁক নিয়ে চলেছে মার্ভেল।

'হুপারকে নতুন বুদ্ধি শেখাব।'

একটা সিনেমা দেখে মার্ভেলের সুপার কম্পিউটারের নাম দিয়েছে অনিল—হুপার। সেই ছায়াছবিতে তরুণ এক হ্যাকার স্যাক/নর্যাড-এর কোড ভেঙে ফেলে। আরেকটু হলে শুরু হতো বিশ্ব-যুদ্ধ।

'আমাদের নতুন কৌশল নয়, অন্য কিছু দরকার,' তিক্ত হাসল গগল।

'গ্যাটলিং গান তৈরি রাখ, অনিল,' বলল সোহেল। চকচক করছে চোখ দুটো।

উর্বশীর দিকে চাইল অনিল। মেয়েটা নিজের কম্পিউটার নিয়ে কী যেন করছে। 'অনিল, আমার মনে হয় না ওতে কাজ হবে।'

'ভরসা রাখুন, উর্বশী,' বলল ভারতীয় এজেন্ট।

'আপনারা কী নিয়ে আলাপ করছেন, জানতে পারি?' বলল আতাসি, উদ্বিগ্ন।

একবার অনিল আরেকবার উর্বশীর দিকে চাইল রানা। 'যা বলার বলে ফেলো, জলদি!'

'হ্যাঁ...এই তো চাই!' হেসে ফেলল উর্বশী।

ওর মাথাটা গেছে, ভাবছে রানা।

'ইয়াহুহু!' বলে উঠল অনিল। কি-বোর্ডে প্রজাপতির মত উড়ছে দশ আঙুল। 'লগারিদম লাইনে এনেছি, উর্বশী। সরাসরি টার্গেট তাক করব। আমাদের কম্পিউটারগুলো মার্ভেলের

কম্পিউটারের সঙ্গে একই লয়ে কাজ করছে। হাতে পেয়ে গেছি পুরো নিয়ন্ত্রণ।'

'কীসের নিয়ন্ত্রণ?' আন্দাজ করতে চাইছে রানা।

স্ক্রিন থেকে চোখ তুলল না উর্বশী, নিচু স্বরে বলল, 'এবার মজা দেখো।'

ও কী করছে? উর্বশীর দিকে চাইল রানা। পাথরের মূর্তির মত হয়ে উঠেছে মেয়েটা।

'তোমরা ঠাট্টা করছ?' কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রানা। বুঝে ফেলেছে। 'একবার আমেরিকানরা সাধারণ সাবমেরিন থেকে ওই জিনিস ব্যবহার করে, তলিয়ে যায় ডুবো-জাহাজ। মারা পড়ে চৌষট্টিজন নাবিক।'

'আণবিক ওঅরহেড সরিয়ে নেয়া হয়েছে,' বলল সোহেল। 'বদলে রাখা হয়েছে পাঁচ শ' পাউণ্ড বিস্ফোরকের সমান সি-ফোর।'

'টর্পেডো থেকে এক হাজার গজ দূরে সুপারট্যাঙ্কার,' ঘোষণা দিল উর্বশী।

নিজেদের ভিতর যোগাযোগ করে চলেছে জাহাজগুলো। আমেরিকান ব্যাটল গ্রুপ ও এএসডাব্লিউ বিমান আলাপ করছে। রেডিওর দিকে মনোযোগ দিয়েছে আতাসি।

সোনার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে উর্বশী। নরম স্বরে বলল, 'আমরা তোমাকে আরেকটা অপশন দিলাম।'

'আমাকে না জানিয়ে যা করার...' চোখ পাকিয়ে সোহেলের দিকে চাইল রানা। 'তুইও জুটে গেলি ওদের সঙ্গে?'

'ক্ষতির চেয়ে লাভ বেশি,' বলল সোহেল।

ট্যাকটিকাল ডিসপ্লের দিকে চাইল রানা। পিছু নেয়া টর্পেডো পিছনে পড়তে শুরু করেছে। ওটাকে যদি টার্গেট করতে হয়, ঠিক

সামনে রাখতে হবে মার্ভেলকে। একটু এদিক ওদিক হলেই ফস্কে যাবে টার্গেট। জাহাজ সঠিক পজিশনে পৌঁছলে টর্পেডো থেকে দূরত্ব থাকবে মাত্র পাঁচ শ' গজ। পানির দশ ফুট নীচ দিয়ে আসছে অস্ত্রটা।

ডেকের ক্যামেরা থেকে টর্পেডোর ওয়েক লাইন দেখতে পেল রানা। শান্ত-স্বচ্ছ সাগরে সামান্য আলোড়ন। চল্লিশ নটের বেশি গতি তুলে আসছে টর্পেডো।

'অনিল, ওটাকে আগেই থামাতে হবে, নইলে জাহাজের কিলে এসে ঢুকবে।'

'ট্র্যাকিং,' বলল অনিল।

অ্যাথর্টশিপ থ্রাস্টার দিয়ে মার্ভেলকে পজিশনে নিয়ে এল গগল। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল জাহাজ। পুরোপুরি রিভার্সে চলতে শুরু করেছে ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইনামিক ইঞ্জিন। সরাসরি টর্পেডোর সামনে পড়বে এবার মার্ভেল।

'ফায়ার,' বলল অনিল। কি-বোর্ডে কয়েকটা নির্দেশ দিল।

মার্ভেলের সামনের খোল থেকে সরে গেল আর্মার্ড প্লেট, বেরিয়ে এল গ্যাটলিং গান। ছয়টি ব্যারেল তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলল। মেকানিজম থেকে ছিটকে পড়ছে একফুটি শেল কেসিং। জাহাজের গা থেকে বেরুল ঘন ধূসর ধোঁয়া ও লেলিহান আগুন। প্রতি সেকেণ্ডে ২০ এমএম মেশিন ক্যানন থেকে ছুটছে তাজা শেল। সাগরের উপর দিয়ে চলেছে। তারপর ডুব দিল পানির ভিতর। ছুটন্ত টর্পেডোর নাকের কাছে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সাগর। ইউরেনিয়াম শেলগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলছে পানি।

আমেরিকানদের তৈরি ইজরায়েলি টেস্ট-৯৭ টর্পেডোর ভিতর রয়েছে চার শ' পাউণ্ড বিস্ফোরক, কিন্তু মারণাস্ত্রটা পড়ে গেছে গ্যাটলিং গানের সামনে। সরাসরি টর্পেডোর মাথার ভিতর ঢুকল

চারটে রাউণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো ওঅরহেড। ছিটকে উঠল সাগর। চারদিকে ছড়িয়ে গেল কংকাশন ওয়েভ। যেখানে ছিল টর্পেডো, সেখানে দেখা দিল প্রচণ্ড দুলুনি। পরক্ষণে পানির বিশাল এক স্তম্ভ উঠে গেল আশি ফুট উপরে। কয়েক সেকেণ্ড পর ওটাকে টেনে নিল মাধ্যাকর্ষণ, পিলারের মত ধড়াস্ করে নেমে এল পানি সাগরের বুকে।

মার্ভেলের ভিতর অংশ ভাল ভাবে ইনসুলেটেড, তারপরও শুনতে পেল ওরা ডেটোনেশনের প্রচণ্ড আওয়াজ। ওটা যেন বজ্রপাতের গর্জন। ঠিক যেন মাথার উপর পড়েছে।

উর্বশীর দিকে ঘুরল রানা। 'ওটার জন্য তিরিশ সেকেণ্ড পাব। এবার কী?'

'ইজরায়েলিদের টর্পেডো ওয়্যার গাইডেড। যদি তারবার্তা সরিয়ে নেয়া যায়, এমনিতেই ডুবে যাবে। ইজরায়েলিরা নিশ্চয়ই এই স্রোত বা ঢেউয়ের ভিতর অন্য কোনওভাবে কণ্ট্রোল করছে না।'

'তো কী করতে বলো তুমি?'

কাঁধ ঝাঁকাল উর্বশী। 'স্বাভাবিক চিন্তা, ডুবিয়ে দাও ওই সাবমেরিন।'

আবার ট্যাকটিকাল ডিসপ্লের দিকে চাইল রানা। জ্বলজ্বলে লাল আলো দেখিয়ে চলেছে দুটো আমেরিকান এস-থ্রিবি ভাইকিঙকে। আরেক দিকে অবশিষ্ট তিনটে টর্পেডোর ট্র্যাক লাইন। যেটা রিজার্ভ হিসাবে পিছনে ছিল, সেটা গতি বাড়িয়ে ছুটে আসছে মার্ভেলকে লক্ষ্য করে।

'মিসাইল দিয়ে কিছু করবে?' বলল রানা।

'সেটাই তো আমাদের ইচ্ছে,' বলল উর্বশী। 'আমরা মাঝরাত থেকে লেগেছি ওটার পিছনে। আমাদের এক নম্বর টিউব বদলে

নিয়েছি বাংলাদেশ নেভির ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে। ইউজিএম-১৩৩ ডি-ফাইভ ট্রাইডেন্ট এগারো মিসাইল ব্যবহার করব টর্পেডোর মত। সেজন্য সফটওয়্যার তৈরি করেছেন অনিল। কেমন কাজ হয় দেখব এবার। কোনও ভুল না হলে বিজ্ঞাপন দেখানোর মত দৃশ্য হবে, একইসঙ্গে টার্গেট হারাবে তিন টর্পেডো।'

'অনিল? ব্যাটা, সারারাত ধরে এই করেছিস তুই!'

'দেখি হুপারের মত কিছু করা যায় কি না। ওরা যেভাবে কণ্ট্রোল করছে, ঠিক সেভাবে রেডিও ওয়েভ সরিয়ে নিতে হবে। মিসাইলের গতি প্রথমে তুলব এক শ' নটে। পরে অনেক বাড়িয়ে তুলব। হাতে বাড়তি সময় থাকবে না।' শ্বাস আটকে ফেলেছে অনিল।

একবার ওর দিকে আরেকবার উর্বশীর দিকে চাইল রানা। একটু পর ওদের বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হতে পারে, অথবা ওদের সঙ্গে দেখাই হবে না এ জীবনে! মারা পড়বে ওরা সবাই! স্বাভাবিক স্বরে বলল রানা, 'গগল, ওই সাবমেরিনের দিকে নিয়ে চলো মার্ভেলকে।'

'এক নম্বর টিউবের সামনে থেকে দরজা সরিয়ে নিলাম,' ঘোষণা করল অনিল। 'বেয়ারিং দেখে ফায়ার করছি।'

মার্ভেলকে ঘুরিয়ে নিয়েছে গগল, বো'র সামনে ফেনা তুলছে সাগরের ঢেউ। স্রোতের ভিতর গেঁথে বসছে জাহাজের পিছন অংশ, নাক উঁচু করে ছুটতে শুরু করেছে বো। চলেছে সাবমেরিন লক্ষ্য করে। অনিলকে সুযোগ তৈরি করে দেবে গগল।

'গগল, স্টারবোর্ডে আরও দুই পয়েন্ট সরো,' বলল অনিল।

থ্রাস্টারগুলো নিয়ে কাজ করছে দক্ষ নাবিক, সরাসরি সাবমেরিনের দিকে চলেছে। ওদিক থেকে আসছে তিন টর্পেডো। জানতে চাইল গগল, 'উর্বশী, ওটা নড়েনি, তা-ই না?'

'না, নড়েনি। তারবার্তা দিয়ে চলেছে টর্পেডোগুলোকে।' কান থেকে প্যাসিভ সোনার হেডফোন খসিয়ে ফেলল উর্বশী।

আর কোনও তথ্য প্রয়োজন নেই অনিলের, কি-বোর্ডে উড়ছে ওর আঙুলগুলো। মিসাইল লঞ্চ করছে। প্রচণ্ড গতি সম্পন্ন সলিড ফিউয়েল থরথর করে কাঁপিয়ে দিল গোটা জাহাজকে। হাল ডোর খুলে যেতেই মডিফায়েড টিউব দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল মিসাইল। পঞ্চাশ নট গতি তুলে ছুটছে। অস্ত্রটার অন বোর্ড কম্পিউটার জেনে গেছে ওটার নিজের তুলনায় গতি কম টর্পেডোর। হার্ড ফিউল জ্বলছে, প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে চলেছে মিসাইল। দ্রুত পিছনে পড়তে লাগল সাগর। দেখতে না দেখতে গতি উঠে গেল পাঁচ শ' নটে। চারপাশের পানি হয়ে উঠছে বাষ্প।

মিসাইলের টপসাইড ক্যামেরা থেকে ছবি এল। পানির নীচে প্রচণ্ড গতিতে তীরের মত ছুটছে মারণাস্ত্র।

'দেখলে মনে হয় পৃথিবী ধ্বংস করতে তৈরি হয়েছে,' কে যেন বলে উঠল।

'টার্গেটের রেঞ্জ?' জানতে চাইল রানা।

'তিন হাজার পাঁচ শ' গজ,' বলল উর্বশী। 'বাকি থাকল চৌত্রিশ শ' গজ। বত্রিশ শ'... আটাশ শ'।'

'থামাবি কখন, অনিল?'

'সাবমেরিন ডুবিয়ে দেব না?'

'না। ধরা পড়লে আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারি হবে। ওটার নাকের সামনে ফাটিয়ে দে। সাবমেরিনের গাইডেড ওয়্যারিং নষ্ট হলেই যথেষ্ট।'

'কতটা কাছে?'

ট্যাকটিকাল ডিসপ্লের দিকে চাইল রানা। টর্পেডোগুলো, সুপারট্যাঙ্কার, কন্টেইনার শিপ ও মার্ভেলের মাঝখানের দূরত্ব

খেয়াল করছে। আর আধমিনিট পর সুপারট্যাঙ্কারের উপর আঘাত হানবে সামনের টর্পেডো। একবার ফ্ল্যাট স্ক্রিনে মিসাইলের দিকে চাইল রানা। এতই দ্রুত চলেছে, প্রতি মুহূর্তে ইমেজ রিসাইকেল করছে কম্পিউটার। ইজরায়েলি সাবমেরিনকে এমন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে হবে, যেন আবারও টর্পেডো ছাড়তে না পারে। তবে ডুবি.য় দেয়া চলবে না।

'টর্পেডো কামিং, ওয়ান থাউজেণ্ড ইয়ার্ড, রানা,' জানাল উর্বশী।

প্রতিটি সংখ্যা স্ক্রিনে দেখছে রানা। বড় দ্রুত পিছিয়ে চলেছে। দেখতে না দেখতে মাত্র দুই হাজার গজ বাকি থাকল মিসাইলের, তার পর ডুবিয়ে দেবে সাবমেরিনকে।

এদিকে একটু পর সুপারট্যাঙ্কারের উপর হামলে পড়বে টর্পেডো।

মিসাইলের দিক ও গতির হিসাব অত্যন্ত জটিল। তবে মোটামুটি আন্দাজ করে নিয়েছে রানা। 'আরেকটু অপেক্ষা কর্, অনিল...' বলল ও। ওরা যদি আগেই মিসাইল ফাটিয়ে দেয়, রেডিও সিগনালের সঙ্কেত থামবে না। তবে বেশি দেরি করলে নাবিক সহ ধ্বংস হয়ে যাবে সাবমেরিন।

'আরেকটু,' দ্বিতীয়বারের মত বলল রানা। মিসাইলের দিকে চেয়ে রইল। শান্ত সাগরের নীচ দিয়ে তীরের মত ছুটে চলেছে মিসাইল। একবার টর্পেডোগুলোর দিকে চাইল। একটা চলে এসেছে টার্গেটের পঞ্চাশ গজ দূরে। আরেকটা তিশ শ' গজ পিছনে। তবে দুটোর গতিবেগ ভিন্ন। একই সময়ে গন্তব্যে পৌছবে।

'এবার!'

অটো ডেস্ট্রাকশান বাটন টিপে দিল অনিল। মিসাইলের বুকে

বসে থাকা কম্পিউটার সিগনাল পেয়ে গেল। এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ে একই সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো পাঁচ শ' পাউণ্ডের সি-ফোর ও সলিড ফিউল। পানির উপর ছিটকে উঠল বিশাল এক ফোয়ারা। সাগরের মাঝখানে সৃষ্টি হলো বিশাল এক গর্ত। পঞ্চাশ ফুট গভীর সেটা। বৃত্তও একই সমান। বিস্ফোরণের ফলে তৈরি হলো ভয়ঙ্কর কংকাশন। মার্ভেলের বো-তে এসে লাগল প্রচণ্ড শক ওয়েভ। সুপারট্যাঙ্কারের এক পাশে লাগল শক ওয়েভ, পোর্টের দিকে কাত হয়ে গেল মস্ত জাহাজটা।

বিস্ফোরণের অ্যাকুস্টিক ব্লাস্ট ছড়িয়ে পড়ল সাগরে। ওটার ফলে অসম্ভব হয়ে উঠল প্যাসিভ সোনারের সিগনাল ধরা। টপসাইড ক্যামেরার দিকে চাইল রানা। সুপারট্যাঙ্কারের কিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে চলেছে। দু'সেকেণ্ড পর মৃদু হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। ওই বিশাল জাহাজে গিয়ে আঘাত হানেনি টর্পেডোগুলো। উর্বশী, অনিল ও সোহেলের বুদ্ধি কাজে লেগেছে। সাবমেরিন থেকে পৌঁছেনি তারবার্তা, ফলে কাটা পড়েছে টর্পেডোর সঙ্কেত। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেছে অস্ত্রের মোটর।

'কিছু শুনলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে, উর্বশী,' বলল রানা।

'কম্পিউটার এখন কমপেনসেট করছে। কিছুক্ষণ সময় লাগবে কিছু বুঝতে।'

আতাসি সিট থেকে রানার দিকে চাইল। 'বস্, একটা এস-থ্রিবি ভাইকিঙের পাইলট জানতে চাইছে কী ঘটছে।'

'ওর কাছে সময় নাও, বলো বুঝতে চাইছ।' উর্বশীর দিকে মনোযোগ রানার। ডানহাতে সোনার হেডফোন তুলে নিয়েছে উর্বশী, চেয়ে রইল সোনার সিস্টেমের ওয়াটার ডিসপ্লের দিকে। ওখান থেকে আসছে ঝলমলে আলো।

কয়েক সেকেণ্ড পর রানার দিকে চাইল উর্বশী। 'কোনও প্রপেলার দ্রুতগতি তুলছে না। তার মানে থেমে গেছে তিন টর্পেডো। এখন সাগর-তলের দিকে চলেছে। সাবমেরিন থেকে যন্ত্রপাতির আওয়াজ আসছে। হালের ভিতর বাজছে অ্যালার্ম। এক মিনিট... হ্যাঁ, ওটার পাম্প কাজ করছে। ব্যালাস্ট ছাড়ছে।' রানার দিকে চেয়ে হেসে ফেলল উর্বশী। 'কাজ হয়েছে! উঠে আসছে ওরা সারফেসে!'

অপারেশন্স সেন্টারে সবাই হেসে ফেলল। হাততালি দিয়ে উঠল দু'চার জন। বুক থেকে নেমে গেছে বিশাল এক পাথর।

'বুদ্ধিটা মিস্টার অনিলের,' বলল উর্বশী। 'আমরা শুধু নির্দেশ মত কাজ করে গেছি।'

লাজুক হাসল অনিল। 'কৃতিত্ব আমাদের সবার। তোমরা সবাই না থাকলে কিছুই হতো না।'

'দারুণ,' নির্দ্বিধায় বলল রানা, 'সিম্পলি ওয়াণ্ডারফুল!'

'ওদিকে দেখো!' বলে উঠল গগল, আঙুল তুলেছে মেইন ডিসপ্লের দিকে।

ওখানে দেখা গেল সাগর বলকে উঠছে। একটু আগে ওখানে লুকিয়ে ছিল সাবমেরিন, অ্যাম্বুশ করে। এখন বাধ্য হয়েছে ভেসে উঠতে। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে স্রোত। তারপর তার ভিতর দিয়ে ভুস করে ভেসে উঠল বিশ্রী চেহারার এক সাবমেরিন।

'কী কুৎসিত!' বলে উঠল উর্বশী।

ইজরায়েলি সাবমেরিন আশির দশকের, আমেরিকার তৈরি। তবে এখন মাথার কাছে তুবড়ে গেছে হাল প্লেট। মনে হলো দেয়ালে বাড়ি খেয়ে এই অবস্থা। ডিমের মত গোল নাকটা গেছে। ওটার মাত্র ষাট গজ সামনে বিস্ফোরিত হয়েছে মিসাইল।

এখনও পুরো ভেসে ওঠেনি সাবমেরিন, ডুবছে-ভাসছে। এক

মিনিট পর স্থির হলো সাগরে। ক্ষতিগ্রস্ত হাল প্লেটের উপর ক্যামেরা তাক করল গগল। সাবমেরিনের নড়াচড়া লক্ষ্য করছে মার্ভেলের কম্পিউটার, পরিষ্কার দেখিয়ে চলেছে ছবি। ক্ষতিগ্রস্ত প্লেটের পাশ থেকে উঠছে বাতাসের বুদ্বুদ। ওটাই প্রমাণ করছে সাবমেরিনের ভিতর পানি ঢুকছে। কনিং টাওয়ারের হ্যাচ খুলে গেল। সামনের ও পিছনের ডেক-হ্যাচ খোলা হলো। সাবমেরিনের ভিতর থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে নাবিকরা।

'ওরা কিছু বলছে, আতাসি?' জানতে চাইল রানা।

'জেনারেল ডিসট্রেস কল পাঠাচ্ছে। পাম্পগুলো কোনওমতে ভাসিয়ে রাখছে ওদের। অ্যাশকেলন বেস থেকে সাহায্য চাইছে। সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন নির্দেশ দিয়েছে, জলযান ত্যাগ করতে হবে। সাবমেরিন ডুবে যেতে পারে, কাজেই জানিয়ে দিয়েছে উপরের ডেকে থাকতে হবে ক্রুদের।'

'আশপাশের কোনও জাহাজের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছে?'

'না। চাওয়ার কথা নয়।'

'তা ঠিক। কোনও নির্দেশ না দিয়েই টর্পেডো ছুঁড়েছে বেসামরিক ফ্রেইটার লক্ষ্য করে। এটা প্রায় পঞ্চাশটা আন্তর্জাতিক চুক্তির লঙ্ঘন।'

'আর আমরা যেটা অ্যাশকেলন বেসে করেছি?' ঠাট্টার সুরে বলল উর্বশী।

'স্রেফ উন্মাদের কাজ,' বলল রানা।

'পাগলে কী না করে!' সায় দিল সোহেল।

ঠিক তখনই মার্ভেলের উপর দিয়ে উড়ে গেল আমেরিকান ক্যারিয়ারের জোড়া এস-থ্রিবি বিমান। সাবমেরিনের উপর দিয়ে চলে গেল ওগুলো। ডেকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ইজরায়েলি নাবিকরা। জেট ওয়াশ ছিঁড়ে দিতে চাইল ইউনিফর্ম।

'সামনের ভাইকিং এখনও কথা বলতে চাইছে, বস্,' জানাল আতাসি। 'অফিশিয়াল অনুরোধ পাঠিয়েছে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার হ্যারি ট্রুম্যান। ওটার বস্ কমাণ্ডার রন পাসম্যান বলেছে, আমরা যেন এখানেই অপেক্ষা করি।'

'আলাপ করব,' বলল রানা। কানের উপর বসিয়ে নিল ইয়ারফোন। মাইক্রোফোনে বলল, 'আমি ক্যাপ্টেন মাসুদ রানা, দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস থেকে বলছি। আপনাদের জন্য কী করতে পারি, কমাণ্ডার?'

'ক্যাপ্টেন রানা, আমরা চাই আপনারা ওখানেই থাকুন। আপনার জাহাজে উঠবে আমাদের কন্টিন্‌জেন্ট। সুপারট্যাঙ্কার এইযির ক্যাপ্টেন ও কন্টেইনার শিপ বেইলির ক্যাপ্টেন সহায়তা করতে রাজি হয়েছেন। বিশ্ মিনিট পর আপনার জাহাজে নামবে আমাদের হেলিকপ্টার। আপনাদের যদি হেলিকপ্টার নামবার ব্যবস্থা না থাকে, দু'ঘণ্টা পর ওখানে পৌঁছবে গাইডেড মিসাইল ক্রুজার স্টার শিপ।'

'আপনার প্রতি সম্মান রেখে বলছি, কমাণ্ডার পাসম্যান, আমি বা আমার ক্রুরা কিছুই দেখিনি। ঘুমিয়ে ছিলাম আমি। ডিউটিতে যে ওয়াচ ছিল, তার বাম চোখ কানা, অন্যটা দিয়ে ঝাপসা দেখে।'

কঠোর হয়ে উঠল কমাণ্ডারের কণ্ঠ, 'ক্যাপ্টেন, আপনি বোধহয় জানেন না আমরা এ সাগরে যে-কোনও জাহাজকে থামানোর অধিকার রাখি। আপনাকে ভদ্রতা করে বলছি, কিন্তু মনে রাখবেন এটা অফিশিয়াল নির্দেশ। আপনারা ওখানে থাকছেন। আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে।'

আমেরিকান নেভি চাপ দিতে শুরু করেছে। কিন্তু নেভিকে উঠতে দেয়া যাবে না মার্ভেলে। ইজরায়েলি নেভির অফিসারদের

বোকা বানানো আর ইউএস মিলিটারিকে ঠকানো এক কথা নয়।

'আপনারা দয়া করে অপেক্ষা করুন,' নরম স্বরে বলল রানা। 'আমরা একটু পর যোগাযোগ করছি।' বামহাতে মাইক ঢেকে নিল ও, নিচু স্বরে বলল আতাসিকে, 'নুমার সঙ্গে যোগাযোগ করো। বলবে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা বলতে চায় মাসুদ রানা।'

টানটান পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল, তারপর লাইনে এলেন জর্জ হ্যামিলটন। 'হ্যাঁ, রানা, কী ব্যাপার?'

'আমাদের সাহায্য দরকার।'

'কী ব্যাপারে?'

'একটা প্রমোদ-তরী নিয়ে বেরিয়েছি আমি, সঙ্গে আমার ক'জন বন্ধু-বান্ধবী। কিন্তু ইউএস নেভি বলছে সাগরে চুপচাপ বসে থাকতে হবে দু'ঘণ্টা। তারা খুশিমত সময়ে এসে জাহাজ সার্চ করবে। এদিকে আমাদের হাতে বাড়তি সময় নেই।'

'কোথায় রয়েছ তুমি?'

'মেডিটারেনিয়ান সাগরে, ইজরায়েলি উপকূল থেকে একটু দূরে।'

'আমাকে আবছা ভাবে জানিয়েছেন তোমার বস্,' বললেন অ্যাডমিরাল। কণ্ঠ একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। 'আমি দেখছি কী করা যায়।'

লাইন কেটে গেল।

'গগল, তৈরি থাকো,' বলল রানা। 'আঠারো নট গতি তোলো, প্রথম সুযোগে সরে পড়ছি।' মাইক্রোফোনের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিল রানা। 'কমাণ্ডার পাসম্যান, আপনি কি ওখানে রয়েছেন? আমাদের ডেকে হেলিকপ্টার নামানো অসম্ভব। আপনি ক্রুজার স্টার শিপকে আসতে বলুন।'

'বেশ, ক্যাপ্টেন। একঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট পর পৌঁছবে ক্রুজার।'

'আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি,' বলল রানা। রেডিও নীরব হয়ে যেতেই সবার উপর চোখ বোলাল। 'ওরা চাইছে আমরা বসে থাকি।'

'কেউ বিশ ডলার বাজি ধরবে?' জানতে চাইল সোহেল। 'অ্যাডমিরালকে পরিস্থিতি খানিকটা জানিয়েছেন আমাদের চিফ। উনি দশ মিনিটের ভিতর যোগাযোগ করবেন কমাণ্ডারের সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, দেরি করবেন না অ্যাডমিরাল,' মনে মনে আশা করল রানা।

কেউ বাজি ধরছে না। তিরিশ সেকেণ্ড পর বলল আতাসি, 'যখন বাজি ধরি, আমি যে মুসলিম সে হুঁশ থাকে না আমার। ঠিক আছে, সোহেল বস্, আমি বলি, যোগাযোগই করবেন না অ্যাডমিরাল। বাজি ধরলাম।'

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে খবর হবে,' বলল উর্বশী।

'আমেরিকান নেভি নিজেদের কাজে ব্যস্ত,' বলল গগল। 'আমরা যদি রওনা হই, আধঘণ্টার ভিতর টের পাবে না!' নড়তে শুরু করেছে মার্ভেল।

'আমি উর্বশীর সঙ্গে আছি,' বলল অনিল। 'আতাসির টাকা তিনজন মিলে ভাগ করে নেব।'

'অ্যাডমিরাল এখন কমাণ্ডারের সঙ্গে কথা বলছেন,' বলল সোহেল। ভাব দেখে মনে হলো ও শুনতে পাচ্ছে পরিষ্কার!

'ধুশ্শা...' চুপ হয়ে গেল আতাসি, পরক্ষণে বলল, 'আপনার কথাই ঠিক। পাসম্যান যোগাযোগ করছে!'

'লাইন দাও,' বলল রানা।

'ক্যাপ্টেন রানা, আপনাকে শেষবারের মত সাবধান করে

দিচ্ছি,' কর্কশ স্বরে বলল কমাণ্ডার পাসম্যান। দাঁতে দাঁত চেপে বলে চলেছে, 'রওনা হলে দায়-দায়িত্ব আপনার। যদি না থামেন, আপনার জাহাজের উপর বোমা ফেলব ভাইকিং দিয়ে।'

ব্যাটা ঠাট্টা করছে না, নিজেও খানিক রেগে উঠল রানা। চাঁছাছোলা স্বরে বলল, 'কমাণ্ডার, একটু আগে সুপারট্যাঙ্কারের দিকে টর্পেডো ছুঁড়েছে ইজরায়েলি সাবমেরিন। আমি এখানে বসে থেকে মরতে চাই না। আপনারা কতক্ষণ পর আসছেন সেজন্য অপেক্ষা করা অসম্ভব। আমরা যে-কোনও মুহূর্তে বিপদে পড়তে পারি।'

'আপনাকে যা বলেছি, তাই করতে...' হঠাৎ থেমে গেল কমাণ্ডার। দেড় মিনিট পর আবার কথা বলে উঠল। তবে এবার অনেক নরম স্বরে। রানা ভাবছে, ব্যাটার কণ্ঠে বিরক্তি? ভয়? কারও প্রতি সম্মান? বোধহয় তিনটির মিশ্রণ! 'ক্যাপ্টেন রানা, ওখান থেকে চলে যেতে পারেন। আপনাদেরকে আর প্রয়োজন নেই আমার।'

রানা আন্দাজ করছে, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন আটলাণ্টিক সাগরের কমাণ্ডার ইন চিফ ফর নেভাল অপারেশন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। অথবা কথা বলেছেন জয়েণ্ট চিফদের কারও সঙ্গে। পরে জেনে নেবে, আপাতত সরে যাওয়া জরুরি। মাইক্রোফোনে বলল রানা, 'আমাদের দিকটা বুঝেছেন বলে ধন্যবাদ, কমাণ্ডার। ভাল থাকুন, আনন্দে থাকুন। আরেকটা কথা, ওই পুরনো বালতির মত সাবমেরিনটা? ওটার ভিতর পানি ঢুকছে। যদি ভিতরে ঢুকতে চান, জলদি করতে হবে। মার্ভেল আউট।'

ঘুরে চাইল রানা। সোহেল, অনিল ও উর্বশীর হাত হাজির হয়েছে আতাসির থুতনির নীচে।

'বাজি ধরা ধর্মে নিষেধ, জুয়া খেলেছি শুনলে আমাকে খুন করবে মার্সিয়া!' বিশাল দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেদুঈন কমাণ্ডো। কিন্তু হাতগুলো নড়ল না। নির্দয় পাষণ্ড হয়ে গেছে যেন ওরা। 'জানেন আমার চারটে ছেলে-মেয়ে? এখন তো দেখছি সব টাকা আপনারাই নিয়ে নেবেন! ওদের খাওয়াব কী?' মাথা নাড়ল এপাশ ওপাশ। শেষে মানিব্যাগ বের করল সে, বিশ ডলারের নোটে একটা চুমু খেয়ে বাড়িয়ে দিল ওদের দিকে।

চওড়া হেসে ওটা নিল সোহেল।

'এ টাকা পাওয়া ছিল খুবই সহজ,' খুশি মনে বলল অনিল। 'কচি বাচ্চার কাছ থেকে লজেন্স কেড়ে নেবার মত।'

'আপনারা বোধহয় আগেও এ কাজ করেছেন,' ভীষণ গম্ভীর হয়ে উঠল আতাসি। মানিব্যাগ রেখে পেটের উপর হাত রাখল। রানার দিকে করুণ চোখে চাইল। 'খিদেয় মরে গেলাম, বস্!'

'গগল, সবাইকে জানিয়ে দাও রন্দেভু কখন,' বলল রানা। 'তারপর ডাইনিং রুমে নাস্তা।'

'মাঝরাতে রন্দেভু। সুয়েজ খাল থেকে দু' শ' মাইল উত্তর-পশ্চিমে।'

'বেশ, আমি চাই সিনিয়ররা ওই সময়ে অপারেশন্স সেন্টারে থাকুক,' বলল রানা। 'প্রয়োজনে যে যার কাজ শাফল করে নাও। আমি কেবিনে ফিরছি, ধন্যবাদ জানাব অ্যাডমিরালকে।' সোহেলের দিকে চাইল রানা। 'তুই বিসিআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ কর। জানিয়ে দে দুটো নয়, একটা নিয়ে ফিরছি।'

সিট ছেড়ে রওনা হয়ে গেল রানা, অপারেশন্স সেন্টার থেকে বেরিয়ে যাবে, তার আগে সোহেলের হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে নিল বিশ ডলারের নোটটা। কঠোর কণ্ঠে বলল, 'তোরা তিনজন মিলে একটা মিসাইল নষ্ট করেছিস, কাজেই এটা জরিমানা

করলাম!'

হায়-হায় করে উঠল সোহেল ও অনিল। হাসছে উর্বশী।

'আর আমি কী পেলাম?' আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল আতাসি।

সাত

প্রকাণ্ড ঘরের দরজা খুলতেই নোনা জলের গন্ধ পেল ডাক্তার ফারা রাইনার। সামনে অলিম্পিক দৈর্ঘ্যের ল্যাপ সুইমিং পুল। এক শ' চৌষট্টি ফুট দৈর্ঘ্য, তবে প্রস্থ মাত্র দুটো লেনের সমান। জায়গাটা ব্যবহার করা হয় জাহাজের ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক হিসাবে। তিনদিকে সরু ক্যাটওয়াক, ফ্যাকাসে নীল টালি বিছানো। তার উপর সাঁটা হয়েছে ননস্কিড অ্যাডহিসিভ টেপ। পুলের ভিতরের চার-দেয়ালে হালকা নীল টাইলস্। লম্বা ঘরে জ্বলছে ফ্লুরেসেণ্ট টিউব। জায়গায় জায়গায় ইনক্যানডিসেণ্ট বালব, ফলে পানির উপর সূর্যের আলো পড়ছে বলে ভ্রম হয়।

টাইলসে দ্রুত জমে অ্যালজি, তাই সুইমিং পুলে পানি না থাকলে নিয়মিত ঘষা-মাজার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় ক্লিনিং ক্রুদের। অবশ্য এ মুহূর্তে তারা কেউ নেই। সামনে টলটলে লোনা পানি।

সাঁতার খুব একটা পছন্দ করে না ডক্টর ফারা, তবে সহজ চারটে স্ট্রোক জানে। দ্রুতগতির জন্য ফ্রিস্টাইল, এনডিউর‍্যান্সের জন্য ব্রেস্ট স্ট্রোক, আরামের সাঁতার ব্যাক স্ট্রোক, আর প্রচুর

শক্তি খরচ করায় বাটারফ্লাই স্ট্রোক। ওটা করতে হলে সাঁতারুকে কোমর-বুক ও দু'হাত পানির উপরে তুলতে হয়, ফলে এগুতে গিয়ে ব্যয় হয় প্রচণ্ড শক্তি। সুইমিং পুলের মাথার কাছে থামল ফারা। পুলে সাঁতার কেটে চলেছে দুই যুবক। সন্দেহ কী, এরা পাত্তা দেয় না পরিশ্রমকে। প্রতিটি স্ট্রোক মাপা, ব্যয় করছে না বাড়তি শক্তি। ডলফিনের মত এগিয়ে চলেছে। বাড়তি পানি ছলকে উঠছে না। যেমন শিখেছে ওরা কমাণ্ডো ট্রেইনিঙে।

লক্ষ করতেই ফারা দেখল, কোমরে ওয়েট বেল্ট বেঁধে নিয়েছে মাসুদ রানা ও সোহেল আহমেদ। সাধারণ ব্যায়ামের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি খরচ করছে ওরা। মনে মনে বলল ফারা, এ আমার কাজ নয়। ওজন ঠিক রাখতে যোগ ব্যায়াম করি জাহাজের ফিটনেস সেন্টারে, সেটাই যথেষ্ট।

পুলের শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে রানা ও সোহেল, উল্টো ডিগবাজি দিয়ে আবারও ফিরছে। গতি বাড়ছে, আসছে ফারার দিকে। চোখে কালো গগলস্, শ্বাস নেয়ার সময় হাঁ করছে। খেয়াল করেছে পুলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ফারা। পানির শেষ অংশে এসে আরও দ্রুত এল দুই বন্ধু।

জাহাজের ডাক্তার হিসাবে ক্রুদের মেডিকেল স্ট্যাটাস ফারার মুখস্থ। শপথ করে বলতে পারে, ওই মাসুদ রানা, সোহেল আহমেদ আর লিউ ফু-চুং অন্য সবার চেয়ে অনেক বেশি ফিট।

দেখতে না দেখতে পৌঁছে গেল রানা ও সোহেল, পানির ঢেউ ছলকে উঠল ক্যাটওয়াকে। প্রায় লাফিয়ে পিছিয়ে গেল ফারা, আরেকটু হলে ওর গুচ্চি লোফার ভিজে যেত। খাকি প্যান্ট ও অক্সফোর্ড শার্ট পরেছে। তার উপর ল্যাব কোট। ফারা সরে যেতেই দেয়ালের দিকে চাইল দুই বন্ধু। বড়সড় ঘড়িটা জানিয়ে চলেছে সময়।

'কী রে, আমি কি বুড়ো হয়ে গেলাম?' একটু বিরক্তি নিয়ে বলল সোহেল। খুলে ফেলল গগলস্ ও ওয়েট বেল্ট।

'বেশি সিগারেট,' নিচু স্বরে বলল রানা।

'খারাপ করেনি, সোহেল,' ওদের দিকে দুটো তোয়ালে ছুঁড়ল ফারা।

পুল থেকে উঠে এল দুই বন্ধু। 'একবছর আগেও পনেরোটা ল্যাপ বেশি দিতে পারতাম,' বলল সোহেল।

'হ্যাঁ, রানা যা বলেছে, ওই সিগারেট শেষ করছে তোমার ফুসফুস,' সুযোগ পেয়ে বলল ফারা। 'বারবার বলছি, শুনছ না।'

'এবার বোধহয় ছেড়েই দেব।'

'সুইমিং করতে এসেছ?' ফারার দিকে চাইল রানা।

'ঠিক তা নয়।' উদ্বেগের ছাপ পড়ল ফারার চোখে। 'একটা সমস্যা নিয়ে আলাপ করতে এসেছি।'

'কী সেটা?'

'ঝামেলাটা আসলে উর্বশীর। তবে আমরা সবাই জড়িত হতে পারি।'

প্রশিক্ষিত সাইকোলজিস্ট নয় ফারা, তবে মেডিকেল ব্যাকগ্রাউণ্ড ও শান্ত সমাহিত আচরণ ওকে ভিন্ন পর্যায়ে নিয়ে গেছে। জাহাজের প্রায় সবাই মন খুলে কথা বলে ওর সঙ্গে।

গা মোছার ফাঁকে ফারার দিকে চাইল রানা। 'একটু খুলে বলো।'

'উর্বশীর মা কিছুক্ষণ আগে ফোন করে...'

বাধা দিল রানা, 'ওর তো তিনটে মা, কোন্ জন?' সুখী ছিলেন না উর্বশীর বাবা, প্রচুর মদ গিলে মারা গেছেন মাঝবয়সে। একা রেখে গেছেন উর্বশীর মাকে। মহিলা বহু কষ্টে মানুষ করেছেন উর্বশীকে।

'আপন মা। যিনি বালি দ্বীপে থাকেন। উনি ফোন করে জানিয়েছেন তাঁর ছেলেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।'

ক'সেকেণ্ড চুপ করে রইল রানা। উর্বশীর আপন ভাই? একটাই আছে। ছেলেটাকে দেখেছে ও। বয়স হবে আঠারোর মত। হাসিখুশি, সরল—যে যা বোঝাবে, তাই বিশ্বাস করবে।

'কোনও মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছে?'

'এখনও না। উর্বশীর মা'র ধারণা তিনি জানেন কে কিডন্যাপ করেছে। যোগাযোগ মন্ত্রীর হেরোইন-খোর ছেলে, ক'বার এসেওছে ওঁর বাড়িতে। কিছু দিন আগে সেই ছেলের সঙ্গে হাতাহাতি হয় উর্বশীর ভাইয়ের। সে হুমকি দিয়ে যায় খুন করে ফেলবে ওকে। এরপর দু'দিন আগে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় উর্বশীর ভাই। এরপর থেকে কোনও যোগাযোগ নেই। ওর মা থানায় গেছেন, কিন্তু মামলা নিতে রাজি হয়নি পুলিশ। উনি শেষে ধরেছেন উর্বশীকে, "তুই না কী এক গোয়েন্দা এজেন্সির সেক্রেটারি, তুই বড় অফিসারকে ধরলে হয়তো সাহায্য মিলবে।"'

উর্বশীর ভাই একবছর টেকেনি কলেজে, খারাপ বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে বেড়াত। অল্পদিনেই পুরোপুরি বখে যায়। কয়েকবার হেরোইনসহ ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। তিনমাস ছিল রিহ্যাব সেণ্টারে। উর্বশী সময় দিতে পারে না, কিন্তু ছোট ভাইকে খুবই ভালবাসে। অনেক বুঝিয়ে আবার ভর্তি করে দেয় কলেজে। কিন্তু এবারও পড়াশোনা বাদ দিয়েছে সে। আট মাস আগে চলে যায় ফিলিপিন্সে, মিশতে শুরু করে কী যেন এক গোষ্ঠীর সঙ্গে। বাড়ি ফেরে মাসখানেক আগে। ছেলেটা শেষদিকে এড়িয়ে চলত উর্বশীকে।

অথচ ছোট ভাইকে রক্ষা করতে যে-কোনও কাজ করতে পারে উর্বশী, জানে রানা। সোহেলের দিকে চাইল ও। 'ফারা না

বললে বুঝতাম না উর্বশী এখন দেশে ফিরতে চাইবে।'

'এদিকে বাংলাদেশি জাহাজে মিসাইল তুলে দিলেই আমাদের ছুটি,' বলল সোহেল।

তা ঠিক নয়। বিসিআই থেকে আরেকটা কাজ দেয়া হয়েছে ওদের—রানা ও সোহেলকে। ভুলেও কাউকে চাপাচাপি করেনি ওরা, কিন্তু ফু-চুং, অনিল, গগল, উর্বশী ও আতাসি খুশিমনে রাজি হয়েছে ছোট্ট ওই অ্যাসাইনমেন্টেও ওদের সঙ্গে থাকতে।

'তোমরা উর্বশীকে সাহায্য করতে পারো,' বলল ফারা।

'অনিল, ফু-চুং, আতাসি, বা ক্রুদের সঙ্গে কথা হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

'না। আগে তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছি। উর্বশী বোধহয় চাইবে না কেউ ওর ঝামেলার সঙ্গে নিজেকে জড়াক। কিছু ব্যাপারে খুব কঠোর ও। নিজের সম্মান রক্ষা করতে জান দিতে পারে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'আর আমাকে বলে, *তুমি গোঁয়ার*।'

'তোমাদের কাছে কখনও সহায়তা চাইবে না,' বলল ফারা। 'মরলেও নয়। যা করার নিজে করবে।'

'কোনও পরিকল্পনা করেছে, বলেছে তোমাকে কিছু?' জানতে চাইল সোহেল।

'মিসাইল হস্তান্তর শেষ হলেই রানাকে বলবে কাছাকাছি কোনও দেশে ওকে নামিয়ে দিতে। ওখানকার আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টে গিয়ে বিমান ধরবে। সোজা ফিরবে ইন্দোনেশিয়ায়। কী করবে, কীভাবে করবে এখনও ঠিক করেনি।'

ঘড়ির দিকে চাইল রানা। বাংলাদেশি জাহাজের সঙ্গে রন্দেভু আরও দু'ঘণ্টা পর। এ কাজের শেষে মার্ভেল রওনা হতে পারে

পোর্ট সাঈদ লক্ষ্য করে। ওখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে কায়রো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, আল কুয়াহিরাহ্। বিমানে করাচি, সেখান থেকে ইন্দোনেশিয়া। তার মানে বেশ ক'টা এয়ারপোর্ট পেরুতে হবে। সঙ্গে অস্ত্র নেয়া চলবে না।

বেশ কিছু প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে রানার মনে। ঠিক করল পরে কথা বলবে উর্বশীর সঙ্গে।

হঠাৎ সুইমিং পুলের বাতিগুলো বারকয়েক নিভু নিভু হলো, সঙ্কেত জানিয়ে দিল জাহাজের সুপার কম্পিউটার। রানা ও সোহেলকে বলছে, বাছারা, এবার সুইমিং পুল ছেড়ে উঠে পড়ো, কিছুক্ষণ পর রন্দেভু। দুই বন্ধু সুতির রোব পরে নিল, পায়ে ফ্লিপফ্লপ। ওদের পাশে হাঁটছে ফারা, বেরিয়ে এল সুইমিং পুল থেকে। হঠাৎ রানা বলল, 'মিসাইল সরানোর আগেই উর্বশীর সঙ্গে কথা বলব। ওর বোকামি হবে একা কিছু করতে যাওয়া। আমরা তো পাশে থাকতেই পারি।'

'সেটা ভেবেই তোমাদের বলেছি,' বলল ফারা। 'একা যাবে কেন উর্বশী?' ওর কণ্ঠে স্বস্তি ফুটে উঠেছে। এখন নিশ্চিত, বান্ধবীর বিপদে পাশে থাকবে রানা ও সোহেল। এবং ও।

দেড় ঘণ্টা পর অপারেশন্স সেন্টারে এসে ঢুকল রানা। আগেই চলে এসেছে সোহেল। যে যার সিটে বসে পড়েছে অনিল, উর্বশী, ফু-চুং, আতাসি ও গগল। কমিউনিকেশন নিয়ে ব্যস্ত আতাসি, সোনার কাভার করছে উর্বশী।

এমভি বাংলার গৌরব তাজউদ্দীন কাছে চলে আসছে, কিছুক্ষণ পর পাশাপাশি হবে দু'জাহাজ। তখন সরিয়ে নেয়া হবে আমেরিকান মিসাইল। কোনও জটিলতা হওয়ার কথা নয়। অ্যাশকেলন বন্দরের সেই গুমোট পরিবেশ এখন নেই, কাজের

ফাঁকে চলছে হাসি-ঠাট্টা। তবে রানা ঢুকবার পর শীতল হয়ে উঠল পরিবেশ। ওর বন্ধুরা এরইমধ্যে আন্দাজ করে নিয়েছে উর্বশীকে কী বলতে পারে রানা। এবং সে ব্যাপারে পূর্ণ সমর্থন আছে ওদের সবার।

বরাবরের মত সিটে বসল না রানা, থামল উর্বশীর পাশে। 'তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

'আমি শুনতে চাই না,' কম্পিউটার মনিটর থেকে চোখ তুলল না জেদি ইন্দোনেশিয়ান লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার। আঁচ করছে, সব বলে দিয়েছে ফারা।

'মিসাইল সরিয়ে দেয়ার পর পোর্ট সাঈদের দিকে যাচ্ছি আমরা,' বলল রানা। 'কায়রোয় রানা এজেন্সিকে জানানো হয়েছে। ওরা পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার টিকেট কাটবে। তুমি আর আমি ভোরে বন্দরে নামছি। তারপর ঠিক করব পরের পদক্ষেপ।'

চোখে আপত্তি নিয়ে রানার দিকে চাইল উর্বশী। কী যেন বলতে চলেছে, কিন্তু হাত তুলে ওকে মানা করল রানা। 'তুমি তো জানো আমাদের পরের কাজটায় আমাকে না হলেও চলবে। ওটার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবে ফু-চুং ও সোহেল।'

উপমহাদেশীয় মুসলিম জঙ্গিদেরকে বিপুল অস্ত্র উপহার দিতে চলেছে এক সৌদি প্রিন্স। এসব আধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করছে মহাবদমাশ এক ইজরায়েলি আর্মস ডিলার। টাকা দেয়া-নেয়া হবে মণ্টি কার্লোয়। রানাদের কাজ শুধু কান পেতে কথাবার্তা শোনা, এবং বিসিআইকে ওদের পরিকল্পনা জানিয়ে দেয়া। সঠিক সময়ে অস্ত্রগুলো দখল করবে বিসিআইয়ের এজেন্টরা।

'তোমরা কেন...' গ্রীবা নাড়ল উর্বশী, ছলছল করছে

দু'চোখ। 'এ আমার একার লড়াই।'

'কে বলেছে তোমাকে?' প্রায় ধমকে উঠল রানা। 'আমাদের কারও পরিবার থেকে কাউকে কিডন্যাপ করা হলে? নিশ্চয়ই তোমার সাহায্য চাইতাম। তুমি সাহায্য না করে পারতে? কাজেই শুনতে চাই না তোমার কোনও কথা।'

'যা বলেছিস,' বলল অনিল।

'গগল ছাড়া তোদের সবার মধ্যে আমারই বয়স বেশি,' গম্ভীর হয়ে বলল ফু-চুং, 'আমি পরিষ্কার বলে দিলাম, একা ওর দেশে ফেরা চলবে না।'

ওদের কথাগুলো শেষ হতেই নীরবতা নামল অপারেশন্স সেন্টারে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কী যেন ভাবল উর্বশী, তারপর মাথা নিচু করে বলল, 'ধন্যবাদ। তোমরা সত্যিকারের বন্ধু। এভাবে যে ভেবেছ, মনটা মস্ত বড় হয়ে গেল আমার। এখন জানি আমি একা নই।'

'কথাটা সবসময় মনে রেখো, মেয়ে,' বলল বেরসিক কট্টর গগল। 'বন্ধুরা সাহায্য করবে না, তো তারা আছে কী করতে?'

'কায়রো যাওয়ার পথে তোমার সঙ্গে আলাপ সেরে নেব,' বলল রানা। নিজের সিটে গিয়ে বসল। 'আতাসি ওরা যোগাযোগ করেছে?'

'হ্যাঁ, বস্, বিশ মিনিট পর পাশাপাশি পৌঁছব।'

'ফু-চুং, তোর কাজ কতদূর?'

'ডেকের উপর স্লিং লাগিয়ে দেয়া হয়েছে মিসাইলে। একজন টেকনিশিয়ান ডেরিকের কন্ট্রোল নিয়ে অপেক্ষা করছে।'

'আতাসি, রেইডার বা কমিউনিকেশন চ্যানেলে নতুন কিছু?'

'কিছুই নেই। চারপাশ চুপচাপ। গত দু'ঘণ্টার ভিতর এমভি

বাংলার গৌরব তাজউদ্দীন ছাড়া আর কোনও জাহাজ দেখিনি রেইডারে। কথাও বলছে না কেউ।'

সাধারণ শিপিং লেন থেকে অনেক দূরে ঠিক করা হয়েছে রন্দেভুর জায়গা। এদিকে আসে না ট্যাঙ্কার বা ফ্রেইটার। অত সি-লাইফও নেই যে কমার্শিয়াল ফিশিং হবে। স্যাটালাইটগুলোর কাভারেজের মাঝে সঠিক সময় ও স্থান বেছে নিয়েছে ওরা, কোনও পশ্চিমা দেশ আকাশ থেকে নজর রাখবে না ওদের উপর।

ধীরে ধীরে পেরিয়ে গেল সাত মিনিট, তারপর বলে উঠল আতাসি, 'ওরা পৌঁছে গেছে। দক্ষিণে এক মাইল পিছনে।'

'গুড।' গগলের দিকে চাইল রানা। 'অপেক্ষা করো।'

আরও দশ মিনিট পেরুল। উর্বশী ও গগলের কম্পিউটার ধরছে সোনার তরঙ্গ। সঙ্গে রয়েছে মার্ভেলের জিপিএস কোঅর্ডিনেট। জাহাজে গুঁতো লাগবে না। রেডিও সম্পূর্ণ নীরব।

কিছুক্ষণ পর বলল উর্বশী, 'ইঞ্জিনের আওয়াজ প্রায় নেই। মনে হয় গতি তুলছে না। স্রেফ ভাসতে ভাসতে আসছে স্রোতের টানে।'

'ওটা দেড় শ' গজ পিছনে, খুব ধীরে আসছে,' বলল গগল। 'পোর্ট সাইডের এক শ' ফুট দূরে।'

'থ্রাস্টার দিয়ে পঞ্চাশ ফুট পাশে সরো,' বলল রানা।

বাটন টিপে বো ও স্টার্ন থ্রাস্টার ব্যবহার করল গগল, সাগরে নিঃশব্দে সরতে শুরু করেছে মার্ভেল। কিছুক্ষণ পর থেমে গেল। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁচেছে। ডাইন্যামিক পজিশনিং সিস্টেম রি-অ্যাকটিভেট করল গগল। সাগরে ওদের স্থির রাখবে কম্পিউটার।

'ওটার ইঞ্জিন স্থির, প্রতি মিনিটে দশ ফুট করে আসছে।'

'গগল, ওরা থামলে পাশে ভিড়তে হবে,' অপারেশন্স সেন্টারের পিছনে পৌঁছল রানা, সোহেলকে নিয়ে উঠল এলিভেটরে। সরাসরি উঠে এল মার্ভেলের ব্রিজে। মেঝের হ্যাচ খুলতেই মুখে লাগল নাতিশীতোষ্ণ হাওয়া, বয়ে চলেছে ঝিরঝির করে।

নোংরা ব্রিজে কালি-গোলা অন্ধকার। তবে ওরা ভাল করে চেনে এ জাহাজের প্রতিটি ইঞ্চি। ব্রিজের পিছনে চলে গেল দু'জন, আঁধারে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। দু'মিনিট পর পৌঁছে গেল মেইন ডেকে। আকাশে মেঘ নেই, ঝিকমিক করছে হাজারো-কোটি তারা। কিছুক্ষণ পর চাঁদ উঠলে ম্লান হবে।

পোর্ট সাইডে চলে আসছে এমভি বাংলার গৌরব তাজউদ্দীন। এবার দায়িত্ব মার্ভেলের, থ্রাস্টার নিয়ন্ত্রণ করবে কম্পিউটার, দুই জাহাজে যাতে ঠোকাঠুকি না হয়।

ব্রিজ থেকে ওয়াকি-টকি নিয়ে এসেছে রানা, ওটার মাউথ পিস ঠোঁটের কাছে তুলল। 'গগল, ব্যালাস্ট বাড়িয়ে নাও। ওই জাহাজের ডেকের সমান করো মার্ভেলের ডেক।'

দু'সেকেণ্ড পর চালু হলো পাম্পগুলো, ট্যাঙ্কে ভরতে শুরু করেছে পানি। ধীরে ধীরে সাগরে ডেবে বসছে মার্ভেল।

'ডেক ক্রু, ফেণ্ডার নামিয়ে দাও রেইলিঙের পাশে,' নির্দেশ দিল রানা। ব্যস্ত হয়ে উঠল নাবিকরা, রাবারের পুরু বাম্পার নামিয়ে চলেছে। পুরনো টায়ারের বদলে আধুনিক কুশন ব্যবহার করছে। প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে পারে এগুলো।

বাংলাদেশি জাহাজের ডেকে স্বল্প ওয়াটের বাতি জ্বলছে। নাবিকরা অপেক্ষা করছে, চেয়ে রয়েছে মার্ভেলের ডেকের দিকে। ওখানে ট্রলির উপর রাখা আণবিক মিসাইল। তবে চেহারা দেখা গেল না, রাখা হয়েছে কাঠের বাক্সের ভিতর।

ওয়াকি-টকি ব্যবহার করল রানা। 'গগল, থ্রাস্টার-এ পঁচিশ পার্সেন্ট পাওয়ার দাও।'

'টোয়েন্টি ফাইভ, রানা।'

খুব ধীরে সরছে মার্ভেল।

তাজউদ্দীনের ডেক-রেইলিঙে থেমেছে অফিসাররা।

'গতি কমাও, গগল,' অভ্যস্ত চোখে মাঝের দূরত্ব দেখছে রানা। আর পঁচিশ ফুট দূরে জাহাজ। স্ক্র্যাম্বল্ড চ্যানেলে বলল, 'এখানে থামো।'

মোটা একটা কণ্ঠ বলে উঠল ওই জাহাজ থেকে, 'আপনারা দারুণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন জাহাজ।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আপনারা মাল নিতে তৈরি?'

'শুনেছি দুটো বাক্স দেবেন?' জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন চৌধুরি মনোয়ার হোসেন।

'সম্ভব হয়ে উঠল না, একটা ব্যবহার করা হয়েছে ইজরায়েলি উপকূলে।'

'ফাটিয়ে দিয়েছেন? কোথাও তো শুনলাম না আণবিক বোমা পড়েছে ইজরায়েলে...'

'অন্য ভাবে ব্যবহার হয়েছে। আণবিক বিস্ফোরণ হয়নি।'

'মাশ্‌আল্লাহ্‌, ভাল। কোনওদিন যেন আণবিক বোমা ব্যবহার না হয়। ...আমরা তৈরি, ক্যাপ্টেন রানা।'

'আপনাদের জলদি করতে হবে,' বলল রানা। 'বারো মিনিট চল্লিশ সেকেণ্ড পর একটা আমেরিকান স্যাটালাইট আসছে। মিসাইলের সঙ্গে নেবেন আরেকটা ছোট বাক্স।'

'কীসের?'

'আরেকটা ওঅরহেড।'

ডেরিকের কণ্ট্রোল নিয়ে অপেক্ষা করছে এক টেকনিশিয়ান,

তার দিকে ফিরল রানা। ওই ক্রেন দেখলে মনে হয় যে-কোনও সময়ে ভেঙে পড়বে, কিন্তু বাস্তবে অনায়াসে বইতে পারে সত্তর টন। দ্রুত টানটান হলো ঢিলা কেবল, স্লিংগুলো তুলতে শুরু করেছে কাঠের বাক্স। ক'জন নাবিক ধরে রেখেছে গাইড রোপ। বাক্স ঘুরতে শুরু করলে ঠেকাবে। রেইলিং পার করে দিতে হবে মিসাইল। দীর্ঘ বুম ঘুরছে ওটা নিয়ে।

বাংলাদেশি জাহাজের ডেকে তৈরি নাবিকরা। যত দ্রুত সম্ভব সরিয়ে নেবে মিসাইল। ঘড়ির কাঁটার মত করে হাত ঘোরাতে শুরু করেছে এক নাবিক। সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রমিকরা ব্যবহার করে এই ইশারা। কেবল ঢিল দিতে বলছে। সঙ্গীদের নিয়ে তৈরি, নিজেদের হাতে তুলে নেবে মিসাইল। বাক্স কাছে চলে আসতেই সতর্ক হয়ে উঠল তারা। ওজন নিল আটজন মিলে, দু'জন খুলে দিল স্লিং। মিসাইলের বাক্স দ্রুত ডেক থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল বাঙালি নাবিকরা। সরে গেল মার্ভেলের ক্রেন। পরের এক মিনিটে আবার ফিরল বুম, সঙ্গে ছোট একটা বাক্স। ওটাও অদৃশ্য হলো ওই জাহাজের সুপারস্ট্রাকচারে।

'আপনারা সরলে রওনা হই আমরা,' বললেন ক্যাপ্টেন মনোয়ার।

ক্রুদের আগেই নির্দেশ দিয়েছে রানা, ডেরিক সরিয়ে নাও। এবার হেলমস্‌কে বলল, 'সরে এসো, গগল। পাওয়ার পঁচিশ পার্সেন্ট। পাম্প চালু করে পানি সরিয়ে দাও। মার্ভেলকে ঘুরিয়ে নিয়ে গতি তোলো চল্লিশ নটে। পোর্ট সাঈদে চলেছি।'

খুব ধীরে সরতে শুরু করেছে মার্ভেল।

'রেইডার কন্ট্যাক্ট, বস্‌,' জানাল আতাসি। 'স্কোপের শেষ মাথায়। আমাদের পিছনে এক শ' মাইল দক্ষিণ-পুবে।'

'ট্র্যাক করো, অস্বাভাবিক কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।'

রেইলিং থেকে চেঁচিয়ে জানাল রানা, 'ক্যাপ্টেন মনোয়ার, আমরা রেইডারে অন্য কাউকে পেয়েছি। পিছনে, দক্ষিণ-পুবে। অনেক দূরে, তবু মনে হয় রওনা হয়ে যাওয়া উচিত আপনার।'

'তা বলতে। জানিয়ে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'তবে আসার সময় ওটাকে দেখেছি। প্যাসিভ সোনার বলেছে কোনও আওয়াজ নেই ওখানে। জাহাজটা বোধহয় নোঙর ছিঁড়ে এসেছে পোর্ট সাঈদ থেকে। অটোমেটিক ডিসট্রেস সিগনাল নেই। জাহাজে উঠে যে দেখব, সে-সময় ছিল না। ভিন্ন মিশন নিয়ে এসেছি। তবে আপনারা দেখতে পারেন। স্যালভেজ করলে মোটা মুনাফা পাওয়া যায়।'

'আপনারা আমাদের অনেক পরে ফিরছেন, আমরা হয়তো স্যালভেজের কাজটা নিতে পারি,' বলল রানা। ভাবছে, যোগ্য লোকের অভাব নেই মার্ভেলে, ওই জাহাজ নিয়ে যাওয়া যায় পোর্ট সাঈদে। ক্ষতি কী? ক্রুরা পেতে পারে কয়েক লাখ ডলার।

'ওই জাহাজ প্রায় আপনাদের মার্ভেলের সমানই, বড়জোর পাঁচ শ' পঞ্চাশ ফুট।'

'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন। আমরা ওদিক দিয়েই যাব, দেখি ঢুঁ দেব কি না।'

'ভাল থাকুন।' বারকয়েক হাত নেড়ে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন। এমভি বাংলার গৌরব তাজউদ্দীনের ডেক থেকে সরে গেছে নাবিকরা।

গতি বাড়ছে মার্ভেলের, চলেছে দক্ষিণ-পুব লক্ষ্য করে। ডেকের উপর হু-হু করে বইতে শুরু করেছে শীতল হাওয়া। কিছুক্ষণ পর আরও গতি তুলবে ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিন, তখন ডেকে থাকলে মনে হবে সামনে থেকে আসছে তীব্র হারিকেন। ক্রেন বুম বেঁধে সুপারস্ট্রাকচারে গিয়ে ঢুকেছে ক্রুরা।

মিসাইলের ট্রলি চলে গেছে টর্পেডো রুমে।

একটা সিঁড়ি-ঘরের পাশে থেমেছে রানা ও সোহেল।

'তুই কী বলিস, সোহেল?'

'কী বিষয়ে, প্রিয় শ্যালক?'

'জাহাজটা ওখানে। আমরা থামতে পারি। এক ঘণ্টার মামলা। তারপর রওনা হয়ে যেতে পারি সুয়েজের দিকে।'

'উর্বশী অস্থির হবে না। তোদের প্লেন কাল দুপুর বারোটায়। হাতে সময় আছে।'

ওয়াকি-টকি চালু করল রানা। 'গগল?'

'বলো।'

'নতুন কোর্স নাও। সোজা ওই জাহাজ লক্ষ্য করে। তবে ভোরের আগে পৌঁছতে চাই পোর্ট সাঈদে।'

'সহজেই সম্ভব।'

'ক্যাপ্টেন আলম সিরাজকে জানিয়ে দাও, রবিনসন তৈরি রাখুন। ইউএভি-ও লাগতে পারে। যদি কপ্টার নিই, ইউএভি চালাবে অনিল।'

বিমান বা হেলিকপ্টার চালাতে মোটেই স্বচ্ছন্দ বোধ করে না অনিল। কিন্তু ফ্লাইট সিমুলেটর গেম্স-এর পোকা। আনন্দের সঙ্গে চালায় মার্ভেলের রিমোট অপারেটেড ড্রোন।

'আমরা কখন পৌঁছব, গগল?'

'লাগবে এক ঘণ্টার একটু বেশি। পোর্ট সাঈদে পৌঁছব ভোর ছ'টা দিকে।'

'যথেষ্ট,' বিড়বিড় করে বলল সোহেল।

ইন্দোনেশিয়ান লেফটেন্যান্ট কমান্ডারের উদ্দেশে বলল রানা, 'ব্যাগেজ গুছিয়ে নাও, উর্বশী। আমরা মিশরে পৌঁছব ভোরে।'

ঝড়ো হাওয়ার মাতম শুরু হয়েছে, যেন হু-হু করে কাঁদছে প্রকৃতি। সুপারস্ট্রাকচারে ঢুকে পড়ল রানা ও সোহেল, চলেছে অপারেশন্স সেন্টারে।

আট

চাঁদের আবছা আলোয় ওটা যেন ওয়েডিং কেক, অসংখ্য স্তর সহ অপেক্ষা করছে—কে জানে কয়তলা জাহাজ! তবে কোনও সন্দেহ নেই প্রমোদ-তরী। চারপাশ এখন নিশ্চুপ, থমথম করছে। জাহাজের মাথার উপর উড়ছে মার্ভেলের ড্রোন। অপারেশন্স সেন্টার থেকে খেয়াল করছে রানা ও অন্যরা। চুপ হয়ে গেছে সবাই, মনে অস্বস্তি। ভুতুড়ে লাগছে জাহাজটাকে।

কোনও পোর্টহোলে বাতি নেই। কেউ হাঁটছে না ডেকের উপর। রেইডার বার থেকে কোনও সঙ্কেত নেই। ব্যাপার কী?

শান্ত সাগরের মৃদু ঢেউ মাথা খুঁড়ছে জাহাজের সাদা খোলে, যেন চাপড় দিয়ে সরাতে চাইছে বিশাল এক আইসবার্গ। ড্রোনের আইআর ক্যামেরা থেকে থার্মাল ইমেজিং আসছে। কখন কে জানে ওই জাহাজের ইঞ্জিন ও চিমনি ঠাণ্ডা হয়েছে! মেডিটারেনিয়ান সাগরে শীতল পরিবেশ। ড্রোনের যন্ত্রপাতি এখনও খুঁজছে জীবন্ত দেহের তাপ।

‘ওখানে কী ঘটে থাকতে পারে?’ বলল উর্বশী। জানে, কারও কাছে জবাব নেই। উত্তর পাবে, সে-আশাও করেনি।

'ডেকের উপর দিয়ে চলুন, মিস্টার সিরাজ,' বলল রানা।

অপারেশন্স সেন্টারের পিছনে ওঅর্ক স্টেশনে বসেছেন ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ, কম্পিউটার স্ক্রিনের রঙিন আলো পড়ছে তাঁর মুখে। বার দুয়েক দাড়ি হাতড়ে নিলেন তিনি, সামনের দিকে ঠেললেন জয়স্টিক। ইউএভি বা রেডিও কণ্ট্রোল্ড প্লেনটা চিনের তৈরি, সঙ্গে রয়েছে শক্তিশালী ক্যামেরা ও ট্র্যান্সিভার। এ মুহূর্তে ক্রুজ শিপের মাথার উপর চলে এসেছে খুদে বিমান। প্রমোদ-তরীর তিরিশ মাইল উত্তর-পশ্চিম থেকে দ্রুত ছুটে আসছে মার্ভেল।

বিশাল স্ক্রিনের দিকে চেয়ে রইল সবাই। ইউএভি উড়ে গেল জাহাজের স্টারবোর্ড রেইলের উপর দিয়ে। ডেক দেখিয়ে চলেছে ক্যামেরা। দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, নীরবতা নেমে এসেছে অপারেশন্স সেন্টারে। যা দেখছে, বিশ্বাস করতে পারছে না কেউ। ঘরের পরিবেশ অস্বস্তিকর। সবার আগে নীরবতা ভাঙল রানা, যোগাযোগ করল কমিউনিকেশন প্যাডে। 'অপারেশন্স সেণ্টার থেকে মেডিকেল বে। ডক্টর ফারাকে এক্ষুণি দরকার!'

'যা দেখলাম তা কি সত্যি?' চাপা স্বরে বলল উর্বশী।

'তা-ই মনে হলো,' বলল সোহেল। 'জাহাজের ডেকে ওগুলো লাশই! অসংখ্য!'

ওখানে অন্তত এক শ' মৃতদেহ। কেউ চিত হয়ে, কেউ উপুড়, কেউবা পড়ে রয়েছে গা মুচড়ে। মনে হয় মানুষগুলো মারা গেছে প্রচণ্ড কষ্ট পেয়ে। বাতাসে পতপত করে নড়ছে পোশাক। ক্যামেরা জুম করলেন সিরাজ। উপরের ডেকে সুইমিং পুল। চারপাশে অতিথি। যেন একসঙ্গে আছড়ে পড়েছে। ছড়িয়ে রয়েছে ডিশ ও গ্লাস। ইউএভির গতি কমিয়ে আনলেন সিরাজ,

আরও জুম করলেন ক্যামেরা। এক যাত্রীর মুখ ভেসে উঠল। কমবয়সী মেয়ে, পরনে উৎসবের পোশাক। নিজ রক্তের সাগরে চিরতরে স্থির। প্রায় একই সময়ে মৃত্যুবরণ করেছে জাহাজের সবাই!

'এ জাহাজের নাম কী?' নিচু স্বরে বলল উর্বশী।

'গোল্ড অভ মার্স,' বলল রানা। মন থেকে উধাও হয়েছে জাহাজ স্যালভেজ করবার ইচ্ছা। তিক্ত হয়ে উঠেছে হৃদয়।

'মঙ্গল গ্রহের সোনা, অমঙ্গল এনেছে ওখানে,' বিড়বিড় করে বলল অনিল। কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। এ জাহাজ সম্বন্ধে তথ্য যোগাড় করতে চাইছে। অন্যরা স্ক্রিনের দিকে চেয়ে রইল বিস্ফারিত চোখে। দেখছে নারকীয় দৃশ্য।

দ্রুত পায়ে অপারেশন্স সেণ্টারে এসে ঢুকল ডক্টর ফারা, পরনে পায়জামা ও বিশাল এক টি-শার্ট। পায়ে চটি। উস্কোখুস্কো চুল। ডানহাতে ঝুলছে মেডিকেল কেস। ওটা সবসময় থাকে ওর স্টেট রুমে। ছুটে আসতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। শ্বাস নেয়ার ফাঁকে বলল, 'কার কী হলো?'

কেউ জবাব দিল না। কয়েক সেকেণ্ড পর স্ক্রিনের উপর স্থির হলো ফারার চোখ। সে দক্ষ ডাক্তার, আফগানিস্তানে যুদ্ধ দেখেছে, মার্কিনি নৃশংসতা দেখেছে, কিন্তু এমন করুণ দৃশ্য আগে কখনও দেখেনি। ডেক ভরা রক্তাক্ত লাশ দেখে বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল ফারা। কয়েক মুহূর্ত লাগল মন স্থির করতে, তারপর আস্তে করে মাথা নাড়ল। চলে গেল স্ক্রিনের কাছে, আরও ভাল করে দেখতে চাইছে। একে স্বল্প আলো, তার উপর থরথর করে নড়ছে ইউএভি, পরিষ্কার নয় ছবি।

'কোনও ধরনের ট্রমা নয়,' কিছুক্ষণ পর মন্তব্য করল ফারা। 'বোধহয় দ্রুতগতি কোনও হেমোরেজিক ভাইরাস।'

'প্রকৃতির সৃষ্টি?' জানতে চাইল সোহেল।

'না। প্রকৃতির কাজের ধরন এরকম নয়। এটা অতর্কিত আক্রমণ মনে হচ্ছে—মানুষের কাজ।'

'ওরা কোনও সুযোগই পায়নি, ডিসট্রেস সিগনাল পর্যন্ত পাঠাতে পারেনি,' বলল রানা।

ওর দিকে ফিরল ফারা। 'ওখানে যেতে চাই। স্যাম্পল নেব। মেডিকেল বে-তে রয়েছে বায়ো-হ্যাজার্ড গিয়ার। ডেকে ডি-কনট্যামিনেশন স্টেশন তৈরি করবে আমার অ্যাসিস্টেন্টরা।'

'বাদ দাও,' বলল রানা। 'ওই জাহাজে উঠে তুমি ভাইরাস বয়ে আনবে সেটা চাই না আমি।' তর্ক করতে চাইছে ফারা, কিন্তু আগেই থামিয়ে দিল রানা। 'আমরা একটা ইনফ্লেটেবল যোডিয়াক নেব। কাজ শেষে ওটা ডুবিয়ে দেব। ...অনিল, তুই ক্যাপ্টেন সিরাজের কাছ থেকে ইউএভি বুঝে নে। ...সিরাজ, আপনি হ্যাঙারে চলে যান, তৈরি রাখুন হেলিকপ্টার। ...সোহেল, ফু-চুং, তোরা পিস্তল নে আর্মারি থেকে। দশ মিনিট পর চলে আসবি হ্যাঙারে। ...ফারা, তোমার কোনও সহকারী দরকার?'

'একজন সাহায্য করলেই চলবে,' বলল ফারা।

'বেশ। সঙ্গে বাড়তি বায়ো-সুট নিয়ো। কেউ বেঁচে থাকতে পারে।' আগেই সিট ছেড়েছে রানা। 'আমরা বিশ মিনিট পর আকাশে উঠছি।'

গগল ভুল বলেনি, গোল্ড অভ মার্স-এর কাছে পৌঁছতে দু-ঘণ্টার খানিক বেশি লাগল মার্ভেলের। ততক্ষণে ইকুইপমেন্ট ও যাত্রী সংখ্যার কারণে ঠিক হয়েছে, দুই ট্রিপ দেবে রবিনসন। গোল্ড অভ মার্স জাহাজটার উপর ঘুরছে ইউএভি। কিছুক্ষণ পর অনিল জানাল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাশের কারণে ডেকে নামা অসম্ভব। জাহাজে নামতে হলে সেরা জায়গা ব্রিজের ছাত।

অবশ্য সরাসরি নামবে না রবিনসন। আর সবার মত কমলা রঙের বায়ো-হ্যাজার্ড সুট পরে নিয়েছেন সিরাজ। সুটের ভিতর রয়েছে রিব্রিদার। এদিকে হোস পাইপ নিয়ে তৈরি ফারার দুই আর্দালি। মার্ভেলের ডেকের উপর হেলিকপ্টার ফিরলে শক্তিশালী ব্লিচ ছিটিয়ে দেবে ট্যাঙ্ক থেকে। প্রতিটি জিনিস ডিজ-ইনফেক্ট করবে।

বাড়তি ঝুঁকি নিতে রাজি নয় রানা। যেসব ক্রু টেনে আনবে যোডিয়াক, তাদেরও ব্লিচ দিয়ে ডিজ-ইনফেক্ট করা হবে। যে অণু গোল্ড অভ মার্সের যাত্রীদের মেরে ফেলেছে, সেটা প্রাকৃতিক নয়। ওরা দেখতে চলেছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ভয়াবহতা। খুন করা হয়েছে শত শত মানুষকে। শুধু ওই ভয়ঙ্কর ভাইরাসের কথা ভাবছে না রানা, সেই সঙ্গে ভাবছে এ অপরাধ যারা ঘটালো তাদের কথাও।

দু'হাত উঁচু করে রাখল রানা। সুটের সঙ্গে যেখানে কনুই পর্যন্ত লম্বা গ্লাভস্ মিশেছে, সেখানে রুপালি ডাক্ট-টেপ আটকে চলেছে ফারা। কাজ শেষে পিঠের যিপার আটকে দিল আরও টেপ দিয়ে। ট্যাঙ্ক থেকে সঠিক পরিমাণের বাতাস আসছে। আগেই অ্যাক্টিভেট করা হয়েছে কার্বন স্ক্রাবার। তিন ঘণ্টা পর সুট থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

'ধীরে হাঁটবে, যেদিকে যাও বুঝেশুনে, ধীরস্থির হয়ে,' ইণ্টিগ্রেটেড কমিউনিকেশন নেটে বলল ফারা। ব্যস্ত হাতে কাজ করে চলেছে। 'কিছু করার আগে ভেবেচিন্তে নেবে। ভুলেও দৌড়াবে না। মনে রাখবে এ সুট বাঁচিয়ে রাখবে তোমাদের। যদি বাতাসে প্যাথোজেন থাকে, ঢুকে পড়তে পারে সুটের সামান্য ছেঁড়া জায়গা দিয়েও।'

'আর যদি সুট ছিঁড়ে যায়?' একটু থমকে গিয়ে জানতে চাইল

ফু-চুং। রানা চাইছে ও গোল্ড অভ মার্সের কম্পিউটার ঘেঁটে দেখুক। জানতে হবে জাহাজটা গত কিছুদিন কোথায় ছিল।

'সঙ্গে সঙ্গে মরে ভূত হবি,' মন্তব্য করল সোহেল। 'আমাদের সবাইকে তাড়া করে বেড়াবি সঙ্গে নেবার জন্যে।'

'আমি বাড়তি টেপ আটকে দেব সবার সুটের সঙ্গে,' বলল ফারা। 'সুট যদি ছিঁড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাতে হবে। এসব সুটে রয়েছে পজিটিভ এয়ার প্রেশার, কাজেই তোমরা যদি দ্রুত হাত চালাও, বিপদে পড়বে না। আমি না আসা পর্যন্ত ওখানে অপেক্ষা করবে। আমার জানতে হবে কী দিয়ে কাটল সুট।'

সোহেলের সুটের কাজ শেষে ফু-চুংকে নিয়ে পড়ল ফারা। রাবারের ফ্যাব্রিকের প্রতি ইঞ্চি পরীক্ষা করছে। সেলাই করা অংশে আটকে দিল টেপ। সোহেল, ফু-চুং ও রানার কোমরে ঝুলছে লোডেড পিস্তল। পুরু গ্লাভ্স্-এর কারণে ট্রিগার টানা কঠিন হবে, কিন্তু রানা আগেই জানিয়ে দিয়েছে, অস্ত্র ছাড়া যাওয়া চলবে না কারও।

রবিনসনের ককপিট থেকে জানালেন আলম সিরাজ, 'আমি তৈরি, মিস্টার রানা।' তাঁর পিছনের সিটে স্তূপ হয়ে রয়েছে নানা ধরনের গিয়ার।

কাছের এক টেকনিশিয়ানের উদ্দেশে গলা ছাড়ল রানা। তবে হ্যাজম্যাট সুটের কারণে কিছুই শুনল না সে। স্বাভাবিক পায়ে দেয়ালের পাশে চলে গেল রানা, সুইচ টিপে দিল হ্যাঙার এলিভেটরের। মাথার উপর দু'ভাগে সরে গেল ছাত, চারটে হাইড্রোলিক র‍্যাম তুলে নিয়ে চলেছে মেঝেটা। কপ্টারের পিছন দরজা খুলে অপেক্ষা করল রানা। ফারা উঠে পড়তেই নিজে বসে পড়ল কো পাইলটের সিটে।

সোহেল ও ফু-চুং সরে যেতেই ইঞ্জিন চালু করলেন সিরাজ। তিন মিনিটে গরম হয়ে উঠল পিস্টনগুলো, ট্র্যান্সমিশন এনগেজ করলেন পাইলট। ঘুরতে শুরু করেছে মেইন রোটর। নড়ে উঠল রবিনসন, গতি তুলছে পাখাগুলো। কিছুক্ষণ পর যথেষ্ট শক্তি পেল পাখা, বাতাসকে দাবিয়ে দিয়ে ভেসে উঠল যান্ত্রিক ফড়িং।

আধ মিনিট পর দুলুনি কমল, সরাসরি আকাশে উঠতে লাগল কপ্টার। তার কয়েক সেকেণ্ড পর মার্ভেলের উপর থেকে সরে গেল রবিনসন। দুই জাহাজের মাঝখানে আধ মাইল দূরত্ব। নীচে সিল বোট ও পিছনে খুদে যোডিয়াক দেখল রানা, নাচছে ঢেউয়ের মাথায়। গোল্ড অভ মার্সের ওয়াটার লাইনের একটু উপরে বিশাল লোডিং ডোর। ওখান দিয়ে মালামাল তোলা হতো। ওখানে বেঁধে রাখা হবে যোডিয়াক, ফিরবার সময় গোসল করে নেবে ওরা ব্লিচ দিয়ে।

জাহাজের দিকে যাওয়ার পথে ভাবল রানা, দেখতে সত্যিই সুন্দর ক্রুজ শিপটা। দৈর্ঘ্যে মার্ভেলের থেকে সামান্য খাটো হলেও অনেক বেশি উঁচু। সাত তলা। রয়েছে বিলাসবহুল কেবিন ও সুইট। সুদৃশ্য বাঁকের বো আর শ্যাম্পেন-গ্লাসের মত ক্লাসিক ফ্যানটেইল। সুইমিং পুলের পিছনে একমাত্র চিমনি। ওটার কারণে দৃষ্টি ভ্রম হয়, মনে হয় পানি কেটে চলেছে জাহাজ।

গোল্ড অভ মার্সের স্টার্ন পেরুল রবিনসন। ডায়মণ্ড ক্রুজ লাইন্স-এর লোগো চোখে পড়ল রানার, চিমনির উপর আঁকা ছবি—দু'হাতে তুলে ধরেছে অসংখ্য হীরার খণ্ড।

রবিনসন নিয়ে হুইল হাউসের উপর স্থির হলেন আলম সিরাজ, চারপাশ দেখে নিলেন—খুব কাছে নেই অ্যান্টেনা ও রেইডার ডিশের জঙ্গল। নামবার জায়গা অপরিসর, কিন্তু দক্ষ পাইলট ধীরে নামতে শুরু করলেন। ডেকের দু'ফুট উপরে থামল

কপ্টার। এখন আর নড়ছে না, যেন গেঁথে দেয়া হয়েছে পেরেক দিয়ে। গলা ফাটিয়ে বললেন সিরাজ, 'মঙ্গল কামনা করছি।'

দরজা খুলে ফেলল রানা। মাথা নিচু করে নেমে পড়ল। নিজের দিকের দরজা খুলেছে ফারা, আরেক হাতে মেডিকেল কেস। রোটরের ঝড়ো হাওয়া ছিঁড়ে ফেলতে চাইল ওর সুট। এগিয়ে এসেছে রানা, একে একে নামাতে শুরু করল বাক্স। ওর কাজ শেষে লাফিয়ে নেমে এল ফারা। দরজাটা আটকে দিল রানা, চাপড়ে দিল কপ্টারের পিছনটা। সঙ্গে সঙ্গে উঠতে শুরু করলেন সিরাজ, এবার আনবেন সোহেল ও ফু-চুংকে।

কপ্টারের আওয়াজ কমে যেতেই রেডিওতে বলল ফারা, 'আমি প্রথমে সিক বে দেখব, রানা।'

'এখন নয়,' মানা করে দিল রানা। 'এখানে অপেক্ষা করো। আগে ওরা আসুক। আমি চাই তোমার সঙ্গে থাকুক সোহেল। যে-কেউ হারিয়ে যেতে পারে এসব জাহাজের অলিগলি ও তস্য-গলিতে।'

ঠিকই বলেছে রানা, তর্ক করল না ফারা। জানে, মেয়ে বলে বাড়তি মনোযোগ পায়নি রানার কাছ থেকে। মনোযোগ পেয়েছে, তার কারণ ও জাহাজের একমাত্র ডাক্তার। ওর কিছু হলে শত মাইলের ভিতর মিলবে না চিকিৎসা। যদি এখানে খারাপ কিছু ঘটে, চিকিৎসা সেবা দেয়ার দায়িত্ব ফারার।

দশ মিনিট পেরুনোর আগেই আবারও ফিরল রবিনসন। হোস পাইপ থেকে ছুটে আসা ব্লিচের কারণে ওটার পেট এখনও ভেজা। ফ্লাইং ব্রিজের সিঁড়ি-ঘরে থামল রানা ও ফারা, খালি জায়গা পাওয়ার পর নামতে শুরু করলেন আলম সিরাজ। দু'ফুট বাকি থাকতে নেমে পড়ল সোহেল ও ফু-চুং। দু'সেকেণ্ড পর উঠতে শুরু করল রবিনসন। ওটা ফিরবার পর ব্লিচ দিয়ে ভাল

ভাবে ধোয়া হবে আবার। ওখানেই অপেক্ষা করবে কপ্টার, রানাদের কোনও বিপদ হলে দেরি না করে চলে আসবে।

'আসবার আগে অনিলের কাছ থেকে কী জানলি, ফু-চুং?' কাজের কথায় এল রানা।

'বলেছে এ জাহাজ এসেছে ফিলিপিন্স থেকে,' বলল ফু-চুং। 'তথ্য নিয়েছে ক্রুজ লাইন্সের ডেটাবেস থেকে। চার্টার করা হয়েছে ম্যানিলা থেকে। যাবে এথেন্স। ভাড়া নিয়েছে এক সেলফ-হেল্প গ্রুপ।'

'তুই এ জাহাজের কম্পিউটার মেমোরি ঘেঁটে লগ পরীক্ষা করে দেখ, ফু-চুং,' বলল রানা। 'জানা দরকার আসবার পথে কোথাও থেমেছে কি না। যদি চলার পথে অস্বাভাবিক কিছু ঘটে থাকে, লগ বুকে লেখা থাকবে। ...ফারা, তুমি সোহেলের সঙ্গে যাবে। স্যাম্পল নেবে, দেখা যাক কিছু বোঝা যায় কি না।'

'তুই কোথায় চললি?' জানতে চাইল সোহেল।

'সঙ্গে তিন ঘণ্টা চলার মত বাতাস, চাই জাহাজের যত বেশি সম্ভব এলাকা ঘুরে দেখতে।' সুইচ টিপে ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে নিল রানা। পিঠে ঝুলন্ত থলির ভিতর রয়েছে বাড়তি ব্যাটারি।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা উইং ব্রিজে। পিছন দিকে সরু ফুটপাথ, সাগর থেকে আশি ফুট উপরে ঝুলছে। তার উল্টোদিকে কিছু কণ্ট্রোল লিভার ও সুইচ। ওগুলো ব্যবহার করে বন্দরে জাহাজ নিয়ে রাখে হার্বার পাইলট। এক পাশে একটা দরজা। ওটা দিয়ে ব্রিজে ঢোকা যায়। নব ঘোরাতেই খুলে গেল দরজা। ভিতরে ঢুকল রানা। হাই-টেক ব্রিজ। সব ধরনের পাওয়ার বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ব্যাটারিগুলো ফুরিয়ে এসেছে। ইমার্জেন্সি বাতি টিমটিম করে জ্বলছে। ব্রিজের গাঢ় আঁধারে প্রায় কিছুই চোখে পড়ে না। সামনের বিশাল জানালা দিয়ে আসছে

চাঁদ-তারার আবছা আলো।

ঘরের চারপাশে আলো ফেলল রানা। পাঁচ সেকেণ্ড পেরুনোর আগেই চোখে পড়ল প্রথম লাশ। ব্রিজে ঢুকেছে ফু-চুং, সোহেল ও ফারা। টর্চের আলোয় রানাকে পাশ কাটাল ফারা। ফু-চুঙের হাতে ভিডিও ক্যামেরা, ভাইজরে চোখ রেখে চারপাশের ছবি তুলছে। লাশের পরনে সাদা ইউনিফর্ম। জাহাজের অফিসার। কুচকুচে কালো চাপ দাড়ি। ঘাড় কাত করে অন্যদিকে চেয়ে। টর্চের স্বল্প আলো পড়েছে তার ঘাড়ের উপর। ফ্যাকাসে সাদা ত্বক ফেটে বেরিয়েছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। পাশে বসল ফারা, সোহেলের সাহায্য নিয়ে চিত করল লাশ। লোকটার নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে ঝরেছে রক্ত। শরীরের ত্বক ফেটে ঝর্নার মত বেরিয়েছে। দ্রুত হাতে পরীক্ষা করছে ফারা। নতুন তথ্য পেলে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে।

ব্রিজে ব্যাকআপ ইলেকট্রিকাল সিস্টেম খুঁজছে রানা। কিছুক্ষণ পর জ্বলে উঠল কয়েকটা বাতি। চালু হলো চারটে কম্পিউটারের মনিটর। ব্রিজে আরও তিনটে লাশ, দু'জনের পরনে ইউটিলিটি ইউনিফর্ম। অন্য মেয়েটি পরেছে ককটেইল ড্রেস। বোধহয় মৃত অফিসারের আমন্ত্রণে দেখতে আসে ব্রিজ। ঠিক তখনই দাবানলের মত আঘাত হানে প্যাথোজেন। অন্য দুই ক্রু ছিল ডিউটিতে: ওয়াচ।

'কী মনে হয়?' ডক্টর ফারার কাজ শেষে জানতে চাইল রানা।

'এমন হতে পারে আক্রমণ করা হয় গ্যাস দিয়ে। তবে ডেকে বহু মানুষ মরেছে, সেই কারণে মনে হয়, ওটা নতুন কোনও ধরনের হেমোরেজিক অসুখ। অবশ্য আগে কখনও এমন কিছুর কথা শুনিনি।'

'সুপার ইবোলা ভাইরাসের মত?' জানতে চাইল সোহেল।

'তার চেয়ে অনেক দ্রুত, অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। এতো জনের মধ্যে একজনও বাঁচতে পারেনি। ইবোলার সবচেয়ে খারাপ প্রজাতি ছিল তিনটে, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে যেটা খারাপ সেটার কারণে এক শ' জনের মধ্যে মারা পড়ত নব্বুই জন। এ লোকের রক্ত যেভাবে ছিটকে বেরিয়েছে এবং রক্ত কালো হয়নি, তা-তে মনে হয় তার স্টমাক এবং ইন্টেস্টাইনে পৌঁছেনি ভাইরাস। একই কথা খাটে ওই মহিলার বেলাতেও। তবে, এখানে অন্য বিষয় আসে...' অফিসারের বাহু তুলে ধরল ফারা। ওটা নরম রাবারের মত, যেন থলথলে মরা সাপ। 'হাড়ের ক্যালসিয়াম এমন ভাবে ক্ষয় হয়েছে, যেন হাড় নেই। মনে হয় আঙুল দিয়ে চাপ দিলে ডেবে যাবে করোটি।' অফিসারের কপালে হাত রাখল ফারা।

'না দেখালেও চলবে,' বলল সোহেল।

'বলতে পারো, এসব কীসের আলামত?' জানতে চাইল রানা।

উঠে দাঁড়াল ফারা, ডিজ-ইনফেক্টিং তুলো দিয়ে পরিষ্কার করছে গ্লাভস্। 'ওটা যাই হোক, তৈরি করেছে মানুষ।'

'তুমি শিয়োর?'

'হ্যাঁ। শুধু এটুকু বলব, এ ভাইরাস বড় দ্রুত আক্রমণ করে। কিন্তু এমন কখনও করে না প্রকৃতি। এমন কী ইবোলাও কয়েক সপ্তাহ নেয় শিকারকে খুন করতে। ততদিনে তার পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীরা সুযোগ পায় আত্মরক্ষার জন্য সাবধান হবার। কিন্তু এ ভাইরাস কাউকে কোনও সুযোগ দেয়নি; কয়েক মিনিটের মধ্যেই খুন করেছে হোস্টকে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে কারও শরীরে বেড়ে উঠে একজনের থেকে

আরেকজনের মধ্যে সংক্রমণ ছড়ায়নি এ ভাইরাস, একসঙ্গে আক্রমণ করেছে সবাইকে।' শেষ কথা বলবার জন্য রানার চোখের উপর নিষ্পলক দৃষ্টি রাখল ফারা। 'কেউ একজন এ ভাইরাস তৈরি করেছে ল্যাবোরেটরিতে। ছেড়ে দিয়েছে এই জাহাজে।'

মুখের ভিতর তিক্ত অনুভূতি হলো রানার। মেনে নেয়া কঠিন: কারও ইচ্ছে হলো, ব্যস ছড়িয়ে দিল ভাইরাস! হয়তো দেখতে চেয়েছে কী ঘটে, কীভাবে ঘটে। ফলে মারা পড়েছে শত শত মানুষ। মনে মনে বলল রানা, যারা এ কাজ করেছে, তাদের ক্ষমা করা যায় না। ভয়ঙ্কর শাস্তি পাওয়া উচিত তাদের। এয়ারফোনে ভীষণ কঠোর শোনাল রানার কণ্ঠ, 'ফারা, যা খুঁজে বের করা দরকার, করো। এ কাজ যারা করেছে, এবার তাদের খুঁজে বের করব আমরা। নরপিশাচগুলোকে যত দ্রুত সম্ভব ঠেকাতে হবে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল ফারা।

ঘুরে দাঁড়াল রানা, দ্রুত হেঁটে বেরিয়ে এল ব্রিজ থেকে। সামনে হলওয়ে। ফাঁকা। লাশ নেই। নীচ তলায় একের পর এক কেবিন। কয়েকটা দরজা খুলল রানা। কেউ নেই। ব্রিজে যে মেয়েকে দেখেছে, আনুষ্ঠানিক পোশাক ছিল তার পরনে। জাহাজে চলছিল বড়সড় কোনও পার্টি। ইউএভি ও কপ্টার থেকে তা-ই মনে হয়েছে।

অফিসারদের কেবিন ঘুরে দেখল রানা। ওখান থেকে বেরিয়ে সামনে পড়ল সাদা রঙের এক দরজা। ওপাশে জাহাজের হোটেল সেকশন। আধুনিক প্রমোদ-তরীর এ অংশে প্রচুর পিতল ব্যবহার হয়েছে, মেঝের উপর পুরু কার্পেট। লাল ও সবুজ রঙের ছড়াছড়ি।

চারপাশ থমথম করছে। নিজের শ্বাসের শব্দ পেল রানা। সামনে পড়ল ব্যালকনি। ওখান থেকে চাইলে চারতলা নীচে এইট্রিয়াম। মেঝে সাদা মার্বেল দিয়ে মোড়া। কোনও বাতি নেই, বিশাল ফয়ে যেন কোনও প্রকাণ্ড গুহা। জানালাগুলোকে ঢেকেছে বুটিক পর্দা। ওখানে আলো ফেলল রানা। কী যেন নড়ে উঠল!

ধক্ করে উঠেছে বুক, ধীরে শ্বাস নিল রানা। এইট্রিয়াম জুড়ে লাশ, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করে মারা পড়েছে মানুষগুলো। স্টেয়ারকেসে একটা মৃতদেহ। যেন অপেক্ষা করছিল মৃত্যুদূতের জন্য। লাশ এড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল রানা। চলে এল ফয়ে-তে। একদিকে সিক্স-পিস অর্কেস্ট্রা। টুক্সেডো পরা পাঁচ বাদ্যযন্ত্রী হুমড়ি খেয়ে পড়েছে নিজ নিজ যন্ত্রের উপর। ষষ্ঠজন সরে যেতে চেয়েছিল। দশ ফুট এগুনোর সুযোগ দেয়নি ভাইরাস।

এই সব মানুষের জীবনে নিশ্চয়ই রয়েছে সুখ-দুখের হাজারো কাহিনি। এক দম্পতি পরস্পরকে জড়িয়ে শুয়ে পড়ে মেঝেতে। ওখানেই মারা গেছে। এক ওয়েট্রেস বার থেকে বেরিয়ে আসে, মৃত্যুর আগে ট্রে ভরা ড্রিঙ্ক নামিয়ে রাখে সাইড টেবিলে। দশজন তরুণী বড় কাছাকাছি, বোধহয় ছবি তুলছিল। তবে আশপাশে দেখা গেল না ফটোগ্রাফারকে। দামি ক্যামেরা টুকরো টুকরো হয়েছে মেঝের উপর। একদিকে এলিভেটরের কাঁচের দরজা বন্ধ। তার উপর রক্তের লাল দাগ।

লাশের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছে রানা। এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে পিস্তল। হ্যাজম্যাট সুট ও রিসাইকেল করা বাতাস ওকে রক্ষা করবে। কিন্তু মনকে রক্ষা করবে কে? এ ধরনের গণহত্যা মানুষের সুকোমল বৃত্তি ধ্বংস করে। যেদিকে তাকাচ্ছে, চারপাশে শুধু লাশ আর জমাট রক্ত দেখছে রানা। খুন চেপে

যাচ্ছে মাথায়।

'সবার কাজ কেমন চলছে?' কমিউনিকেশন নেটে বলল রানা। নিজের উপর একটু বিরক্ত। রিপোর্ট নেয়ার জন্য নয়, ও যেন মানুষের কণ্ঠ শুনতে চেয়েছে—জীবিত কারও!

'ফারা আর আমি জাহাজের হাসপাতালের দিকে চলেছি,' বলল সোহেল। জাহাজের বিপুল পরিমাণ লোহা বাধা দিচ্ছে রেডিও ওয়েভকে। কথা শোনা গেল ভাঙা ভাঙা ভাবে।

'আমি চলেছি ইঞ্জিন রুমের দিকে,' বলল রানা। 'যদি আধঘণ্টার ভিতর যোগাযোগ না করি, ফু-চুং যেন আসে।'

'বেশ।'

'ফু-চুং?'

'ব্যাকআপ পাওয়ার দিয়ে চলছে কম্পিউটার, নড়ছে না,' বলল চৈনিক গুপ্তচর। 'যা খুঁজছি, পেতে সময় লাগবে।'

'ঠিক আছে। ...মার্ভেল থেকে শুনতে পাও, আনিসি?'

'হ্যাঁ, বস্। স্ট্যাটিকের কারণে বোঝা কঠিন কোন্‌টা কার গলা।'

'স্কোপে নতুন কিছু?'

'না, বস্। আশপাশে শুধু আমরাই।'

'যদি কিছু ধরা পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে।'

'ঠিক আছে, বস্।'

রানার সামনে লেবেল দেয়া এক দরজা। লেখা: ক্রু ওনলি। দরজার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে ইলেকট্রনিক তালা দিয়ে। কিন্তু বিদ্যুৎ নেই, খুলে গেছে আপনাআপনি। ভিতর দিকে দরজা ঠেলল রানা, ঢুকে পড়ল করিডোরে। যাত্রীদের এলাকা ছিল বিলাসবহুল, কিন্তু এখানে কাঠের প্যানেলিং উধাও। ঝাড়বাতি বা নকশাদার ফিক্সচার নেই। দেয়াল সাদা, মেঝের উপর

প্লাস্টিকের টাইলস। ছাতে বাক্সের মত ফ্লুরেসেন্ট ফিক্সচার। দেয়ালের পাশে পাইপের রঙিন কণ্ডুইট। স্টুয়ার্ডদের কয়েকটা ছোট ঘর পেরুল রানা। সামনে পড়ল ক্রুদের বড়সড় ডাইনিং হল। এখানে রয়েছে ছ'জন ক্রু। টেবিলের উপর মাথা রেখেছে দু'জন, চারজন পড়েছে মেঝের উপর। মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়েছে রক্ত। মরেছে ভয়ানক কষ্ট পেয়ে।

একটা কিচেন পিছনে ফেলল রানা। ঘরটা ছিল কসাইখানার মত। এরপর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সাইজের লণ্ড্রি রুম। এখানে বিশটা ওয়াশিং মেশিন, একেকটা সিমেন্ট মিক্সারের মত প্রকাণ্ড। কাজ করছিল চিনা কর্মীরা।

হেঁটে চলেছে রানা, দুটো ঘর পেরুনোর পর সামনে পড়ল 'ইঞ্জিনিয়ারিং/নো আনঅথোরাইজড অ্যাডমিটেন্স' লেখা ভারী এক দরজা। ওটা পেরিয়ে সামনে ভেস্টিবিউল। শেষমাথায় দ্বিতীয় শব্দ নিরোধক হ্যাচ। ঝুঁকে ভিতরে ঢুকল রানা, তিন ধাপ নেমে গেল। এটা ইঞ্জিনরুমের অগ্‌জিলারি-রুম। আলো পড়ল একজোড়া জেনারেটরের উপর। পাশের র‍্যাকে কম্পিউটার কণ্ট্রোলগুলো। ঘরের শেষে ইঞ্জিনরুমে ঢুকবার স্লাইডিং দরজা। ভিতরে প্রকাণ্ড দুটো ইঞ্জিন, একেকটা কমার্শিয়াল ট্রাকের সমান। একটার উপর হাত রাখল রানা। মৃত্যুর মত শীতল ইস্পাত। অন্তত সাত-আট ঘণ্টা পাওয়ার বন্ধ, নইলে উষ্ণ থাকত ঘর। ইঞ্জিনের উপর এক্সযস্ট পাইপগুলো মিশেছে প্লেনাম ও ফানেলে। সব শেষে যুক্ত হয়েছে বিশাল চিমনির সঙ্গে।

কোনও জাহাজের ইঞ্জিন-রুমে ঢুকলে মনে হয়, এখানে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও সহিষ্ণুতা। তবে রানার মনে হলো, গোল্ড অভ মার্স সত্যিই মৃত। মেরুদণ্ড বেয়ে নামল শিরশিরে অনুভূতি। সোহেলকে রেডিও করল, তারপর ফু-চুংকে। শেষে মার্ভেলে।

কারও সাড়া নেই। ফিরছে শুধু স্ট্যাটিকের আওয়াজ। হাঁটবার গতি বাড়ল, টর্চের আলো পড়ছে ইকুইপমেন্টের উপর। কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। একটা ওয়াটারটাইট দরজা পেরুল। এখানে জাহাজের সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট। এ ঘর পেরুনোর পর সামনে আরও দুটো জেনারেটর ও ডিস্যালিনেটর। শেষ মেশিনটি রিভার্স অসমোসিস, ওটাও আর সব মেশিনের মত স্তব্ধ। ওটার কাজ লবণাক্ত পানি শোধন করা, যেন এক বিন্দু লবণ না থাকে খাওয়ার পানিতে। গ্যালি, লণ্ড্রি ও প্রতিটি বাথরুমে পৌঁছে দিত পরিষ্কার পানি। ভাইরাস ছড়ালে জাহাজের প্রতিটি মানুষ আক্রান্ত হবে, এমন দুটো জায়গার কথা জানে রানা। তার একটা এই ডিস্যালিনেটর। দ্বিতীয়টা জাহাজের এয়ার-কণ্ডিশনিং ইউনিট। ঠিক করেছে, পরে ভাইরাসের চিহ্ন খুঁজবে সেটার ভিতর।

ডিস্যালিনেটররের পিছনে দশ মিনিট ব্যয় করল রানা। কাছের এক ওঅর্কবেঞ্চ থেকে নিয়ে এসেছে টুলস কিট, প্রতিটি বল্টু খুলে পরীক্ষা করল পোর্টগুলো। উঁকি দিল ভিতর অংশে। মনে হলো না মেশিন নিয়ে জোরাজুরি চলেছে। মেইনটেন্যান্সের জন্য সম্প্রতি খোলা হয়নি। বল্টুগুলো আড়ষ্ট, গ্রিজের সঙ্গে ধুলো। এমন কিছু নেই, যা দেখে মনে হতে পারে এ জিনিস থাকবার কথা নয়। সিদ্ধান্ত নিতে হলোঃ এ প্লান্টের ভিতর রাখা হয়নি ভাইরাস।

প্লান্টের ভিতর থেকে মাথা বের করল রানা, ঠিক তখনই শুনতে পেল বিস্ফোরণের আওয়াজ। ইঞ্জিনরুমের সামনের দিক থেকে এসেছে। অথবা জাহাজের আরও অভ্যন্তরে। দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে আওয়াজ, কিন্তু পরক্ষণে আবারও ঘটল বিস্ফোরণ। এবার দুলতে শুরু করল গোটা জাহাজ। ঝট্ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল

রানা, যোগাযোগ করতে চাইল রেডিও নেটে। আবার ঘটল বিস্ফোরণ!

ডিস্যালিনেটর রেখে দৌড়াতে শুরু করল রানা, পৌঁছে গেল ঘরের মাঝ বরাবর। পিঠে গুঁতো দিয়েছে এক বাল্কহেড। তীব্র ব্যথায় ওখানে শুয়ে পড়তে বাধ্য হলো। জাহাজের ভিতর আবারও বিস্ফোরিত হয়েছে বোমা। রানা টের পেল, ইঞ্জিন-রুমের ভিতর দিয়ে বইছে ওভার প্রেশার ওয়েভ, যেন পিষে দেবে ওকে। ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল, ছুটতে শুরু করেছে। দশ গজ দূরে ছিটকে পড়েছে ফ্ল্যাশলাইট, ওটা খামচি দিয়ে তুলে নিল। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সাবধান করছে। চরকির মত ঘুরল, কী যেন নড়ছে। ইলেকট্রিসিটি নেই, কিন্তু নিখুঁত কাজ করছে জাহাজের ওয়াটার-টাইট দরজা। হ্যাচের পুরু ধাতব প্লেট নামছে!

আরেকটা আওয়াজ শুনে ঘুরল রানা। ফেটে যাওয়া ডেকের নীচ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে সাদা পানির জলোচ্ছ্বাস।

এদিকে দরজা বন্ধ হয়ে আসছে! পানি উঠছে ইঞ্জিন রুমের বিলজ এলাকা থেকে!

চতুর্থ বিস্ফোরণ থরথর করে কাঁপিয়ে দিল গোল্ড অভ মার্সকে!

পানি নিরোধক দরজার দিকে ছুটছে রানা। ভাবছে, নিখুঁত পরিকল্পনা করেছে কেউ! যাত্রী বা ক্রুদের চিহ্ন রাখবে না! ওর মন বলছে, যারা এ কাজ করেছে, ভবিষ্যতে তারা আরও অনেক গণহত্যা করবে পৃথিবী জুড়ে!

বিলজ থেকে হুড়মুড় করে আসছে পানি। এরইমধ্যে গোড়ালি ডুবে গেছে রানার। পাঁচ ফুট বাকি থাকতে প্রথম দরজা পেরুল ও। হ্যাজম্যাট সুটের কারণে দৌড়ানো কঠিন। পরবর্তী ঘরে ঢুকে পড়ল, একবারও চাইল না সিউয়েজ প্লান্টের দিকে।

পানি ছলকে দিয়ে ছুটছে। শ্বাস ফেলছে ফোঁস-ফোঁস, কানের ভিতর বদ্ধ অনুভূতি। এখনও ঠিকঠাক কাজ করছে সুটের ফিল্টার।

পরের দরজা অনেক নেমে এসেছে। পুরো আটকে যেতে দুই ফুট বাকি! উড়ে চলেছে রানা, শেষ পাঁচ ফুট ভেসে গেল ডাইভ দিয়ে। ফেসপ্লেটে লাগছে সাগরের স্রোত। হেলমেটের উপর দিক লাগল দরজার নীচের অংশে। আছড়ে-পাছড়ে ঢুকল রানা। খেয়াল করেছে, ছেঁড়েনি সুট। ইস্পাতের দরজা নামছে! বিড়ালের মত গুড়ি মেরে এগুতে চাইছে রানা। পেরিয়ে গেল বুক, কোমর, এবার হাঁটু! যেন জুয়া খেলছে, ক্রল করে এগুতে চাইছে। আর মাত্র এক ফুট!

কিন্তু দু'সেকেণ্ড পরই ধাতব আওয়াজ উঠল! ধুপ করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা! এ ইস্পাতের প্লেটের ওজন কম করে হলেও এক টন!

ব্যথা কই? বুঝতে চাইল রানা। নেই তো! বাম হাতে ভর দিয়ে পায়ের দিকে চাইল। দরজা নেমে এসেছে ওর ডান বুটের হিলের উপর! পা টেনে ছাড়াতে চাইল। সম্ভব হলো না। বুট খুলবে সে-উপায়ও নেই। জিনিসটা সুটের সঙ্গে সেলাই করা।

ডেকে চওড়া ফাটল, হুড়-হুড় করে উঠছে পানি! আটকা পড়েছে ও পরিত্যক্ত ইঞ্জিনরুমে! কমিউনিকেশন নেটে সোহেল-গগল-ফু-চুঙের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল। জবাব নেই। কানে আসছে শুধু স্ট্যাটিকের খড় খড় আওয়াজ!

নয়

আতাসি হায়-হায় করে উঠতেই মাথা দোলাল গগল। সবাই শুনতে পেয়েছে গোল্ড অভ মার্স জাহাজের ভিতর থেকে আসা বিস্ফোরণের আওয়াজ। মনিটরের দিকে চেয়ে রইল ওরা। প্রমোদ-তরীর খোলের ভিতর একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটছে। ছিটকে সরে আসছে পানির সাদা ফেনা। দেখে মনে হয় জাহাজে ঢুকছে টর্পেডো। কিন্তু তা অসম্ভব। রেইডার স্কোপ পরিষ্কার, আশপাশে কোনও জাহাজ নেই। টর্পেডো থাকলে সেটাও জানিয়ে দিত সোনার ডিসপ্লে।

ধোঁয়া সরে যেতেই ওদিকে লো-লাইট ক্যামেরা তাক করল গগল। ক্ষতিগ্রস্ত অংশ দেখিয়ে চলেছে। জাহাজের খোলে যে গর্ত তৈরি হয়েছে, তা দিয়ে অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারবে একজন মানুষ। হুড়োহুড়ি করে ঢুকছে সাগরের পানি। গোল্ড অভ মার্সের ওয়াটার লাইনে তৈরি হয়েছে চারটে গহ্বর। ওখানে পানির নীচে ডুবছে কমপার্টমেন্টগুলো। জাহাজ রক্ষা করবার উপায় নেই। হয়তো জাহাজ ভাসত, যদি চালু থাকত বিলজ পাম্পগুলো। গগল, অনিল ও উর্বশী জানে, এক ঘণ্টা পেরুনোর আগেই চোখের সামনে তলিয়ে যাবে জাহাজটা।

কমিউনিকেশন কন্সোলে টোকা দিল গগল। 'সিরাজ, আপনি এখুনি হেলিকপ্টার নিয়ে রওনা হোন। নিশ্চয়ই শুনেছেন, এইমাত্র

বোমা ফেটেছে গোল্ড অভ মার্সে। সবাইকে সরিয়ে আনতে হবে ওখান থেকে।'

'ঠিক আছে,' জবাব দিলেন সিরাজ। 'সেক্ষেত্রে আমি ওই জাহাজে নামছি?'

'নেগেটিভ। সেটা চাইছি না। ওখানে ভেসে থাকুন। পরবর্তী নির্দেশ জানিয়ে দেব।' চ্যানেল বদলে নিল গগল। 'মার্ভেল থেকে রানা। তোমাদের অবস্থান জানাও।' অপারেশন্স সেণ্টার ভরে উঠল স্ট্যাটিকের আওয়াজে। ট্র্যান্সিভার ফাইন-টিউন করল আতাসি। খুঁজছে রানার সিগনাল। এক মিনিট পর হতাশ চোখে চাইল সবার দিকে। আবারও জানতে চাইল গগল, 'ডক্টর ফারা, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? ফু-চুং? সোহেল?'

'আমি এখানে,' লাউডস্পিকারের আওয়াজে ভরে উঠল ঘর। এ কণ্ঠ লিউ ফু-চুঙের। এখন ও গোল্ড অভ মার্সের হুইলহাউসে, ফলে পাওয়া গেছে ভাল রিসেপশন। 'এইমাত্র কী ঘটল, গগল? মনে হলো বিস্ফোরণ?'

'তা-ই,' বলল গগল। 'কেউ একজন আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল। ডুবে যাচ্ছে জাহাজ।'

'আমি মাত্র ডাউনলোড শুরু করেছি।'

'যা পেয়েছেন তা নিয়ে তৈরি থাকুন। কপ্টার নিয়ে রওনা হচ্ছেন সিরাজ। আপনাদের সরে আসতে হবে।'

'রানা-সোহেল-ফারা, ওদের কী হবে?' জানতে চাইল ফু-চুং।

'ওদের সঙ্গে রেডিওর মাধ্যমে কথা বলতে পারছেন?'

'না। বিশ মিনিট আগে নীরব হয়েছে রানার রেডিও। শেষবার বলেছে, ইঞ্জিন রুমের দিকে চলেছে।'

বিড়বিড় করে কপালকে অভিশাপ দিল গগল। যে-কোনও

জাহাজের ইঞ্জিন-রুমে বিস্ফোরণ মানে ভয়ঙ্কর বিপদ। 'সোহেল আর ফারা? ওদের কী অবস্থা?'

'পনেরো মিনিট আগে বিচ্ছিন্ন হয়েছে রেডিও যোগাযোগ।'

মনিটরের দিকে চাইল গগল। দ্রুত তলিয়ে যাচ্ছে গোল্ড অভ মার্স। নীচের পোর্টহোলগুলো সাগর সমতল থেকে মাত্র তিনফুট উপরে। স্টারবোর্ডে কাত হয়ে যাচ্ছে জাহাজ। এক সেকেণ্ড দ্বিধা করল গগল। এখন যদি ফু-চুংকে বলে, খুঁজে বের করো রানা, সোহেল ও ফারাকে? সম্ভাবনা খুবই বেশি জাহাজের ভিতর আটকা পড়বে সে-ও। এখন পর্যন্ত ভারসাম্য বজায় রেখে ডুবছে জাহাজ, কিন্তু যে-কোনও সময়ে কাত হয়ে তলিয়ে যেতে পারে। একবার অনিলের দিকে চাইল গগল। পরক্ষণে উর্বশীর দিকে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল—যারা জাহাজের ভিতর, তাদের বেরিয়ে আসতে হবে নিজেদের বুদ্ধিতে।

'ফু-চুং, যত দ্রুত সম্ভব কপ্টারে উঠে পড়ুন। ওখান থেকে নজর রাখুন। কেউ আপার ডেকে উঠে এলে, পৌঁছে দেবেন মার্ভেলে।'

'ঠিক আছে, তবে পরিস্থিতি ভাল লাগছে না আমার।'

'আমি জানি, বিপদ থেকে বেরিয়ে আসবে ওরা,' নিচু স্বরে বলল অনিল।

আস্তে করে মাথা দোলাল উর্বশী।

এক পলক জাহাজের স্কিম্যাটিক দেখল সোহেল, তারপর ফারাকে সঙ্গে নিয়ে চলল হাসপাতাল লক্ষ্য করে। জাহাজের খুদে হাসপাতাল প্রধান ডেক থেকে নীচে, সি-সি লেভেলে। যাওয়ার পথে সোহেলের সাহায্য নিল ফারা, ভিক্টিমদের কাছ থেকে সংগ্রহ করল রক্ত ও টিশ্যুর স্যাম্পল।

'তুমি ডাক্তার বা নার্স নও, তবে ভাল এইড,' প্রথম লাশের পাশে বসবার সময় বলেছে ফারা।

'আমাকে আফগানিস্তানে প্রচুর অভিজ্ঞতা দিয়েছে আমেরিকান সেনাবাহিনী,' স্বাভাবিক স্বরে বলল সোহেল। 'এরপর কিছুতেই খুব একটা চমকে উঠি না।'

'জানি, প্রায় মেরেই ফেলেছিল,' কাজের ফাঁকে বলেছে ফারা।

ওরা দু'জন বুঝে গেছে করিডোর ধরে এগুলে সামনে পড়বে একের পর এক লাশ। ভাইরাস সংক্রমণ হতেই সবাই ছুটে আসতে শুরু করে হাসপাতালের দিকে। একটা লাশের কাছ থেকে স্যাম্পল ও রক্ত নিল ফারা। ভাবছে, একটু আগে যে লাশ দেখেছে, সেগুলোর থেকে পরে মারা গেছে এগুলো। অন্তত কয়েক মিনিট বাড়তি সময় পেয়েছে ভাইরাসের কাছ থেকে। কিন্তু কেন? এটা হয়তো জরুরি কোনও তথ্য। হয়তো এ থেকে বেরিয়ে আসবে কীভাবে সংক্রমণ ছড়ায় প্যাথোজেন।

তবে আশা ছেড়ে দিয়েছে ফারা, ওর মন বলছে, কেউ বেঁচে নেই জাহাজে।

ওরা হাসপাতালের কাছে পৌঁছে দেখল দরজা খোলা। চৌকাঠের উপর পড়ে রয়েছে টুক্সেডো পরা এক লাশ। ওটাকে টপকে ঢুকে পড়ল ওরা। সামনে জানালাহীন অ্যান্টিচেম্বার। টর্চের আলোয় চোখে পড়ল দুটো ডেস্ক ও স্টোরেজ কেবিনেট। দেয়ালে ঝুলছে ট্র্যাভেল পোস্টার। একটা পোস্টারে লেখা: *প্রতিটি মানুষের উচিত নিয়মিত হাত ধোয়া।* প্রতিটি পদক্ষেপ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। একটা প্লাকে ডক্টর ম্যাক্স কেইনের মেডিকেল ডিগ্রি। ইউনিভার্সিটি অভ লিডস থেকে পাওয়া।

পাশেই পরীক্ষা ঘর, ওখানে কেউ নেই। অফিসের আরেক

প্রান্তে একটা দরজা। ওদিকে রয়েছে রোগীদের ঘর। ঘর বলা উচিত নয়, ওগুলো পর্দা দিয়ে ঘেরা খুপরি। প্রতিটির ভিতর একটা করে বিছানা ও নাইটস্ট্যাণ্ড। সামনে মেঝের উপর আরও দুটো লাশ। কালো পোশাক পরা এক কমবয়সী মেয়ে। অন্য লোকটি মাঝবয়সী, পরনে বাথরোব। আর সবার মতই, রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছে মেঝে।

'তোমার কি মনে হয় উনি ডাক্তার ছিলেন?' বলল সোহেল।

'তা-ই মনে হয়। উনি বোধহয় শুয়ে ছিলেন, ভাইরাসের আক্রমণ হতেই ছুটে আসেন এখানে।'

'কিন্তু কিছু করার ছিল না তাঁর।'

'ওই ভাইরাসের বিরুদ্ধে কেই বা কী করবে,' গ্রীবা বাঁকাল ফারা। 'ওই আওয়াজটা শুনেছ?'

'এ সুট পরলে নিজের শ্বাস ছাড়া কিছুই শোনা যায় না।'

'মনে হলো ধুপ করে পড়ল কিছু,' সামনের কিউবিকলের পর্দা সরাল ফারা। ফাঁকা বিছানা, চাদর মসৃণ।

পরের কিউবিকলে চলে এল ফারা। এটার বিছানার পাশে ব্যাটারিচালিত অক্সিজেন মেশিন। শ্বাসের সমস্যা রয়েছে এমন রোগী এ জিনিস ব্যবহার করে। স্বচ্ছ প্লাস্টিকের টিউব চলে গেছে চাদরের নীচে। বিছানার উপর আলো ফেলল ফারা। কেউ একজন পা থেকে মাথা পর্যন্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে আছে। নড়ছে না।

দ্রুত পায়ে বিছানার পাশে চলে গেল ফারা। 'আমরা বোধহয় কাউকে জীবিত পেলাম!'

কম্বল গুটিয়ে সরিয়ে দিল ও। কমবয়সী এক মেয়ে গভীর ভাবে ঘুমিয়ে। এয়ার টিউব চলে গেছে নাকের ভিতর। বালিশের উপর ছড়িয়ে রয়েছে কালো চুলগুলো। বড় ফ্যাকাসে লাগছে

মেয়েটার মুখ। হালকা শরীর, দেহে বাড়তি মেদ নেই। টি-শার্টের তলা দিয়ে চোখে পড়ল কাঁধের হাড়। মেয়েটি ঘুমিয়ে, তবে আন্দাজ করল ফারা, এর উপর দিয়ে মারাত্মক মানসিক অত্যাচার গেছে।

হঠাৎ চোখ মেলল মেয়েটি, পিটপিট করে চাইল। পরক্ষণে চেঁচিয়ে উঠল ভীষণ ভয়ে। দুটো আকৃতি দেখছে সে, এরা বোধহয় ভিনগ্রহের কিছু! বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে আছে ওর দিকে!

'ভয় নেই,' বলল ফারা। 'আমি একজন ডাক্তার। তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।'

অস্পষ্ট স্বর শান্ত করল না তাকে। নীল দুই চোখে তীব্র ভয়। উঠে বসে পিছিয়ে যেতে চাইল। দু'হাতে জাপ্টে ধরেছে কম্বল। নিজেকে ঢেকে ফেলবে।

'আমার নাম ফারা রাইনার। উনি সোহেল আহমেদ। আমরা তোমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব। ...তোমার নাম কী?'

'ক্ব-কে আপনারা?'

'আমি এসেছি আরেকটা জাহাজ থেকে। ডাক্তার। বলতে পারো এখানে কী ঘটেছে?'

'গতকাল রাতে, এখানে একটা পার্টি ছিল।'

মেয়েটা আর কিছু বলছে না। নিশ্চয়ই শকের ভিতর, ভাবল ফারা। সোহেলের দিকে চাইল। 'একটা হ্যাজম্যাট সুট খোলো। আগেই থামাতে চাই না অক্সিজেনের সাপ্লিমেন্ট। সুটের ভিতর না যাওয়া পর্যন্ত যে-কোনও কিছু ঘটতে পারে।'

হ্যাজম্যাট সুট খুলছে সোহেল, ছিঁড়ে ফেলল প্লাস্টিকের মোড়ক।

'আমার মনে হয় বেঁচে গেছে শুধু ওই অক্সিজেনের কারণে,' বলল ফারা। 'ভাইরাসটা ছিল বাতাসে। ও সাধারণ বাতাস নেয়নি, পেয়েছে হাসপাতালের ওএইচ সিস্টেমের অক্সিজেন। ট্যাঙ্ক যখন শেষ হয়েছে, বাতাস ব্যবহার করেছে পোর্টেবল ইউনিট থেকে।' তরুণীর দিকে চাইল ফারা। বড়জোর ওর বয়স বিশ বছর। পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে আসে, অথবা ক্রুদের কেউ হতে পারে। 'আমাকে বলবে তোমার নাম?'

'হেলেন। হেলেন জিল। বন্ধুরা ডাকত হেলেনা।'

'আমি কি তোমাকে হেলেনা বলতে পারি?' মেয়েটির পাশে বসল ফারা, ফ্ল্যাশলাইট তাক করেছে নিজ সুটের ফেসপ্লেটের উপর। এবার ভয় কমবে হেলেন জিলের। 'দেখলে তো আমি একটা মেয়ে? গুড। আমার নাম ফারা।'

'কোন দেশের মানুষ তুমি?'

'হল্যাণ্ডের।' আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল ফারা। ঘর ভরে উঠেছে ভারী কাঁসার ধাতব শব্দে। 'ওটা কী, সোহেল?'

ওটা যে বিস্ফোরণের আওয়াজ, বলবার সুযোগ পেল না সোহেল। তার আগেই দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ঘটল। জাহাজের ভিতর ঘুরছে আওয়াজ। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল হেলেন, কম্বল দিয়ে ঝট্ করে ঢেকে ফেলেছে মাথা।

'আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে,' বলল সোহেল। 'জলদি!'

আরও দুটো বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। থরথর করে কাঁপতে লাগল জাহাজ। দ্বিতীয়টা ডেটোনেট হয়েছে ওয়ার্ড থেকে খানিক দূরে। পিছলে ধুপ করে মেঝের উপর পড়ল সোহেল। হেলেনকে নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে ফেলল ফারা। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করছে মেয়েটি। ছাত থেকে ফিক্সচার সহ খসে পড়ল ফ্লুরেসেণ্ট বালব, ঝনঝন করে ভাঙল।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সোহেল 'ফারা, তুমি ওর সঙ্গে থাকো।' এক ছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ও।

'হেলেনা, কিছু হয়নি,' বলল ফারা। 'তোমাকে বের করে নিয়ে যাব আমরা।'

মুখের উপর থেকে কম্বল সরাল হেলেন, দু'গাল বেয়ে নামছে অশ্রু। থরথর করে কাঁপছে নীচের ঠোঁট। 'জাহাজে ক্-কী হয়েছে?'

'আমার বন্ধু দেখতে গেছে। এবার এটা পরে নাও।' হ্যাজম্যাট সুট বাড়িয়ে দিল ফারা। 'আমরা খুব সাবধানে সুট পরব, ঠিক আছে?'

'আমি কি অসুস্থ?'

'মনে হয় না,' বলল ফারা। কিছু টেস্ট না করা পর্যন্ত বোঝা যাবে না কী হয়েছে, তবে সেটা বলল না ও।

'আমার হাঁপানি আছে,' বলল হেলেন। 'সেজন্য হাসপাতালে ছিলাম। এমন বাজে অ্যাটাক শুরু হলো, ডাক্তার সামলে রাখতে পারলেন না।'

'এখন অ্যাটাক কেটে গেছে?'

'তাই তো মনে হয়। অনেকক্ষণ হলো ইনহেলার নিইনি...' মিলিয়ে গেল হেলেনের কণ্ঠ।

'তবে অক্সিজেন নিয়েছ, তা-ই না?'

'হ্যাঁ। তখন দেখলাম ডক্টর পাসম্যানের কী হলো। তারপর আমার বান্ধবীর। আমার মনে হয় বাতাসে কিছু ছিল। তাই অক্সিজেন বন্ধ করিনি।'

'সাহসী মেয়ে। তুমি বুদ্ধিমতী। নিজের জীবন রক্ষা করেছ।'

নিজের বিরাট কোনও উপকার করেছে ভেবে খানিক সাহস

ফিরল হেলেনের। মনে ভরসা এল, এ অভিশপ্ত জাহাজ ছেড়ে চলে যেতে পারবে।

দ্রুত পায়ে ঘরে এসে ঢুকল সোহেল। 'বোমা বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত হয়েছে হলওয়ে। বিশ গজ গেলেই আর এগুনো যায় না। যে-পথে এসেছি, সে-পথে যাওয়া চলবে না।'

'অন্য কোনও পথ?'

'আশা করি থাকবে। একটু আগে বুঝলাম জাহাজের নীচের অংশ তলিয়ে যাচ্ছে।'

রানার বুটের হিলকে চেপ্টে দিয়েছে ইস্পাতের দরজা। সামান্য ফাঁক দিয়ে ঢুকছে পানি। এতে ডুববে না ইঞ্জিন-রুম। অন্তত ডুববার কথা নয়। কিন্তু ঘরের ডেক ফেটে যাওয়ায় গেইযারের মত উঠছে পানির স্তম্ভ। দেখতে না দেখতে ঘরে খেলতে লাগল স্রোত। ঠিক ভাবে অক্সিজেন সাপ্লাই দিচ্ছে হ্যাজম্যাট সুট, নইলে ডুবেই মরতে হতো। দশ সেকেণ্ড হলো হাঁটু গেড়ে বসেছে। ডান বুট ছাড়িয়ে নিতে চাইছে, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। ভাবছে, শেষকালে হয়তো বুট কেটেই নিজেকে মুক্ত করতে হতে পারে! তা হলে কি আক্রান্ত হবে ও মরণ ভাইরাসে? ঘরে এখন হাঁটু পানি। প্রতি সেকেণ্ডে বাড়ছে পানির গভীরতা।

হ্যাঁচকা টানে দরজার তলা থেকে বুট খুলে নিতে চাইছে রানা। তারই ফাঁকে ভাবল, ভাগ্যিস জাহাজের এত গভীরে আসেনি সোহেল, ফারা বা ফু-চুং। সহজে বেরুতে পারবে ওরা।

ইঞ্জিন-রুমে ঢুকে কোনও ভাইরাসের চিহ্ন দেখেনি রানা। বুঝবার উপায় ছিল না এখানে কিছু ঘটেছে। যখন ইঞ্জিন চালু ছিল, ওটা চলেছে অটোমেটেড মোডে। ব্রিজে দরকার পড়েছে মাত্র দু'জন লোককে। পাওয়ার প্লাণ্টগুলো মনিটর করেনি কেউ।

এখানে কেউ মারাও পড়েনি। সেক্ষেত্রে এ ঘরের বাতাসে কতক্ষণ থাকবে প্যাথোজেন? হয়তো নতুন ওই ভাইরাসের ব্যাপারে বলতে পারত ফারা।

রানার কাঁধ ডুবিয়ে দিল পানি। বসে আছে, ডানহাতে ঝটকা দিয়ে ছাড়াতে চাইছে বুট। হচ্ছে না। এভাবে বেকায়দায় বসে জোর পাওয়াও কঠিন। টানাটানির ফাঁকে ভাবছে, অনেক আগে থেমেছে এয়ার কণ্ডিশনার। মেঝের উপর নেমে এসেছে ধূলিকণা এবং মাইক্রোবগুলো। যথেষ্ট সময় কি কেটেছে? বোধহয়!

আবার ভাবল, ভাইরাসকে অত ভয় পাওয়ার কী আছে জুতো না কেটে উপায় নেই, হ্যাজম্যাট সুট চিরকাল তো আর অক্সিজেন সাপ্লাই দেবে না। কাজেই বুটটা কেটে ফেলে বাঁচার চেষ্টা করে দেখাই উচিত। ভাইরাস যদি ঢোকে ঢুকবে! আর কতক্ষণ, একটু পরেই হাল ছেড়ে দিতে হবে।

শেষ বারের মত নতুন উদ্যমে বুট ছাড়িয়ে নিতে চাইল রানা। ডান কবজি থেকে যেন খসে পড়বে গ্লাভস্। প্রচণ্ড টান খেয়ে ছিঁড়ছে বুটের হিল। এবার ডুবে গেল ওর মাথা। এক সেকেণ্ড থামল রানা, তারপর ডান কাঁধের উপর নিয়ে গেল বামহাত। ডায়াল পেয়েই ঘুরিয়ে দিল। সুটের ভিতর বাড়ছে এয়ারফ্লো। বাতাসের চাপে বেলুন হয়ে উঠতে চাইল সুট। ফুলে উঠছে সেলাইয়ের জায়গা। কোমরের থলের ভিতর লাইটার, কম্পাস ও ফোল্ডিং ছুরি। শেষেরটা বের করে নিল রানা, খুলে ফেলল ফলা। উল্টো হয়ে বসবার উপায় নেই। ডানহাতে ছুরি নিল, কাটতে চাইল হিল ও সোলের মাঝখানের অংশ। সোল থেকে সরিয়ে রাখতে চাইল পা। বুটের উপর দ্রুত চলছে হাত। আগে কেটে ফেলতে হবে বুট।

ছুরির পোচ পড়ছে সোল ও হিলের মাঝে। পায়ে তীক্ষ্ণ ব্যথা

লাগতেই ভুরু কুঁচকে উঠল। ইস্পাতের ফলা খোঁচা দিয়েছে পায়ে। কাজের ফাঁকে চারপাশ দেখতে চাইল রানা। পানির নীচে সব নীল। একটু দূরে জ্বলছিল ফ্ল্যাশলাইট। ওটা হঠাৎ নিভে গেল। চারপাশ গাঢ় অন্ধকার! শান্ত ভঙ্গিতে ছুরি চালিয়ে চলেছে রানা। ভীষণ শক্ত প্লাস্টিকের বুট। এই একই জিনিস দিয়ে তৈরি সুট। জুতো ছাড়ছে না হিলটা। ইতিমধ্যে দু'মিনিট পেরিয়ে গেছে। একটানা পরিশ্রম করে চলেছে। ভাবছে, দম আটকে মরতে হবে নাকি শেষে? মাথার ভিতর ঝনঝন বাজছে বেসুরো বাদ্যযন্ত্র। বাম পায়ের জোরে উঠতে চাইল রানা। পারল, তবে এক পায়ে নাচতে হলো বেতালা ছন্দে, দু'হাত দু'দিকে ছড়ানো। কাঁধ দিয়ে হেলান দিল দরজার উপর। সুটের ভিতর বাতাসের জোর প্রেশার।

পানির নীচে ঝপ্ করে বসে পড়ল রানা, ডানহাতের জোরে টান দিল বুটজুতো। খানিকটা যেন ছিঁড়েও গেল হিল। তবে জুতো খসে আসেনি। নিজেকে শান্ত করতে চাইল রানা। বুটের পাশে কী যেন! ও, ছুরি। আবার হাতে নিল ওটা রানা। খুব ধীরে কাটছে ছুরি। ওটা ফেলে আবার গায়ের জোরে বুট ধরে টান দিল রানা।

দরজার নীচে ছিঁড়ে রয়ে গেল হিল। হুমড়ি খেয়ে পাশে পড়ল রানা। পরক্ষণে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ইঞ্জিন-রুমে জমেছে বুক-পানি। ভাইরাসের কথা মনে রেখেছে রানা। ফুসফুসে সামান্য বাতাস টেনে নিল। ওটুকু চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দিল ঝাপসা আকৃতিগুলোকে। ফাটা মেঝের নীচ থেকে উঠছে পানি। ঢেউ ও স্রোত দুলিয়ে দিতে চাইছে দেহ।

ঘরের ভিতর ঘুটঘুটে আঁধার। একটু এগুতেই হোঁচট খেল। পাশেই ওঅর্কবেঞ্চ। ওটা পেরিয়ে একটা উঁচু কেবিনেট। ওখানে

হেলান দিল রানা, বাঁধতে শুরু করল ছেঁড়া সুট। বুটের ভিতর রাখল না ডান পা, ভরে ফেলেছে প্যাণ্টে। কষে গিঁঠ দিল গোড়ালির একটু আগে। তার নীচে ঝুলছে ছেঁড়া বুট। ডায়াল করে কমিয়ে আনল এয়ারফ্লো। গিঁঠ দেয়ায় বাতাস বেরুনো বন্ধ হয়েছে, ফুলে উঠল সুট। রানার ধারণা, হিল ও সোলহীন বুটের ভিতর থেকে বেরিয়েছে সামান্য বাতাস। তখন এক্সপোজ্‌ড ছিল ও। তবে সুটের ভিতর রয়েছে পজিটিভ প্রেশার। ঢুকবার কথা নয় ভাইরাস।

পরক্ষণে রানার মনে পড়ল, ও রয়েছে ডুবন্ত জাহাজে। বদ্ধ ইঞ্জিন-রুমে। এখান থেকে বেরুনোর পথ? দলের সঙ্গে কথা বলবে, বা মার্ভেলের সঙ্গে যোগাযোগ? অসম্ভব!

খোঁড়া মানুষের মত বেকায়দা ভঙ্গিতে হাঁটতে হবে, ক'পা এগিয়ে বুঝল কাজটা প্রায় অসম্ভব। অন্ধের মত দু'হাত ছড়িয়ে দিয়েছে দু'দিক। মনে করতে চাইল ঘরের কোথায় কী আছে। খুব ধীরে চলেছে। আরেকটা কেবিনেট পেল। ওখানে থামল। একে একে ড্রয়ার খুলছে। টুলসগুলো কী থাকতে পারে আন্দাজ করতে চাইছে। দু'মিনিট পর বুঝল, যা চেয়েছে তা পেয়েছে।

রানা যেটা হারিয়েছে সে তুলনায় অনেক কম উজ্জ্বল এই ফ্ল্যাশলাইট, তবে কাজ চলবে। বুক পানির ভিতর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলল। পেরিয়ে গেল দুই প্রকাণ্ড ইঞ্জিন। থামল গিয়ে ওয়াটারটাইট দরজার সামনে। পুরোপুরি বন্ধ। ওখানে ডুব দিল, দু'পাশে খুঁজতে চাইল ম্যানুয়াল রিলিজ। লিভার পেলেই খুলবে দরজা। কিন্তু তেমন কোনও মেকানিজম নেই!

মেরুদণ্ড বেয়ে নামছে শিরশিরে অনুভূতি, রানা টের পেল মনের ভিতর গেড়ে বসতে চাইছে আতঙ্ক। মন বলছে, তুই কি জানিস কী ক্ষতি হয়েছে জাহাজের? একটু পর তলিয়ে যাবে!

রানা বাড়তে দিল না চিন্তাটাকে, চোখ রাঙাল নিজেকে। যুক্তি বলছে. স্থির ভাবে ভাসছে জাহাজ। তলিয়ে যেতে কমপক্ষে এক ঘণ্টা। তবে স্বস্তি পাওয়ার কারণ নেই। হয়তো পনেরো মিনিট পেরুনোর আগেই তলিয়ে যাবে ইঞ্জিন-রুম। তার আগে বেরুতে হবে।

কথাটা মাত্র ভেবেছে রানা, শুনতে পেল নিচু আওয়াজ। গোঙাচ্ছে জাহাজ। খোলের ভিতর ছড়িয়ে পড়ছে কাতর ধ্বনি। প্রচণ্ড চাপ পড়ছে জোড়াগুলোর উপর। একটু টলে উঠল রানা। বো'র দিকে হোঁচট খেল গোল্ড অভ মার্স। ইঞ্জিন-রুমের পিছন থেকে এল প্রকাণ্ড ঢেউ। ওটার চাপে আছড়ে পড়তে হবে বাল্কহেডে, দ্রুত পাশের টেবিলে উঠে পড়ল রানা। হাঁটু ধরে টান দিল ঢেউ। তবে সামলে নিতে পারল। অস্থির হয়ে উঠছে পানি। ইঞ্জিন-রুমের ডানদিকে আলো ফেলল। আগের চেয়ে অনেক দ্রুত ভরে উঠছে ঘর। আরও বিস্তৃত হয়েছে ফাটলগুলো। যেন নতুন শিকারকে গ্রাস করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে সাগর!

চারপাশে আলো ফেলল রানা, খুঁজতে চাইছে বেরিয়ে যাওয়ার পথ। তেমন কিছু নেই। দু'দিকের দরজা বন্ধ। হঠাৎ একটা চিন্তা ভর করল মাথায়। আলো ফেলল বিশাল ইঞ্জিনগুলোর উপর। ওখান থেকে উঠেছে ডাক্ট। ওটার ভিতর আলো ফেলল। এক সেকেণ্ড পর বলে উঠল রানা, 'তা-ই তো!'

হেলেনের দিকে ফিরল ফারা, চেষ্টা করে শান্ত রাখল কণ্ঠ. 'হেলেনা, লক্ষ্মী মেয়ে, আমরা তোমাকে বের করে নিয়ে যাব। কিন্তু তার আগে প্রোটেকটিভ সুট পরতে হবে। ঠিক যেমনটা পরেছি আমরা।'

'জাহাজ কি ডুবছে?' কাঁপা স্বরে জানতে চাইল হেলেন।

'হ্যাঁ, হেলেনা। আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে।' সুটের ব্যাটারিচালিত ফ্যান ও স্ক্র্যাবারগুলো চালু করল ফারা। টেনে খুলে ফেলল সুটের পিঠের চেইন। হেলেনকে বলেনি এ সুট ওর নিরাপত্তার জন্য নয়, বরং মার্ভেলের ক্রুদের নিরাপদ রাখতে। হতে পারে হেলেন ভাইরাসে আক্রান্ত। ওর নাকের টিউব ছাড়িয়ে দিল না ফারা, হাতের ইশারা করল। হ্যাজম্যাট সুটের ভিতর পা ভরল হেলেন। এরপর পুরো দেহ। হেলেনের দীর্ঘ চুল হেলমেটের ভিতর ভরল ফারা, নির্দেশ দিল, 'এবার নাক দিয়ে বড় করে শ্বাস নাও, যতক্ষণ পারো আটকে রাখো।'

ফুসফুস ভরে দম নিল হেলেন, ফুলে উঠল বুক। ওর কানের পিছন থেকে ক্যানিউলার ক্লিপ সরিয়ে নিল ফারা, নাক থেকে খুলল টিউব। এবার সুটের উপরের অংশ দুটো ধরল, ব্যস্ত হাতে চেইন টেনে দিল। এক মিনিট লাগল ডাক্ট টেপ দিয়ে জোড়া জায়গা আটকে দিতে।

মনে মনে সোহেলের প্রশংসা করছে ফারা। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া খুব জরুরি, কিন্তু একটু অধৈর্য হয়নি মানুষটা। কী করে যেন বুঝেছে ভীষণ ভয়ের ভিতর দিয়ে চলেছে হেলেন জিল। এখন ওকে বাচ্চাদের মত আদর দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে। আনমনে কাঁধ ঝাঁকাল ফারা। সত্যি কম সয়নি হেলেন, লাশ ভরা জাহাজে কাটিয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা! এক মুহূর্তের জন্য অন্য একটা চিন্তা এল। সত্যি, বাবা হিসাবে খুব ভাল হবে সোহেল! পরমুহূর্তে লজ্জা পেল ফারা।

বাইরে থেকে আসবার আগে চাদর দিয়ে লাশ তিনটে ঢেকে দিয়েছে সোহেল। কিউবিকল থেকে বেরিয়ে এল ওরা। চাদর মোড়া লাশের দিকে চাইল হেলেন। টের পেল ফারা, ওর হাতের ভিতর আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে মেয়েটির হাত। পথ দেখিয়ে চলেছে

ফারা, অন্য হাতে স্যাম্পল কেস। মনে মনে বলল, সাহস আছে এ মেয়ের। চারপাশে এত রক্ত, জ্ঞান হারাত অনেকে!

চলে এল ওরা হলওয়েতে। 'ওদিকের পথ বন্ধ,' যেদিক থেকে এসেছে, সেদিক দেখিয়ে দিল সোহেল। 'হেলেন, মেইন ডেকে উঠতে চাই, এ হলওয়ে ছাড়া অন্য কোনও পথ?'

'আপনি বলেছেন এদিকের হলওয়ে বন্ধ,' সোহেলের ফেসপ্লেটের দিকে চাইল হেলেন। ঠিক করেছে, চাইবে না মেঝের রক্তের দিকে। 'কিন্তু এদিকে একটা লোহার দরজা আছে। ঠিক মনে নেই, কিন্তু ক্রুদের কাছে শুনেছি, নীচে কী যেন আছে। হয়তো ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়।'

'গুড,' বলল সোহেল। 'ওখানে বোধহয় অগজিলারি হ্যাচ।'

এদিকের হলওয়ের দেয়ালে আলো ফেলল ও। তিনজন হাঁটতে শুরু করল করিডোর ধরে। ঠিকই বলেছে হেলেন, তিরিশ ফুট যেতেই সামনে পড়ল ডিম্বাকৃতির ধাতব হ্যাচ। হুইল ঘুরিয়ে খুলে ফেলল সোহেল, উঁকি দিল ভিতরে। ওদিকে রয়েছে পাইপের এক জটিল জঙ্গল। কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইল সোহেল, তারপর পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে বলল, 'এটা সুইমিং পুলের পাম্প রুম। এখানে ফিলটার হতো পানি, ফিরত সুইমিং পুলে।'

হঠাৎ মড়মড় করে উঠল জাহাজের জোড়াগুলো। মনে হলো ফেটে পড়ছে খোল। বো'র দিকে ঝুঁকল জাহাজ। হেলেন পা পিছলে পড়ে যেত, চট্‌ করে ধরে ফেলল ফারা। একবার চাইল সোহেলের দিকে। বুঝতে পারছে, ওদের হাতে সময় নেই।

খোলা হ্যাচ গলে ঢুকে পড়ল সোহেল, উপরের ডেকে উঠবার পথ খুঁজতে হবে। ঘরে অন্য কোনও দরজা নেই। তবে মেঝের উপর আরেকটা হ্যাচ। দু'পাশে ধাতব রেইলিং। হাঁটু গেড়ে বসল সোহেল, সরিয়ে দিল লক। তুলতে চাইল হ্যাচ।

ক্যাঁচক্যাঁচ করছে কব্জাগুলো। হ্যাচ উঠতেই চোখে পড়ল সামনে লোহার মই, নেমে গেছে মিশমিশে আঁধারে। নামতে শুরু করল সোহেল। হ্যাজম্যাট সুটের কারণে গতি শ্লথ। মেঝের উপর পা রেখে বুঝল, এটা আরেকটা মেকানিক্যাল রুম। চার-দেয়ালে ইলেকট্রনিকসের কেবিনেট। জাহাজের সমস্ত বৈদ্যুতিক পাওয়ার যোগান যেত এখান থেকে। এ মুহূর্তে গুঞ্জন করছে না যন্ত্রপাতি। থমথম করছে ঘর। একদিকের দেয়ালে খোলা এক দরজা। ওদিক দিয়ে যাওয়া যায় আঁধার এক হলওয়েতে।

'তোমরা নেমে এসো,' তাড়া দিল সোহেল। ফিরে এসে থামল মইয়ের সামনে। মেঝের উপর নামতে সাহায্য করবে ফারা ও হেলেনকে। এক মিনিট পর এল হেলেন। শীর্ণ হাত ধরে টের পেল সোহেল, কব্জি বড় চিকন।

হেলেনের পর এল ফারা। আলো ফেলে পথ দেখাল সোহেল। হেলেনকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বলতে পারো জাহাজের কোথায় আছি?'

'ঠিক জানি না,' আবছা আলোয় চারপাশে চাইল হেলেন। 'এ জাহাজে হোটেল স্টাফদের সব জায়গায় যাওয়ার নিয়ম নেই। ...তা ছাড়া, বেশি দিন হয়নি আমি চাকরি নিয়েছি।'

'কোনও অসুবিধে নেই,' বলল সোহেল। চাইছে না মেয়েটি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ুক।

গোল্ড অভ মার্সের নাক ঝুঁকছে। ঠিক করেছে সোহেল, এগুবে স্টার্নের দিকে। হাঁটতে শুরু করে টের পেল, মৃদু টান পড়ছে ঊরুর পেশিতে। উপরের দিকে চলেছে। মনে মনে জানে, নতুন কম্পার্টমেন্ট তলিয়ে গেলে, খাড়া হয়ে উঠবে সামনের পথ।

সুটের কারণে টের পেল না, হঠাৎ সামনে থেকে ভেসে

এসেছে শীতল হাওয়া। ডেকের প্লেটগুলো থরথর করে কাঁপছে। পায়ের নীচে কাঁপুনি, কেন যেন ঘুরে চাইল সোহেল। ঠিক তখনই হলওয়ে থেকে ছিটকে বেরুল পানির সবুজ এক দেয়াল। মুহূর্তে ডুবে গেল ওর ঊরু। ফারা বা হেলেনকে সতর্ক করা হলো না। জোর ধাক্কা খেয়ে আধপাক ঘুরে গেল সোহেল। পরক্ষণে গলা ডুবিয়ে দিল পানির দেয়াল। অসহায় ভাবে ভেসে গেল ওরা। কিছুক্ষণ পর কমে এল ঢেউয়ের তাণ্ডব। টের পেল সোহেল, জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে ডেকের উপর।

আগে উঠল ও। হাত ধরে টেনে তুলল হেলেনকে। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'ফারা, তোমার কি অবস্থা?'

'একটু চমকে গেছি। আর কিছু না। কী ঘটল, সোহেল?'

'বো'র কাছে ধসে পড়েছে কোনও বাল্কহেড। হাতে এখনও খানিকটা সময় রয়েছে।'

সামনের হলওয়ের দিকে টর্চ তাক করল সোহেল। আবার এগুতে শুরু করল। মেঝের উপর গোড়ালি পানি। দু'পাশের দরজা পরীক্ষা করে চলেছে। একবারও ভুল করছে না স্টেনসিল পড়তে। আশা করছে, সামনে কোনও স্টেয়ারওয়েল পাবে। কিন্তু ওদের কপাল অত ভাল নয়। নীচের এ ঘরগুলো শুকনো মালামাল ও স্পেয়ার পার্টস দিয়ে ভরা। সিলিঙের সঙ্গে রয়েছে আই-বিম। ওটা দিয়ে উইঞ্চ চলত, ক্রুরা সরাত ভারী জিনিসপত্র। খানিক দূর যাওয়ার পর এলিভেটর। সোহেল ঠিক করল, সিঁড়ি যদি না পায়, ব্যবহার করবে ওই এলিভেটর শাফট। বেয়ে ওঠা ভীষণ কঠিন, কিন্তু পারবে। বোধহয় ফারাও। সমস্যা হবে হেলেনকে নিয়ে। ওর এত শক্তি নেই যে কায়িক পরিশ্রম

করবে। যদি এ ভারী সুট না থাকত, হেলেনকে পিঠে তুলে শাফট বেয়ে উঠতে চাইত সোহেল।

কী করবে ভাবতে গিয়ে একটা দরজা পাশ কাটাল ও, পরক্ষণে থমকে গেল। আলো ঘুরিয়ে স্টেনসিলে ফেলল। ওখানে লেখা: *ওয়াটারক্রাফট স্টোরেজ।*

'এই তো চাই!'

'ওখানে কী, মিস্টার আহমেদ?' জানতে চাইল হেলেন।

'আমাদের বেরিয়ে যাওয়ার টিকেট,' বলল সোহেল, দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ঘরে।

টর্চের আলো পড়ল একসারি ক্রেডলের উপর। ওখানে চকচক করছে অনেকগুলো জেট স্কি ও রান্যাবাউট বোট। ছাতে বিশাল এক গোলাকার ফোকর, ওদিক দিয়ে তুলে নেয়া হয় বোট ও জেট স্কি। মেঝে থেকে পরের ল্যাণ্ডিঙে পৌঁচেছে ঘোরানো সিঁড়ি। সোহেলকে অনুসরণ করল ফারা ও হেলেন, চলে এল উপর তলায়।

এ ঘর দোকানের মত, একদিকের দেয়ালে লম্বা কাউন্টার। বন্দরে জাহাজ দু'চারদিন থাকলে বোট বা জেট স্কি ভাড়া নেয় যাত্রীরা। চার দেয়ালে অসংখ্য পোস্টার, পানিতে না পড়বার জন্য সাবধান করা হয়েছে। মেঝের উপর ননস্কিড ইনডোর/আউটডোর কার্পেট। বাইরের দিকের বাল্কহেডে বিশাল এক দরজা, দেখলে মনে হয় গ্যারাজের। ওটার সঙ্গে রয়েছে হাইড্রোলিক্যালি নিয়ন্ত্রণ করা র্যাম্প। দরজা খুললে ওই র্যাম্প হয়ে ওঠে ছোটখাটো ডক।

ফ্ল্যাশলাইটের পিছন দিক দিয়ে দরজার উপর ঠুকল সোহেল। ভোঁতা আওয়াজ এল। দরজার উপরের অংশ থেকেও একই আওয়াজ। 'সাগরের নীচে তলিয়ে গেছে দরজা,' বলল

সোহেল। 'যদি খুলি, পানির নীচে চলে যাবে ঘর।'

'আমরা বেরুতে পারব, না...' কথা শেষ করল না হেলেন। হাঁপাতে শুরু করেছে।

'ভয়ের কিছু নেই,' মৃদু হাসল সোহেল। 'বাইরের এবং ভিতরের প্রেশার সমান হলেই পারব। আমাদের ভাসিয়ে রাখবে এই সুট।'

'আমি নীচের দরজা বন্ধ করে আসি,' বলল ফারা। জানে, কী করতে চাইছে সোহেল। জাহাজের এ অংশের দরজা বন্ধ না করলে আসতেই থাকবে পানি।

'যাও, জলদি এসো,' বলল সোহেল। দরজার কাছ থেকে সরিয়ে নিল হেলেনকে। বুঝিয়ে দিল, একটু পর জলোচ্ছ্বাসের মত আসবে পানি। তখন পিছনের রেলিং ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

ছোট একটা ইলেকট্রিক উইঞ্চ খোলে দরজা, কিন্তু পাশেই মেকানিক্যাল হাতল। বিদ্যুৎ না থাকলে ওটা দিয়ে খোলা যায় দরজা।

পাঁচ মিনিট পর ফিরল ফারা, হেলেনের পাশে রেলিঙ ধরে অপেক্ষা করছে। এবার হাতলের উপর একহাতে চাপ দিল সোহেল। প্রথমে নড়তে চাইল না ওটা, তারপর সিন্থেটিক হাতটা যোগ হতেই হার মেনে নিল। সিকি ইঞ্চি খুলে গেল দরজা। ঘরের ভিতর প্রচণ্ড গতিতে ঢুকছে পানি। দরজার এক পাশে দাঁড়িয়ে টের পেল সোহেল, গোড়ালি ভিজছে পানির স্রোতে। হাতলের উপর চাপ বাড়াল ও। আরেকটু খুলল দরজা।

দরজা উপড়ে নিতে চাইল পানির চাপ। ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকছে জলোচ্ছ্বাসের মত। মনে হলো দূরে বজ্রপাত চলছে।

দরজার চার ভাগের এক ভাগ খুলে ফেলেছে সোহেল।

এরপর আটকে গেল হাতল। গায়ের জোরে নামাতে চাইল, কিন্তু নড়ল না ওটা। একবার দরজার দিকে চাইল। বুঝতে চাইছে কীসে আটকেছে দরজা। পানির প্রবল চাপ মুচড়ে দিয়েছে দরজার নীচের অংশ। ঠিক তখনই ট্র্যাক থেকে ছিটকে খুলে গেল গাইড হুইল। চেয়ে রইল সোহেল, ওর চোখের সামনে বাঁকা হয়ে গেল দরজা। যেন বিশাল দৈত্য চাপ দিচ্ছে ওখানে, ফুলে উঠল মাঝখানটা।

সোহেল চেঁচিয়ে উঠল, 'ফারা, হেলেন, সাবধান!' পানির প্রচণ্ড গর্জনে হারিয়ে গেল ওর কণ্ঠ। কোথায় যেন ছিটকে গেল দরজা! প্রচণ্ড বেগে ঘরের ভিতর ঢুকল পানি। চোখের সামনে বিস্ফোরিত হলো যেন গোটা সাগর। ঘরে ঢুকল সবুজ রঙের বিশাল পানির দেয়াল।

দরজার সরাসরি সামনে নেই ফারা ও হেলেন, প্রবল স্রোত ও ঢেউ ওদের ছিটকে নিল না। কিন্তু মুহূর্তে ভরে গেল ঘর। পরক্ষণে এল উল্টো ঢেউ। হেলেনকে একহাতে শক্ত করে ধরেছে ফারা, নইলে হারিয়ে যেত মেয়েটা।

পানির ভিতর চলছে শক ওয়েভ, গর্জে উঠছে ঢেউ। চারদিকে ছিটকে পড়ছে হাজারো জিনিস। ফারা-হেলেনের মাথার পাশ দিয়ে গেল একটা উড়ন্ত জেট স্কি। আরেকটু হলে মাথা দুটো নিয়ে যেত সঙ্গে। পুরো এক মিনিট চলল পানির তাণ্ডব, তারপর শান্ত হয়ে এল ঘর।

দরজার হাতল শক্ত করে ধরেছে সোহেল। ওটা ছেড়ে দিতেই ছাতের দিকে ভেসে যেতে চাইল। যেভাবে পিছিয়ে যায় বিড়াল, সেই ভঙ্গিতে পিছাতে চাইল ও। পরক্ষণে ডিগবাজি খেয়ে নেমে এল মেঝের উপর। এখনও হাতে জ্বলন্ত টর্চ। ওটা মেঝের উপর রাখল, পরক্ষণে কমিয়ে আনল হ্যাজম্যাট সুটের

বাতাসের ফ্লো। আর ছাতে গিয়ে আটকা পড়তে হবে না। প্রেশার কমে আসতেই ফিরে পেল ও ভারসাম্য।

যেখানে থাকবার কথা ফারা-হেলেনের, সেদিকের রেলিঙে আলো ফেলল সোহেল। ওরা আছে, তবে পাগুলো উঠতে চাইছে ছাতের দিকে। বেলুন হয়ে উঠেছে সুট। ওদের কাছে চলে গেল সোহেল, ফারার উরু খামচে ধরে ইশারা করল: হাত ছেড়ে দাও, ভাসতে দাও নিজেকে। ফারার সুটের এয়ার ফ্লো কমিয়ে দিল ও, এরপর হেলেনেরটা। সঠিক পরিমাণে বাতাস আসছে এখন ট্যাঙ্ক থেকে। হাতের ইশারা করে দরজার দিকে ক্রল শুরু করল সোহেল। কিন্তু ওর হাত টেনে ধরেছে ফারা। ঘুরে চাইল সোহেল। ওর ভাইজরের মুখোমুখি হলো ফারার ভাইজর। চেঁচিয়ে কী যেন বলছে।

দ্বিতীয়বার বলবার পর বুঝল সোহেল।

'আমার স্যাম্পল কেস! হারিয়ে গেছে! ওটা লাগবে!'

চারপাশে একবার চাইল সোহেল। গ্যারাজের ভিতর অসংখ্য জিনিস ভাসছে। তোয়ালে, লাইফ জ্যাকেট, নোটবুক, পানির ও সানস্ক্রিনের বোতল, কুলার—জিনিসের অভাব নেই। ওই কেস খুঁজতে গেলে লাগবে অন্তত একটি ঘণ্টা। আর উল্টো ঢেউয়ের সময় যদি বেরিয়ে গিয়ে থাকে, স্যাম্পল কেস এখন চলেছে সাগরের মেঝের দিকে।

'সময় নেই,' পাল্টা চেঁচাল সোহেল।

'কিন্তু, সোহেল, ওই টিশ্যুর স্যাম্পলগুলো দরকার!'

খপ্ করে ফারার হাত ধরল সোহেল, দেখিয়ে দিল দরজার দিক।

বোট গ্যারাজে পানি ঢুকবার ফলে ভারসাম্য হারিয়েছে গোল্ড অভ মার্স, কাত হয়ে এসেছে অনেক। খোলের উপর প্রচণ্ড চাপ

পড়ছে, যে-কোনও সময়ে ভেঙে পড়বে কীল শুরু হয়েছে নানা ধরনের ধাতব আওয়াজ। ছিঁড়ছে ইস্পাতের পাত। বেশিক্ষণ টিকবে না এ জাহাজ। গুঙিয়ে চলেছে সর্বক্ষণ।

দু'পাশ থেকে হেলেনের দু'হাত ধরে দরজার দিকে এগোল সোহেল ও ফারা। বেরিয়ে এল ওরা জাহাজ থেকে, সরে যেতে চাইল সাঁতার কেটে। তারই ফাঁকে সবার এয়ার ফ্লো বাড়িয়ে দিল সোহেল। ট্যাঙ্ক থেকে সুটের ভিতর হুড়মুড় করে ঢুকছে বাতাস। সদ্য ছোঁড়া তীরের মত সাগর-সমতলের দিকে উঠতে শুরু করল ওরা।

খানিক দূরে এসে থেমেছে মার্ভেল। সাগর ও গোল্ড অভ মার্সের উপর ফেলা হয়েছে আলো। আঁধার চিরে দিয়েছে সার্চলাইটগুলো। বিশেষ করে মনোযোগ দেয়া হয়েছে ডেক ও ওয়াটারলাইনের উপর। গ্যারাজ ডোরের পাশে বেঁধে রাখা হয়েছে একটা যোডিয়াক। ওটার বো ডুবতে শুরু করেছে জাহাজের সঙ্গে। জাহাজের আইবোল্ট থেকে যোডিয়াকের দড়ি খুলে নিল সোহেল। ক্রুরা মার্ভেল থেকে দেখেছে ওদের। একটা সার্চলাইট এসে স্থির হলো ওদের উপর। দু'হাত নাড়তে শুরু করল ফারা ও হেলেন।

ক্রুজ শিপের আরেক দিকে ছিল কপ্টার, দেখতে না দেখতে হাজির হলো ওটা। সোহেল, ফারা ও হেলেনের উপর স্থির হলো। ওরা সুস্থ তা নিশ্চিত হয়ে, আবারও কপ্টার নিয়ে চলে গেলেন সিরাজ। গোল্ড অভ মার্সের ডেকের উপর ভাসছে রবিনসন।

প্রচণ্ড বাতাস সরে যেতেই যোডিয়াক বেয়ে উঠল সোহেল, একে একে তুলে নিল ফারা ও হেলেনকে। পাঁচ সেকেণ্ড পেরুনোর আগে চালু হয়ে গেল মোটর, চলেছে ওরা মার্ভেলের

দিকে। ফ্রেইটারের মাঝখানে হাঁ হয়েছে দরজা। ওদের জন্য ওখানে অপেক্ষা করছে একটা দল। পরনে হ্যাজম্যাট সুট, হাতে ট্যাঙ্ক। কনসেণ্ট্রেটেড ব্লিচের সলিউশন সোহেল-ফারা ও হেলেনের সুট ডিকনট্যামিনেট করবে।

জাহাজের কাছে এসে মোটর থামিয়ে দিল সোহেল। রেডিও ভিজে যাওয়ায় সম্ভব নয় যোগাযোগ করা, তবে আর্দালিরা যে যার কাজ করে চলেছে। তারা তিনটে স্ক্রাব ব্রাশ ছুঁড়ে দিল যোডিয়াকে। ব্লিচের শক্তিশালী জেট এসে পড়ল সোহেলদের উপর। প্রথমে ব্রাশ দিয়ে হেলেনকে পরিষ্কার করল সোহেল ও ফারা। হ্যাজম্যাট সুটের এক ইঞ্চি বাদ পড়ল না। ফারা নিশ্চিত হলো মেয়েটির সুট ডিকনট্যামিনেট হয়েছে। এরপর নিজেদের ভাসিয়ে দিল ব্লিচ দিয়ে। যোডিয়াকের মেঝের উপর জমল ছয় ইঞ্চি পুরু ব্লিচ-গোলা পানি।

পাঁচ মিনিট পর ফারা নিশ্চিত হলো, সুটের সঙ্গে ভাইরাস নেই। এবার সন্তুষ্ট হয়ে ছিঁড়তে শুরু করল ডাক্ট টেপ। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এল সুট থেকে। সাগরে বইছে নাতিশীতোষ্ণ হাওয়া। ওর মনে হলো, জীবনে এত চমৎকার হাওয়ায় শ্বাস নেয়নি আর।

'দারুণ লাগছে তো!'

'আমারও,' মৃদু হাসল সোহেল। খুলে ফেলেছে হ্যাজম্যাট সুট।

এখনও খোলা হয়নি হেলেনের সুট। তার হাত ধরে র‍্যাম্পে উঠল সোহেল, তুলে দিল মার্ভেলে। এবার মেয়েটির দায়িত্ব নিল ফারা। ওকে নিয়ে চলল মেডিকেল বে-তে। সবার সঙ্গে মিশবার অনুমতি দেয়ার আগে, নানা ধরনের পরীক্ষা করতে হবে। আপাতত রাখা হবে আইসোলেশন চেম্বারে। হতে পারে, হেলেন

ভাইরাসে আক্রান্ত।

কাজ শেষ হয়নি সোহেলের, এবার ডুবিয়ে দিতে হবে যোডিয়াক। ঠিক তখন গ্যারাজে এসে ঢুকল অনিল ও উর্বশী। থমথম করছে মুখ।

'কী হয়েছে?' চট্ করে জানতে চাইল সোহেল।

'কণ্টারের কেবিনে ফু-চুং নিরাপদ,' বলল উর্বশী। 'তবে রানার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।'

এক সেকেণ্ড দ্বিধা করল না সোহেল, 'আমি এখুনি ফিরছি ওই জাহাজে।'

'একবার তাকিয়ে দেখ্,' ডুবন্ত জাহাজ দেখিয়ে দিল অনিল। 'কীল ফেটে গেছে। জাহাজের ভিতর ঢুকেছে প্রচুর পানি। ফু-চুং আর উর্বশী যেতে চেয়েছে। আমিও। গগল না থামালে যেতাম। কিন্তু কী করতে পারতাম? আর পাঁচ মিনিটও টিকবে না ওটা।'

'কিন্তু রানা ওটার ভেতর...' যোডিয়াকে নেমে পড়ল সোহেল। 'আমি চললাম।'

'দাঁড়ান!' তীক্ষ্ণ শোনাল উর্বশীর কণ্ঠ। 'আপনার সুট নেই। আপনি ফেরার পর আক্রান্ত হতে পারে সবাই।'

গাল কুঁচকে গেল সোহেলের। সামলাতে চাইছে আবেগ। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল যোডিয়াকের মেঝেতে। জানে, মিথ্যা বলেনি অনিল বা উর্বশী। চোখ থেকে টপ টপ করে ঝরতে শুরু করেছে পানি, নামছে গাল বেয়ে। চেয়ে রইল গোল্ড অভ মার্সের দিকে।

সত্যিই, ওই জাহাজের শেষসময় ঘনিয়ে এসেছে। সাগরে তলিয়ে গেছে উপরের সারির পোর্টহোলগুলো। সাগর থেকে দুই ফুট উপরে এখন মেইন ডেক। কীল ভেঙে যাওয়ায় মাঝখানটা ডেবে গেছে, মাথা উঁচু করছে বো ও স্টার্ন। প্রচণ্ড চাপ খেয়ে

বেরিয়ে আসছে খোলের ভিতরের বাতাস. আবার শুরু হয়েছে একের পর এক বিস্ফোরণের আওয়াজ। বিকট শব্দে ছিঁড়ছে কবজা, ভেঙে পড়ছে জানালা-দরজা। রেলিং টপকে ভিতরে ঢুকল সাগর। ডেকের উপর তৈরি হলো অসংখ্য ফোয়ারা। সোহেল যেখান থেকে দেখছে, ওর মনে হলো, গোল্ড অভ মার্সের চারপাশে ফুটতে শুরু করেছে পানি।

মুহূর্তে ডুবে গেল জাহাজের ব্রিজ। সাগরের চাপে চুরচুর হয়ে গেল টেম্পার দেয়া কাঁচ। ভেসে উঠল আবর্জনা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল ডেক চেয়ার। একটা লাইফবোট খুলে গেছে ডেভিট থেকে, ভাসতে লাগল উল্টো হয়ে।

হঠাৎ তলিয়ে গেল ব্রিজের ছাত। বারবার চোখ মুছছে সোহেল, কিন্তু চোখ ফেরাতে পারছে না। পানির উপর রইল শুধু জাহাজের কমিউনিকেশন মাস্তুল ও চিমনি। বিশাল জাহাজকে মুহূর্তে গ্রাস করল সাগর, পানির নীচ থেকে ছিটকে উঠল বিশাল সব বুদ্বুদ।

অপারেশন সেণ্টার থেকে সাগরে আলো ফেলেছে গগল। সবচেয়ে শক্তিশালী সার্চলাইট তাক করেছে চিমনির উপর। চোখে পড়ল আঁকা ছবি—দু'হাতে তুলে ধরেছে কেউ অসংখ্য হীরার খণ্ড!

চারপাশের সাগর বলকে উঠছে! আকাশে স্থির রবিনসন কপ্টার।

'রানা... আর... নেই!' ফুঁপিয়ে উঠল উর্বশী। দুই চোখ থেকে অঝোরে ঝরছে অশ্রু।

আস্তে করে মাথা নাড়ল অনিল, চাপতে চাইল দীর্ঘশ্বাস। 'রানা রইল আমাদের সবার হৃদয়ে।'

তারপর ওদের চোখের সামনে তলিয়ে গেল অতবড়

চিমনিটা। ওখান থেকে বেরুল বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটা। সেইসঙ্গে এল হলুদ কী যেন! মনে হলো কামানের মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়েছে ওটা! বিশ ফুট উপরে উঠল, যেন উড়তে চাওয়া ডানা-ভাঙা পাখি।

'ওইরে... হই-তো!' হুঙ্কার ছাড়ল সোহেল। 'ও-ও-ওই যে!'

উর্বশী ও অনিল চেয়ে রইল, বুঝল না নিজ চোখকে বিশ্বাস করবে কি না! হলুদ জিনিসটা সত্যিই হ্যাজম্যাট সুট। চিমনি থেকে ছিটকে বেরিয়েছে, উড়তে উড়তে পেরিয়েছে রেলিং!

দুই হাত ও এক পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে সাগরে এসে নামল ওদের প্রাণের বন্ধু শ্রীমান মাসুদ রানা চৌধুরি!

হতবাক হয়ে চেয়ে রইল সবাই।

পানিতে পড়ে সামলে নিয়েছে রানা, কয়েক সেকেণ্ড পর সাঁতরাতে লাগল। নিমজ্জমান জাহাজ থেকে সরছে।

ওর উপর আলো ফেলেছে গগল। উল্টে থাকা লাইফ বোটে হাছড়ে-পাছড়ে উঠল রানা। উজ্জ্বল আলোর ভিতর ঝুঁকে বসে পড়ল, ডানহাত চলে গেল বুকের কাছে—ভাব দেখে মনে হলো দারুণ এক জাদু দেখিয়ে, বাউ করছে দর্শকদের উদ্দেশে!

ওকে বিশেষ জাহাজী স্যালিউট জানাল গগল, বিকট আওয়াজে সাগর কাঁপিয়ে বারম্বার বেজে উঠল মার্ভেলের ভেঁপু, তারপর একটানা অনেকক্ষণ!

দশ

ল্যাবোরেটরির পাশের মেডিকেল বে-তে, এসে ঢুকেছে কমাণ্ডো জলিল খান ও কাশেম বক্স। কিন্তু কোনও আওয়াজ পেল না ডক্টর ফারা রাইনার। মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে। একবার চাইছে মাইক্রোস্কোপের দিকে, আবার কম্পিউটারের স্ক্রিনে। জলিল খান খুক-খুক করে কেশে উঠতেই মুখ তুলল ফারা, কুঁচকে উঠল ভুরু।

বিস্তৃত হাসছে দুই বন্ধু, কারণটা বোঝা গেল না।

ওদের পিছনে কাঁচের ঘরে রাখা হয়েছে হেলেন জিলকে, জাহাজের সবার কাছ থেকে আলাদা। সফিস্টিকেটেড পিউরিফায়ার দিয়ে নিয়মিত পাম্প করা হচ্ছে বাতাস। সে বাতাস জাহাজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে তাপমাত্রা তৈরি করা হচ্ছে এক হাজার ডিগ্রি। ওই তাপে টিকবে না কোনও ভাইরাস। হেলেনের কটের পাশে চেয়ার টেনে বসেছে রানা, পরনে এখনও হলুদ হ্যাজম্যাট সুট। ডক্টর ফারার নির্দেশ, ও কতটুকু এক্সপোজ হয়েছে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ওকে ওই ঘরেই থাকতে হবে। ধরেই নিয়েছে সবাই মেয়েটা ওই ভাইরাসের ক্যারিয়ার। ওর কাছ থেকে ছড়িয়ে পড়তে পারে রোগ। একটু আগে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে স্যাম্পল দেখছিল ফারা। ওই ঘরে যদি ঢুকতে হয়, ঢুকবে ও হ্যাজম্যাট সুট পরে।

‘কী কাজে এসেছেন?’ জানতে চাইল ফারা।

‘আমরা কম্পিউটার দিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি,’ বলল কাশেম বক্স। ‘সিনিয়ররা আলাপ করছেন। আমাদের ধারণা, মাসুদ ভাই বা ওই মেয়ে ইনফেক্টেড নয়।’

এবার বিরক্তি লুকিয়ে রাখল না ফারা: ‘কীসের আলাপ? আমরা কীসের বিরুদ্ধে লড়ছি, আপনারা জানেন?’

প্রথমবারের মত হেলেন জিলের উপর চোখ পড়েছে দুই বন্ধুর। ‘সর্বনাশ!’ চোখ বিস্ফারিত হলো কাশেম বক্সের। কালো চুলগুলো এলিয়ে শুয়েছে মেয়েটি। ঘুমন্ত। মনে হলো ফুটফুটে রাজকন্যা। বলেই ফেলল সে, ‘ও দেখতে দারুণ তো!’

‘ভুলে যা ওর কথা,’ কঠোর স্বরে জানিয়ে দিল জলিল খান। ‘আমি আগে দেখেছি ওকে।’

‘আমি ওর হাত ধরে এনেছি,’ আপত্তি তুলল কাশেম বক্স।

‘হ্যাজম্যাট সুট ধরেছিস, হাত পাবি কই,’ বলল জলিল। ‘ওই হাত শুধু আমার। আমিই দেব প্রথম প্রস্তাব।’

‘যথেষ্ট হয়েছে, এখানে তর্ক নয়,’ ইংরেজিতে বলল ফারা। চেপে গেল যে ও বাংলা ভাষা পরিষ্কার বোঝে। দুই বন্ধু শিশুর মত পরস্পরকে হারাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। দুজনেই উৎসাহী মেয়েটির ব্যাপারে। এই দুই কমাণ্ডোকে যতটুকু চিনেছে ফারা, এরা কখনও কোনও মেয়ের ক্ষতি করবে না। ‘বলে ফেলুন কেন এসেছেন।’

‘হ্যাঁ, দুঃখিত, ডক্টর,’ বলল কাশেম। চট্ করে চাইল হেলেনের দিকে। ‘মিস্টার ফু-চুং ও মিস্টার অনিল—আসলে আমরা সবাই, বুঝতে চাইছিলাম সেই ভয়াবহ পরিবেশ। কম্পিউটারকে কাজে লাগিয়ে জানা গেছে, ভাইরাস ধরেনি মাসুদ ভাই বা ওই মেয়েকে। মিস্টার অনিল পাঁচ মিনিট আগে

কম্পিউটার দেখে বললেন, এঁরা রোগাক্রান্ত হতেই পারেন না।'

'এটা সায়েন্স, বিশেষ করে বায়োলজি,' বলল ফারা, 'অনিল ও ফু-চুঙের কম্পিউটারের প্রোগ্রাম বা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম নয়, বুঝেছেন?' কাশেমের চোখে চাইল ফারা। 'আপনাদের সঙ্গে জুটেছে সোহেল আহমেদ?'

'না... ঠিক... তা নয়...' থতমত খেল কাশেম।

গম্ভীর চেহারা দেখে মনে হলো আহত হয়েছে দুই বন্ধু। ওদের মাসুদ ভাই বা সোহেল ভাইকে নিয়ে কথা উঠলে তাদেরও কিছু বক্তব্য থাকতে পারে। বাক্যবাণের প্রস্তুতি শুরু করল ওরা।

'আসল কথা কী...' কাশেমের কথার খেই ধরল জলিল, 'সায়েন্সের সবই তো গণিত। আর বায়োলজি তো জীবন্ত কেমিস্ট্রি। এই কেমিস্ট্রিকে আবার বলা যায় অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স। শক্তিশালী ও দুর্বল নিউক্লিয়ার তৈরি করছে অ্যাটম। সেই ফিজিক্স আবার সত্যিকারের পৃথিবী-সংক্রান্ত গণিত।'

'তো?' ভুরু উঁচু করল ফারা। বুঝতে চাইছে এদের উদ্দেশ্য।

'সেই গণিতের মাধ্যমে কী দেখলেন আপনি? কোনও ভাইরাস বা টক্সিন পেলেন স্যাম্পলগুলোর ভিতর?'

'না, তা পাইনি,' বলল ফারা।

'সেটাই তো কথা!' উৎসাহিত হয়ে উঠল জলিল। 'পাবেন না খুঁজে। গোটা জাহাজ জুড়ে একসঙ্গে মরল মানুষ। এ সম্ভব শুধু খাবারে বিষ দিলে।'

'জলিল ঠিক বলেছে,' সায় দিল কাশেম।

ফারার ধারণা হয়েছে, এরা সবাই মিলে যুক্তি করে এসেছে। এবং এদের পিছনে রয়েছে ওই সোহেল, ফু-চুং, অনিল ও গগল—বুদ্ধির ঢেঁকি একেকটা।

দুই কমাণ্ডোর উদ্দেশে হাত তুলল ফারা। 'কাজেই আপনারা

ভাবছেন মানুষগুলোর মৃত্যুর কারণ খাবারে বিষ দেয়া।' ও নিজে জানে, ওদের যুক্তি ভুল নয়।

'এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। মাসুদ ভাই ওই জাহাজে থাকবার সময় কিছু খাননি। বাজি ধরতে পারি, রাতের খাবার খায়নি হেলেন জিল।' কাঁচের ওপাশের ঘর দেখিয়ে দিল কাশেম।

'তারপরও, সাবধান হয়েছি আমরা,' বলল জলিল। 'ইঞ্জিন-রুমের বাতাস নিয়ে ভেবেছি। মাসুদ ভাই সুট ছিঁড়ে ফেললেন, তখন যদি বাতাসে কিছু থাকত, তার মাত্রা এতই কম, শত বিলিয়নের এক ভাগ সম্ভাবনা ছিল আক্রান্ত হওয়ার।'

দু'হাত বুকের উপর বেঁধেছে কাশেম। 'তা ছাড়া, পাঁচ ঘণ্টা পেরিয়েছে, মাসুদ ভাই এখনও সুস্থ। সোহেল ভাইয়ের কাছে শুনেছি আপনার রোগিণীর কাছে এসেছিল তার বান্ধবীরা। সেটা পার্টির আগে। তারপর বিষ খেয়ে মরেছে তারা। কিন্তু মাসুদ ভাই বা হেলেন জিল কিছু খাননি, ফলে কিছুই হয়নি তাদের।'

'এবার মাসুদ ভাইকে ছেড়ে দেয়া যায়-না?' খানিকটা করুণ হয়ে উঠল জলিলের কণ্ঠ।

'আপনাদেরকে পাঠিয়েছে সিনিয়ররা, এই তো?' বলল ফারা। এরা যা ভাবছে ঠিক একই কথা ভেবেছে ও নিজেও। মাসুদ রানাকে ছেড়ে দেয়া যায়। কিন্তু হেলেন জিলকে নয়। ওর উপর আরও পরীক্ষা করতে হবে। অসংখ্য ল্যাব রেজাল্ট খুঁটিয়ে দেখতে হবে। মেয়েটির রক্তে, স্পাইনাল ফ্লুইডে, থুতু বা প্রস্রাবে ভাইরাস নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, অন্য কোথাও থাকবে না। হয়তো রয়েছে কিডনির ভিতর, বা অন্য কোনও টিশ্যুর ভিতর। আরও বিশদ ভাবে টেস্ট করতে হবে। এমন হতে পারে, মেয়েটির ইমিউন সিস্টেমকে শীঘ্রি হারিয়ে দেবে

ভয়ঙ্কর ভাইরাস, তারপর ধরবে পরের মানুষটাকে। আক্রান্ত হবে মার্ভেলের সবাই।

'শপথ করে বলতে পারি, কেউ আমাদের পাঠায়নি,' বড় দ্রুত বলল জলিল। 'কেউ না!'

মৃদু হেসে ফেলল ফারা। 'সরি, কিন্তু আপনাদের কথা মানা সম্ভব হলো না। রানার ব্যাপারে ঠিকই বলেছেন, কিন্তু হেলেনকে আলাদা ভাবে রাখতে হবে। এক শ' ভাগ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ধরে নেব, ও ইনফেক্টেড।...আরেকটা কথা, আপনারা ভাল করে মিথ্যা বলতে শেখেননি।'

'তা-ই?' লালচে হয়ে গেল জলিলের গাল।

উল্টো দিকের দেয়াল দেখছে কাশেম। অতি বিনয় করে বলল, 'আপনি ডাক্তার, যা বলবেন তা-ই মানব। তবে সবাই ভাবছে খামোকা সময় নষ্ট হচ্ছে, আসলে মাসুদ ভাইয়ের ভিতর ভাইরাস নেই।'

'আপনার বন্ধু বলেছে কেউ পাঠায়নি,' বলল ফারা। আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'আমি তো বলব, ওরা বন্ধুকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। ঠিক?'

চুপ রইল কাশেম ও জলিল।

'যদি পরীক্ষা করতে গিয়ে অহেতুক সময় যায়, যাবে আমার,' বলল ফারা। ল্যাব স্টুল ঘুরিয়ে উঠে দাঁড়াল। দেয়াল থেকে খুলে নিল ইণ্টারকমের রিসিভার, পটাপট টিপল বাটন। 'রানা, কথা শুনছ?'

মনের ভিতর কোনও দুশ্চিন্তা রাখেনি রানা। ভাবেইনি ওর শরীরে থাকতে পারে ভয়ঙ্কর ভাইরাস, মরতে হতে পারে। প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঝাঁকি খেয়ে সোজা হয়ে বসল। হাত তুলে ফারার দিকে নাড়ল। আরেক হাতে স্পেয়ার ব্যাটারি। ওগুলোর

কারণে এখন পর্যন্ত শ্বাস নিতে পারছে।

'আমি তোমাকে যেতে দিচ্ছি,' বলল ফারা। 'এয়ার লকের ভিতর ঢুকবে, ডিকনট্যামিনেশন শাওয়ার নেবে। ওখানে ছেড়ে আসবে সুট। পরে ওটা পুড়িয়ে ফেলব আমি।'

কথাটা শুনে খুশি হয়ে উঠল জলিল ও কাশেম।

ইন্টারকমে সোহেল ভাইকে জানিয়ে দিল জলিল, ছাড়া পাবেন মাসুদ ভাই।

আইসোলেশন ওয়ার্ডের বাতাস রিসাইকেল করতে পনেরো মিনিট লাগল এয়ার লকের। এ সময় গোসল করতে হলো রানাকে। ওর উপর বজ্রপাতের মত নামল ব্লিচ ও অ্যান্টিভাইরাল এজেন্ট। শাওয়ার শেষে ল্যাবে এসে ঢুকল রানা।

'ছিহ্, তোমার গায়ে বিশ্রী গন্ধ!' নাক কুঁচকে ফেলল ফারা।

'তোমারও হতো, যদি ওই সুটের ভিতর অতক্ষণ থাকতে,' বলল রানা।

'আমার কক্ষনো এমন হতো না,' বলতে গিয়ে থেমে গেল ফারা।

ল্যাবোরেটরির ভিতর ঢুকেছে সোহেল ও ফু-চুং। বন্ধুর দিকে চাইল সোহেল, নিচু স্বরে বলল, 'বাঘিনীর কবল থেকে বেঁচে গেলি?'

মুখ বাঁকাল ফারা।

'তোদের সবার দোয়ায়,' বলল রানা। একবার ফারাকে দেখে নিয়ে ফু-চুঙের দিকে চাইল। 'ওই জাহাজের কম্পিউটারে কিছু পেলি?'

'আর্কাইভের তিরিশ পার্সেন্ট ডাউনলোড করেছি,' বলল ফু-চুং। 'শেষ দিকের সবই পাব।' রানার পরের প্রশ্নের আগেই হাত তুলল সে। 'অনিল এখনও সব ঘেঁটে দেখেনি। আমরা অন্য

কাজে ব্যস্ত ছিলাম।'

'ওরা প্রমাণ করতে ব্যস্ত ছিল, তুমি ভাইরাস অ্যাফেক্টেড নও,' তথ্য যোগান দিল ফারা।

'ওদের মঙ্গল হোক!' দুই বন্ধুর দিকে চেয়ে হাসল রানা।

'এবার লগ বুক নিয়ে কাজে নেমে পড়তে হবে,' বলল ফু-চুং।

'যখন থেকে রওনা হয়েছে, তারপর শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছে, সব জানা দরকার।'

সবার প্রসঙ্গ পাল্টে দিল ফারা, 'দেখলাম চেম্বারে ঢুকে হেলেনের সঙ্গে আলাপ করছ? এখন কেমন আছে ও?'

'ক্লান্ত ও ভীত। জানে না কী ঘটেছে। বেশি কিছু বলিনি। গুছিয়ে কিছু বলতে পারছে না। তবে একটা কথা বলেছে, ওটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। ওই জাহাজ ভাড়া নেয় এক গোষ্ঠী। নিজেদের বলে রেসপন্সিভিস্ট।'

'কী বলে? রেসপন্সিভিস্ট?' জানতে চাইল উর্বশী। এইমাত্র ল্যাবোরেটরিতে এসে ঢুকেছে। একবার রানার দিকে চাইল। 'জাহাজে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, এবারের মত মাফ করে দিয়েছে তোমাকে ফারা। ...এখন কী অবস্থা?'

'বেঁচে আছি সেজন্য খুশি,' বলল রানা। চট্ করে একবার হাতঘড়ি দেখল: ভোর সাতটা।

কী করে যেন সব তথ্য পেয়ে যায় ক্রুরা। এর মূলে রয়েছে বোধহয় বাবুর্চি মোস্তফা আবুল।

হেসে ফেলল উর্বশী। 'এমনটা কখনও দেখিনি। ফানেলের ভিতর থেকে যেভাবে ছিটকে বেরিয়ে এলে, মনে হলো যেন সস্তা শ্যাম্পেন বোতলের কর্ক!'

হেসে উঠল সবাই।

'একটু খুলে বল্ তো,' বলল সোহেল।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'প্রায় পুরো চিমনি বেয়ে উঠেছি। তারপর আটকা পড়ে গেলাম, উঠতে পারলাম না। পানি বাড়ছে, এয়ার ফ্লো না কমিয়ে উল্টো বাড়িয়ে দিলাম। সুট দিয়ে ঢাকা পড়ল চিমনি। এরপর ইঞ্জিনরুমের বন্যা আর চিমনির পানির চাপ তোপের মত উড়িয়ে দিল আমাকে।'

'তোমার বেরিয়ে আসাটা ছিল দেখার মত,' বলল উর্বশী।

'আন্দাজ কত উপরে ছিটকে ওঠে?' জানতে চাইল ফারা।

'বিশ ফুট তো হবেই,' বলল উর্বশী। 'তারপর রেলিং টপকে উড়ে গিয়ে পড়ল সাগরে—জাহাজ থেকে অন্তত পনেরো ফুট দূরে।'

ও থেমে যেতেই নীরবতা নামল ঘরে। পরস্পরের দিকে চাইল সবাই। পরিবেশ কেমন যেন অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। কখনও কখনও এমন হয়। তারপর মনে পড়ে যেতেই জিজ্ঞেস করল উর্বশী, 'তোমরা রেসপন্সিভিস্টদের ব্যাপারে কী যেন বলছিলে?'

'হেলেনের কাছে শুনেছি ওরা ফিলিপিন্স থেকে গ্রিসের পাইরিয়াসে আসতে চেয়েছিল,' বলল রানা।

'তা-ই?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল উর্বশী। 'গ্রিসে বিশাল এলাকা কিনে নিয়েছে রেসপন্সিভিস্টরা। শেষ খবর অনুযায়ী আমার ভাই ওখানে আছে ওই দলের সঙ্গে। পেলোপনেশিয়ান পেনিনসুলায়।'

'তোমার মা এ খবর জানিয়েছেন?' বলল ফারা।

'হ্যাঁ। আমার ভাইকে কিডন্যাপ করা হয়নি। শুনছি, স্বেচ্ছায় গেছে। সবসময় কাউকে না কাউকে অনুকরণ করত। হাইস্কুলে উঠে খারাপ বন্ধুদেরকে গুরু মেনেছিল। শেষে তো ড্রাগই নেয়া শুরু করল। ওর রিহ্যাব কাউন্সেলার বলেছে, অমলের

অ্যাডিকশন প্রবলেম নেই, ওর সমস্যা—ভাল-মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারে না। মা'র কাছে শুনলাম এক ইউরোলজিস্টের কাছে গিয়েছিল। ভ্যাসাকটমি করাবে।'

'ভ্যাসেকটমি? করেছে?' নাক কুঁচকে ফেলল ফারা। 'ওর বয়স তো মাত্র আঠারো! কোনও লোকের তিরিশ বছর না হলে, বা তার স্ত্রী-সন্তান না থাকলে, বেশিরভাগ ডাক্তার এ অপারেশন করে না।'

'আমার ভাই ঊনিশে পা দিয়েছে। আর রেসপন্সিভিস্টদের নিজেদের ডাক্তার আছে। তাদের সারাদিনের কাজ ভ্যাসেকটমি ও টিউবাল লিগেশন করা। ...ভেঙে পড়েছেন মা। বংশের একমাত্র বাতি অমল।'

'আজই এই গোষ্ঠীর কথা শুনেছি হেলেনের কাছে,' বলল রানা।

'ওদের ব্যাপারে আমি নিজেও বেশি কিছু জানি না,' বলল উর্বশী। 'যতটুকু শুনেছি, মা'র কাছে।'

'তোমাদের উচিত নিয়মিত হলিউডি গসিপ পড়া,' বলল ফারা। 'নায়িকা পার্লা মোনার নাম শুনেছ?'

'বিখ্যাত নায়িকা?' বলল জলিল খান। চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল।

'আজ পর্যন্ত সব চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পেয়েছে যে। সেই পার্লা মোনা কিন্তু রেসপন্সিভিস্ট। ছায়াছবির জগতের অনেকে ওই গোষ্ঠীর সঙ্গে মিশছে। হলিউডের নতুন ক্রেজ ওটা।'

ফারার দিকে চাইল রানা। 'ওটা কি চার্চ, কাল্ট বা ওই ধরনের কিছু?'

'নিশ্চিত নয় কেউ,' বলল ফারা। 'অন্তত গোষ্ঠীর বাইরের কেউ কিছু জানে না। সত্তর সালের দিকে ডক্টর লিঙ্ক চ্যাপেল এই

মতবাদ প্রচার শুরু করে। অথচ তার প্রথম কাজ ছিল ম্যালেরিয়া ও স্মলপক্সের বিরুদ্ধে কম দামি ওষুধ আবিষ্কার করা। লাখ লাখ মানুষকে রক্ষা করেছে তার তৈরি ওষুধ। তারপর বদলে গেল সে, ভাবতে লাগল: ঠেকাতে হবে পৃথিবীর জনসংখ্যা বিস্ফোরণকে। তার বক্তব্য: পৃথিবীতে এত মানুষের প্রয়োজন নেই। কঠিন রোগগুলো ঠেকাতে গিয়ে আসলে প্রকৃতির ভারসাম্যই নষ্ট করেছে সে। মানুষ যে শুধু অসংখ্য সন্তান জন্ম দিয়েছে, তা নয়, তারা অনেক বেশি সময় ধরে বেঁচে থাকছে। ফলে আরও বেশি সন্তান জন্ম নিচ্ছে। লিঙ্ক চ্যাপেল প্রচার শুরু করল, মানুষ যদি মহামারি হয়ে না মরে, অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে পৃথিবী ধ্বংস হবে।

'এই বিষয়ের উপর একটা বই লিখল সে। বিশ্ব জুড়ে ক্রুসেড শুরু করল ফ্যামিলি প্ল্যানিঙের উপর। তার মত অনেককে নিয়ে তৈরি করল এক সংগঠন। এই সংঘের সবাইকে নাম দেয়া হলো রেসপন্সিভিস্ট, যারা সব বিষয়ে দায়িত্বশীল। ধীরে ধীরে চারদিকে এই সংগঠনের নাম ছড়িয়ে পড়ল। লিঙ্ক চ্যাপেলের এই মতবাদের নাম দেয়া হলো: রেসপন্সিভিজম। অনেকেই আকৃষ্ট হলো। রাজনীতিবিদ, খেলোয়াড়, অভিনেতা, অভিনেত্রী—মানে, সব ধরনের লোক। দশ বছর পর মারা গেল লিঙ্ক চ্যাপেল, কিন্তু এই সংগঠনকে পরিচালনার দায়িত্ব নিল এক দম্পতি। তাদের নাম এই মুহূর্তে মনে নেই আমার।'

'এই গোষ্ঠী এখন কী করছে?' জানতে চাইল রানা।

'সারা দুনিয়া জুড়ে ফ্যামিলি প্ল্যানিঙের প্রচার করছে। বিনা পয়সায় কণ্ডোম বিতরণ করছে, অ্যাবোর্শন করাচ্ছে, তাদের ডাক্তাররা ইচ্ছুক পুরুষ ও নারীদের ভ্যাসেকটমি ও লিগেশনের অস্ত্রোপচার করে। এই দলের সঙ্গে বহুদিন ধরে লড়ছে

ক্যাথোলিক চার্চ ও ডানপন্থী রাজনীতিকরা।'

সবার উপর চোখ বুলিয়ে নিল রানা, তারপর শান্ত স্বরে বলল, 'জাহাজ ভরা মানুষকে খুন করা হয়েছে। তারা রেসপন্সিভিস্ট হোক বা যা-ই হোক, আমাদের বোধহয় জানা উচিত কারা লেগেছে ওদের বিরুদ্ধে, কারা ঘটালো এই হত্যাকাণ্ড।'

আস্তে করে মাথা দোলাল সোহেল। 'আমি তোর সঙ্গে আছি।'

'আমিও!' একইসঙ্গে বলে উঠল ফু-চুং, উর্বশী ও ফারা।

'আমরাও,' বলল কাশেম। জলিলের দিকে চাইতেই মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সে। এই মুহূর্তে কোনও প্রতিযোগিতা নেই ওদের মধ্যে।

সবাই একমত।

যদিও কেউ জানে না, কারা করল কাজটা, এবং কেন।

এগারো

ক্যালিফোর্নিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেস।

ম্যানিকিউর করা কচি সবুজ ঘাসের উপর ধবধবে সাদা বিশাল তাঁবু। তার উপর ঘুরছে পাপারাজিদের হেলিকপ্টার।

এ এলাকা বেভারলি হিলসের একটা এস্টেট। খানিক দূরে অলিম্পিক সাইজের দুই সুইমিং পুল, তার চেয়েও প্রকাণ্ড ওই

তাঁবু।

নীল আকাশে কাউন্টি শেরিফের বেল জেটরেঞ্জার উদয় হতেই সতর্ক হয়ে উঠল পাপারাজিরা। ভাড়া নেয়া দুই কপ্টার আরেক দিকে রওনা হলো লেজ তুলে, লুকাতে চাইছে টেইল নম্বর। আগেই এই এস্টেটের উপর নো-ফ্লাই জোন জারি করেছে শেরিফ। যদি কোনও পাইলট কপ্টার নিয়ে আসে, গ্রেফতার করা হবে তাকে। বড় অঙ্কের ঘুষ দিতে চেয়েছে ফটোগ্রাফাররা, কিন্তু শাস্তির ভয়ে ফিরতি পথ ধরেছে দুই পাইলট।

বিশাল তাঁবুর নীচে যাঁরা জড় হয়েছেন, তাঁরা বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত, সবাই নামকরা মানুষ। কপ্টার বা পাপারাজিদের দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেননি। এয়ারক্রাফটের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই স্বাভাবিক স্বরে আবার আলাপ শুরু হলো। এক প্রান্তে কাঠের উঁচু মঞ্চ, সেখানে ধীর লয়ে চলেছে ব্যাণ্ড। সুইমিং পুলের তীরে আবার নাচ শুরু করেছে অপরূপ ছয় তরুণী, পরনে সংক্ষিপ্ত ঝলমলে বিকিনি। হলিউডি পার্টিতে এদের ডাক পড়ে।

একদিকে প্রকাণ্ড সাদা বাড়ি, বলা উচিত রাজপ্রাসাদ। চল্লিশ হাজার বর্গফুট নিয়ে তৈরি ভিলা। অতিথিদের রাখবার জন্য দু'পাশে দুটো উইং, সাধারণ আমেরিকান বাড়ির ছয় গুণ বড়। বাড়ির নীচে বিশাল গ্যারাজ, রাখা যায় আশিটা গাড়ি। মেডিটারেনিয়ান অঞ্চলে এমন আরেকটি কম্পাউণ্ড রয়েছে এ দম্পতির। যেন শেষ নেই এঁদের বিত্তের। বিশাল জমি ঘিরতে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করেছে রাজমিস্ত্রীরা। শুধু দেয়াল তৈরি করতে লেগেছে পুরো দু'বছর। যখন এস্টেটের কাজ শেষ হলো, এই দম্পতির জাঁকজমক দেখে চুপ হয়ে গেলেন মস্ত সব বড়লোক।

এই সমস্ত সম্পত্তির মালিক ডিয়েটস্ কেসলার ও তাঁর স্ত্রী বার্থা কেসলার। এঁরা অভিনেতা বা অভিনেত্রী নন, মোগল নন

ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির। একসময় ছোট এক স্টুডিয়োতে সামান্য বেতনে কাজ করতেন ডিয়েটস। তারপর হঠাৎ একদিন পেয়ে গেলেন সবই। রেসপন্সিভিজমের প্রণেতা ডক্টর লিঙ্ক চ্যাপেল উইল করে দিয়ে গেলেন এই বিপুল সম্পত্তি। শুধু তাই নয়, দ্রুত বেড়ে ওঠা এই সংগঠনের দায়িত্ব পড়ল এই দম্পতির উপর। এরপর বাড়তে লাগল সদস্য। দুনিয়ার চারপাশ থেকে হুড়মুড় করে আসতে লাগল ডোনেশন। কিছুদিন পর ক্যালিফোর্নিয়ার উঁচু শ্রেণীর ক্লাব স্বীকার করে নিল, সত্যি অভিজাত বটে এই দম্পতি।

ডক্টর লিঙ্ক চ্যাপেলের বই যখন প্রকাশ হলো—*নিজেদের মৃত্যু ডেকে আনছি আমরা অতিরিক্ত সন্তান জন্ম দিয়ে*; ডিয়েটস বুঝতে পারেন, পাশে থাকতে হবে এই লেখকের। ডক্টর লিঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি, মুগ্ধ হন ভদ্রলোকের কথায়। এরপর জোরেশোরে শুরু করেন প্রচারের কাজ। এর কিছুদিন পর দুর্বল হয়ে পড়েন ডক্টরের মেয়ের প্রতি। বার্থা চ্যাপেলও আগ্রহ দেখান। দু'মাস প্রেম করবার পর বিয়ে করেন তাঁরা। দু'জন যেন পরস্পরকে পেয়ে অদ্ভুত এক শক্তি আবিষ্কার করেন, সমস্ত শক্তি ঢেলে দিলেন রেসপন্সিভিজ্‌ম প্রতিষ্ঠায়। আজকের এই শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠেছে শুধু এই দু'জনের অক্লান্ত পরিশ্রমে।

ডক্টর লিঙ্ক চ্যাপেল এটাই চেয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর যেন এরা দু'জন টিকিয়ে রাখেন তাঁর মতবাদ। সত্যিই কারিশমা দেখিয়েছেন ডিয়েটস ও বার্থা, টেনে নিয়েছেন এণ্টারটেইনমেণ্টের মস্ত সব মানুষদেরকে। তাদের সঙ্গে এসেছে ভক্তরা। এরপর যখন পার্লা মোনা অস্কার পেল, সে খোলাখুলি ভাবে খবরের কাগজে সাক্ষাৎকার দিল: তার সফল হওয়ার মূলে

রেসপন্সিভিজম। হলিউডে তোলপাড় শুরু হলো, এই সংগঠনে যোগ দিল হাজার হাজার লোক।

ঝাড়া ছ'ফুট লম্বা, শক্তপোক্ত ডিয়েটস কেসলার দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুইমিং পুলের পাশে। খুব খেয়াল না করলে বোঝা যায় না অস্ত্রোপচার করে নিজের চেহারা একটু বদলে নিয়েছেন তিনি। এখন তাঁকে দেখলে মনে হয়, এই মানুষটাকে সম্রাট হলে খুব মানাত। চেহারায় আলাদা একটা জ্যোতি ঝলমল করে সবসময়। বয়স তাঁর সাতান্ন বছর, চুলের দু'পাশে রুপালি ছোপ পড়েছে। তাতে আরও অনেক বেশি ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনে হয়। দুই চোখের ঝিকমিকে দৃষ্টি যে-কাউকে আকর্ষণ করে। শরীরের তুলনায় খানিক বড় মাখন-রঙা লিনেন জ্যাকেট পরেছেন। পেশিবহুল নন, কিন্তু লাগছে তেমন। এতক্ষণ আশপাশের সবাইকে গল্পেসল্পে জমিয়ে রেখেছেন। হেসেছেন, হাসিয়েছেন। ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো চেহারার সঙ্গে অদ্ভুত সুন্দর মানিয়েছে।

কেসলারের বাম পাশেই রয়েছেন বার্থা। স্বামীর চেয়ে মাত্র তিন বছরের ছোট তিনি। তবে দেখে মনে হয় বয়স বড়জোর তিরিশ। ক্যালিফোর্নিয়ার রাণী বলা হয় তাঁকে। হাঁটু সমান সোনালী চুল, চোখদুটো সাগর-নীল। অ্যাথলেটদের মত ছিপছিপে দেহ। তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পদ হরিণী গ্রীবা। পরেছেন লো কাট টপস্, কণ্ঠে নিখুঁত হীরার ঝলমলে নেকলেস।

ডিয়েটস ও বার্থা দু'জনই আকৃষ্ট করতে পারেন মানুষকে। একসঙ্গে দু'জন যেন সহজেই মনোযোগ কেড়ে নেন সবার, হয়ে ওঠেন যে কোনও পার্টির কেন্দ্রবিন্দু। আর সেই পার্টি যদি হয় রেসপন্সিভিস্টদের, তাঁরা হয়ে ওঠেন দেব-দেবী। আজ এ দম্পতি উদ্বোধন করবেন নতুন এই হেডকোয়ার্টার।

ভীড় একটু কমে যেতেই সামনে এসে দাঁড়ালেন এক

প্রতিভাবান সিনেমা পরিচালক। 'কংগ্র্যাচুলেশনস, ডিয়েট্স।' ঝুঁকে এসে চুমু দিলেন বার্থার গালে। আশপাশের সবাই জানে তিনি এই দম্পতির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 'কংগ্র্যাচুলেশনস, বার্থা। আজ দারুণ দিন তোমাদের। যা করেছ সেজন্য গর্বিত হওয়া উচিত। ডক্টর চ্যাপেল বেঁচে থাকলে খুশি হতেন।' শেষ কথাটা এমন ভাবে বললেন, মনে হলো কথা বলছেন এক মস্তবড় পীরের সম্বন্ধে। 'একদিন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানবে এখানে শুরু হয় জন-সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচী। ঠেকিয়ে দেয়া হয় মানব জাতির ধ্বংস।'

'পৃথিবীর জন্য নতুন আলো হয়ে এসেছে রেসপন্সিভিজম,' বললেন বার্থা। 'আমার বাবা সবসময় বলতেন, কোনও কাজ শুরু করা সবসময় কঠিন। বিশেষ করে যদি এতবড় কাজ হাতে নেয়া হয়। তবে মানুষ ছড়িয়ে দেবে এই সত্যিকারের আলো। জানবে, বুঝবে, মানবে। মনে মনে তো সবাই জানে, এই পথ গ্রহণ না করলে সবই হারাবে গোটা মানব-জাতি।'

'আমাদের পেপারে পড়লাম সিয়েরা লিয়োনের গ্রামগুলোতে কমে এসেছে জন্মগ্রহণের হার,' বললেন পরিচালক। 'এ সম্ভব হয়েছে শুধু আমাদের ক্লিনিকগুলোর জন্য।' এই সংগঠন নিয়মিত প্রকাশ করে চলেছে 'জন্মগ্রহণ হার' নামে একটি পত্রিকা।

নড করলেন ডিয়েটস। 'খ্রিস্টান ও মুসলিম মোল্লাদের কাছ থেকে, ধর্ম-মিথ্যা-নোংরামি থেকে বহু দূরে সরে মানুষের ভাল করছি আমরা। অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের বোঝাতে পারছি, বাচ্চা না নেয়ার উপায় রয়েছে। বাচ্চা না নিলে পেট ভরে খেতে পাবে। ওরা জানে চার্চের দেয়া ধর্মের উপদেশ বা সামান্য পয়সা বেঁচে থাকার জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়।'

'তবে ওই আর্টিকেলে লেখা হয়নি কীভাবে সবার জীবন

বদলে চলেছে। জানানো হয়নি সৌরজগতের ওদিকের অচেনা জগতের ওরা কীভাবে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। এ-ও বলা হয়নি কীভাবে পাল্টা জবাব দেব আমরা।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন ডিয়েট্স। 'ঠিকই বলেছেন, বলা হয়নি। আমাদের সৌরজগতের বাইরে যে ভিনগ্রহের বাসিন্দারা প্যারালাল ইউনিভার্সের, এ তথ্য জানাইনি অশিক্ষিতদের। জানতে চাইলেও যে বুঝবে, তা নয়। পরে আমাদের দর্শন ওদের জানানো হবে। আপাতত আমরা চাইছি কমে আসুক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার।'

কথাগুলো মেনে নিলেন পরিচালক, সফল এই দম্পতির উদ্দেশে শ্যাম্পেনের গ্লাস তুলে রওনা হয়ে গেলেন আরেক দিকে। একের পর এক বিখ্যাত লোক আসছে কেসলার দম্পতির দিকে, জানাতে চাইছে শুভেচ্ছা।

ফিসফিস করে স্বামীকে বললেন বার্থা, 'স্টিভ কিন্তু সত্যি ভাল মানুষ।'

'ওর শেষ ছায়াছবি থেকে এসেছে দুই শ' মিলিয়ন, তবে আমাদের ফাণ্ডে জমা পড়েছে মাত্র দুই লাখ ডলার।'

'আমি তাতিয়ানার সঙ্গে কথা বলব।' পরিচালকের নতুন স্ত্রী তাতিয়ানা, সে বার্থা কেসলারের ভক্ত।

কথা যেন শুনতেই পাননি ডিয়েটস, জ্যাকেটের পকেট থেকে বেরিয়ে এল সেল ফোন, ওটা থরথর করে কাঁপছে। ভাঁজ খুলে ডিসপ্লের দিকে চাইলেন, তারপর কথা শুনতে লাগলেন। পুরো এক মিনিট নিস্পৃহ রইল তাঁর গালের পেশি। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, ধন্যবাদ।' ফোন রেখে স্ত্রীর দিকে চাইলেন। বার্থার নীল চোখদুটো হাসছে। কণ্ঠের এগারো ক্যারেটের হীরার চেয়েও উজ্জ্বল হাসি। 'জ্যারোন ফোন করেছে,' নিচু স্বরে বললেন

ডিয়েটস। বাইরের কেউ শুনতে পেল না। 'একটু আগে একটা ফ্রেইটার রিপোর্ট করেছে, ওরা দেখেছে ওই ধ্বংসাবশেষ।'

'হায়, ঈশ্বর!'

'ওটাই যে গোল্ড অভ মার্স, ওরা নিশ্চিত হয়েছে একটা লাইফ বোট দেখে।'

বার্থার ডানহাত চলে গেল হীরার নেকলেসের উপর, ফ্যাকাসে হয়ে উঠল মুখ।

'কেউ বেঁচে নেই।'

বার্থার মুখে আবার ফুটে উঠল হাসি। চাপা স্বরে বলল, 'এ তো ভাল খবর। খুবই, খুবই ভাল খবর।'

যেন নতুন করে বেঁচে উঠেছে ডিয়েটস কেসলার, কাঁধ থেকে নেমে গেছে বিশাল এক পাথর। 'ডার্লিং, আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ, তারপর ঘটতে চলেছে সব। তোমার বাবা এবং আমরা যত কাজ করেছি, তার ফল মিলতে চলেছে। নতুন করে জন্ম নেবে এই পৃথিবী। এবার কোনও ভুল করব না আমরা।'

'ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের সম্পর্কে বলবেঃ পৃথিবীর সবচেয়ে মহান দুই মানুষ,' বলল বার্থা, নিজ হাতে তুলে নিল ডিয়েটসের বামহাত। একবারও ভাবল না, গোল্ড অভ মার্স জাহাজে ছিল সাত শ' অষ্টাশিজন নারী-শিশু ও পুরুষ। তাদের বেশিরভাগ ছিল তাদের সংগঠনের সদস্য, ছিল এই দম্পতির অন্ধ ভক্ত।

মানবজাতিকে উদ্ধারের জন্য, তাদের সার্বিক মঙ্গলের জন্য যে বিশাল আয়োজন করা হয়েছে, সেটা সফল করতে হলে কিছু লোককে তো আত্মবিসর্জন দিতেই হবে। সাত-আট শ' জনের মৃত্যু তো সেই তুলনায় ধরতে গেলে কিছুই নয়!

বারো

গোল্ড অভ মার্স তলিয়ে যাওয়ার পর ষোলো ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে রানার। যা ভেবেছিল, ঠিক তা-ই: বিসিআই চিফ ঘটনার কথা শুনেই বলেছেন রানা, তুমি আর সোহেল যদি কিছুদিনের ছুটি চাও, আমি গ্র্যাণ্ট করব। তোমরা চাইলে আমি পাপাগোপালাকে জানাতে পারি, আরও কিছুদিন জাহাজটা লাগবে তোমাদের।

যাক, অনুমতি পাওয়া গেছে, এখন সবার সঙ্গে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নেবে রানা।

ডাইনিং রুমে সবাই এসে পৌঁছুলে ঘোষণা দিয়েছে রানা, মিশন ইজরায়েল শেষ, এখন যে-কেউ চাইলেই দেশে ফিরে যেতে পারে। তাকে নামিয়ে দেয়া হবে কাছাকাছি বড় কোনও বন্দরে, সেখান থেকে বিমান যোগে ফিরতে পারবে সে নিজ দেশে। কিন্তু রাজি হলো না কেউই।

সবাই নিজ নিজ দেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা বলেছে, তাই নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিল তাদের মতামত আমরা থাকছি। এতগুলো মানুষকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে, আমরা খুঁজে বের করব সেই পিশাচগুলো কারা। মাফ নেই। এখন যদি দেশে ফিরি, নিজের কাছে ছোট হয়ে থাকব বাকি জীবন।

বিভিন্ন দেশের এজেন্টরা অবশ্য একটা কথাও বলেনি।

জুনিয়াররা বুঝে নিয়েছে, ওঁরা মাসুদ ভাইয়ের পাশে থাকবেন। দরকার পড়লে নরক পর্যন্ত ধাওয়া করা হবে ওই খুনিদের।

দুপুরে খাওয়ার পর রানা বলেছে, 'আমরা কোনও দেশের হয়ে কাজ করছি না। ধরে নাও, এখন থেকে যা করব, সব মানবতার খাতিরে। টাকার লোভে নয়, এ কাজ করব আমরা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য।'

সবার মতামত জেনে নিয়ে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এসেছে রানা, চলে এসেছে উপরের নকল ব্রিজে। বামদিকে বহু দূরে দেখা যাচ্ছে মিশরের উপকূল। পশ্চিমের আকাশে বালি-ঝড়ের আলামত স্পষ্ট। তাপমাত্রা উঠেছে আশি ডিগ্রির বেশি। তবে হালকা বাতাস বইছে সাগরে। কোনাকুনি উত্তর দিকে রওনা হয়েছে মার্ভেল। জাহাজ নিয়ে গ্রিসের দিকে চলেছে গগল।

তারও অনেক পরে ব্রিজে এসে ঢুকল ডক্টর ফারা, মুখে ক্লান্তির ছাপ। 'তোমাকে খুঁজছি,' বলল। 'এখানে বসে কী করছ?'

মন ভারী হয়ে আছে, জবাব দিল না রানা। পাল্টা জানতে চাইল, 'বোধহয় হেলেনের ব্যাপারে কিছু বলবে?'

'ও ভালই আছে,' ধপ করে পাশের চেয়ারে বসল ফারা। 'যদি কাল সকালে সুস্থ দেখি, ওকে ছেড়ে দেব। তোমার কী অবস্থা?'

'ভালই তো। আরেকবার শাওয়ার নিলে পুরোপুরি তরতাজা হয়ে উঠব।' সামনের ফাটা টেবিলের উপর অতি পুরনো এক চার্ট, ছুতোরের সি-ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকে রেখেছে রানা। মার্ভেলে এসব রেখেছে এ জাহাজ বহু পুরনো সেটা প্রমাণের জন্য। কোনও বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্ করে সন্দেহ করবে না মার্ভেল নতুন জাহাজ, ভিতরে রয়েছে অত্যাধুনিক ইকুইপমেণ্ট বা অস্ত্র। 'ওর

কাছ থেকে নতুন কিছু জানলে?'

'তেমন কিছু না। আমরা এখন পর্যন্ত যা জেনেছি, সেগুলো লিখছে উর্বশী। বলেছে, কাজ শেষ হবে একটু পর।'

রিস্টওয়াচের দিকে চাইল রানা, তবে খেয়াল করল না সময়। 'আমার মনে হয় না আপাতত জরুরি কোনও তথ্য পাব।'

'অনিল ও ফু-চুঙের কাজে সাহায্য করছে জলিল আর কাশেম, মনে হলো অতি উৎসাহী।'

'কারণটা আন্দাজ করছি। ওরা নিজেদের গোয়েন্দাগিরি দেখিয়ে মুগ্ধ করতে চাইছে হেলেনকে।'

'তাতে ক্ষতি নেই।'

'তা নেই। বাচ্চাদের মত করছে দুজন এক্সপার্ট কমাণ্ডো।'

প্রাচীন একটা ইন্টারকম রয়েছে বাল্কহেডের উপর, বেজে উঠল ওটা। ঠিক যেন যক্ষ্মা রোগীর কাশি: হওফ্-হুওফ্-হউউফ্!

'রানা, উর্বশী বলছি।'

থাবা দিয়ে টক বাটন দাবাল রানা। 'বলো, উর্বশী।'

'বোর্ডরুমে মিটিঙের জন্য আমরা তৈরি। গগল, ফু-চুং, অনিল আর আতাসি পৌঁচেছে। সোহেল আসছে। ফারাকে পেলাম না। চলে এসো তুমি।'

'ফারা আমার সঙ্গে। আসছি।'

ছোট হাত দুটো ল্যাব কোটের ভিতর ঢোকাল ফারা, তারপর ঢুকে পড়ল এলিভেটরে। সরাসরি নামবে অপারেশন্স সেণ্টারে, সেখান থেকে সহজে বোর্ডরুমে। ও অপেক্ষা করছে রানা এলিভেটরে এসে ঢুকবে।

'তুমি যাও, আমি একটু পরে আসছি,' বলল রানা। ব্রিজ উইঙে গিয়ে দাঁড়াল, হাওয়ার জোর বেড়েছে, উড়িয়ে নিতে চাইছে হালকা সুতির শার্ট। ডুবে গেছে সূর্য। আকাশে একে

একে ফুটছে লাল-নীল তারা। বড় করে শ্বাস নিল রানা, চাইল সাগরের দিকে। চেপে রেখেছে তিক্ত অনুভূতি। সবসময় ওকে টেনেছে সাগর-পাহাড়-মরুভূমি। সামনের মস্ত ঢেউ বা বালির উঁচু ঢিবির ওপারে কী, জানতে চেয়েছে। সবসময় এগিয়ে যাওয়ার এক নেশা, যেতে যেতে দূর থেকে দূরে অসংখ্য রহস্য টেনে নিয়েছে ওকে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। এখন টানছে সাত শ' মানুষের হত্যারহস্য।

রানা জানে না কেন গোল্ড অভ মার্সে মরতে হলো এতগুলো মানুষকে। ও শুধু জানে, ভয়ানক অন্যায় হয়েছে তাদের উপর। এই অবিচারকে রুখতে হবে। উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে অপরাধীদের। মার্ভেলের ক্রু থেকে শুরু করে সবাই এটা অনুভব করছে। সোহেল-অনিল-ফু-চুং-গগল-উর্বশী-আতাসি-স্বর্ণা-জলিল-কাশেম—সবাই ওরা ওই প্রমোদ-তরী ও ওটার হতভাগা যাত্রীদের বিষয়ে যে যেভাবে পারে জোগাড় করছে তথ্য-উপাত্ত। কিছুক্ষণ পর তৈরি হবে পরিকল্পনা। তারপর কাজে নামবে ওরা, সামরিক অভিযানের মত হবে ওটা। এ কাজে দুনিয়ার সেরাদের অন্যতম ওরা। শীতল রেলিঙে দু'হাত রাখল রানা। মনের ভিতর গুছিয়ে নিল অগোছালো ভাবনা একটু পর ব্রিফিং। সবাই পরিষ্কার ভাবে নিজেদের বক্তব্য জানাবে। এরপর মন থেকে বিদায় নেবে রাগ ও ঘৃণা, থাকবে শুধু কর্তব্যবোধ। যারা শত শত মানুষ হত্যা করল, খুঁজে বের করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেবে ওরা।

একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, তারপর ঘুরে রওনা হলো এলিভেটরের দিকে। বিড়বিড় করে বলল, 'এর বেশি আর কী করতে পারি আমরা। তোমাদের জীবন তো আর ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। যারা এখনও ওদের শিকারে পরিণত হয়নি, হয়তো

তারা বাঁচবে।'

কনফারেন্স রুমে ঢুকে ওর জন্য নির্দিষ্ট একটা চেয়ারে গিয়ে বসল ও। বাতাসে ভাসছে ঝাল-ঝাল সুঘ্রাণ। বাবুর্চি মোস্তফা আবুল হাজির করেছে ইথিয়োপিয়ান ডিশ। ইনজেরা—টক দই ও ময়দার রুটি, সঙ্গে ডজনখানেক নানা পদের সস্। কোনওটা ঠাণ্ডা, আবার কোনওটা আগুনের মত গরম, আর তেমনি ঝাল। টেবিলের মাঝে রেখেছে মুরগি, গরু ও খাসির মাংসের স্টু। সঙ্গে শাক-সব্জি ও চিকপি। শেষে ঝাল দেয়া দই। এগুলো খাওয়ার নিয়ম, চট্ করে ছিঁড়ে নিতে হবে রুটি, তার উপর ঢালতে হবে স্টু, এবার চুরুটের মত রুটি মুড়িয়ে নিয়ে কয়েক কামড়ে শেষ করতে হবে। দ্রুত না খেলে এবং সতর্ক না থাকলে নষ্ট হবে খাদকের জামাকাপড়। খাওয়া শেষে দেয়া হয় হলুদ বোতল থেকে ইথিয়োপিয়ান তেজ। এই ওয়াইন তৈরি করা হয় মধু দিয়ে। মিষ্টি সুবাস, ওই তেজ মেরে দেয় মুখের ঝালকে।

খেতে বসে টেবিলের চার পাশ দেখে নিল রানা।

সোহেল-গগল-ফু-চুং-অনিল-উর্বশী-ফারা—সবাই আছে।

হাজির জুনিয়ররাও। যে যার কাজ ভাগ করে নেবে।

মাত্র এক টুকরো রুটি নিল রানা। খিদে নষ্ট হয়ে গেছে। রুটি শেষ হলে বোতল থেকে ঢেলে নিল তেজ। একটু একটু করে চুমুক দিল।

পনেরো মিনিট পর শেষ হলো সবার খাওয়া। এবার মিটিং শুরু করল রানা।

'তোমরা সবাই জানো, দুটো কাজ এখন আমাদের সামনে। একটা আরেকটার সঙ্গে জড়িত। আমাদের প্রথম কাজ উর্বশীর ভাইকে রেসপন্সিভিস্টদের আস্তানা থেকে উদ্ধার করা। স্যাটালাইট ইমেজ ও অন্যান্য তথ্য যোগাড় করেছে অনিল ও ফু-

চুং। কমাণ্ডো স্বর্ণা. জলিল ও কাশেম নিজেদের দলকে নিয়ে তৈরি করছে ট্যাকটিকাল অ্যাসল্ট প্ল্যান। ওদের পরিকল্পনা শেষে আমরা বুঝে নেব, কোথাও কোনও ভুল রইল কি না। এবার নিজেদের ঠিক করে নিতে হবে অমলকে হাতে পাওয়ার পর কী করব।'

'ওকে কি ডিপ্রোগ্রাম করতে হবে?' জানতে চাইল ফারা। ভাবছে, সত্যিই বিশেষজ্ঞ সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে ছেলেটাকে? হতেও পারে! হয়তো রেসপন্সিভিজমের খপ্পর থেকে বের করতে হবে ওকে।

'হ্যাঁ, সেরকমই মনে হয়,' বলল অনিল।

'তা হলে ওরা কি সত্যি কোনও কাল্ট?' ভারী শোনাল উর্বশীর কণ্ঠ। নিজের একমাত্র ভাই সঠিক নির্দেশনাহীন এক বখাটে, ভাবতে গিয়ে টনটন করে উঠল ওর বুক।

'যে-কোনও কাল্ট যা করে, তার সবই করছে ওরা,' বলল ফু-চুং। 'ওদের চালিয়ে নিয়ে চলেছে কারিশম্যাটিক নেতা-নেত্রীরা। যারা এই সংগঠনের নয়, তাদেরকে বিনা দ্বিধায় পরিত্যাগ করছে সংঘের সদস্যরা। এমন কী আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদেরও। কঠোর কিছু নিয়ম মেনে চলছে তারা। লিঙ্ক চ্যাপেলের জারি করা নির্দেশ রয়েছে কেউ যদি পথভ্রষ্ট হয়, তাকে জোর করে হলেও ফিরিয়ে নিয়ে আসবে অন্য সদস্যরা।'

'ফিরিয়ে নিয়ে যায় কী করে?' জানতে চাইল রানা। 'মানসিক ভাবে চাপ সৃষ্টি করে?'

আস্তে করে মাথা দোলাল অনিল। 'এমনও ঘটেছে কেউ সরে যেতে চেয়েছে, কিন্তু তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে বাড়ি থেকে। অন্য সদস্যরা ফিরিয়ে নিয়ে গেছে তাদের ফ্যাসিলিটিতে। নতুন করে দীক্ষা দেয়া হয়েছে আবার।'

'গ্রিসের ওই ফ্যাসিলিটির কথা আমরা জানি.' টেবিলের চারপাশের সবার দিকে একবার চেয়ে নিল রানা 'এদের হেডকোয়ার্টার ছিল ক্যালিফোর্নিয়ায়। তারপর সরিয়ে আনা হয় গ্রিসে। বিকেলে ওই দুই হেডকোয়ার্টারের ছবি আমাকে দেখিয়েছে অনিল। এদের অন্য ফ্যাসিলিটিগুলোতে কী আছে?'

'ওদের আছে পঞ্চাশটার বেশি ক্লিনিক,' বলল অনিল। 'তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে খুলেছে একটা করে। সিয়েরা লিয়োন, টোগো, আলবেনিয়া, হাইতি, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ক্যাম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স... এমন কী চিনেও রয়েছে এদের ক্লিনিক। এসব দেশের সরকারের কাছ থেকেও পর্যাপ্ত সহায়তা পেয়ে আসছে।'

'জেনে অবাক হয়েছি,' বলল ফু-চুং। 'আমি জানি চিনের সরকার মন থেকে ঘৃণা করে কাল্ট। সরকারী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীগুলো সর্বক্ষণ লড়ে চলেছে ফালুং গঙের বিরুদ্ধে। কিন্তু এখন সরকারের কেন্দ্র থেকে অনুমতি দেয়া হয়েছে রেসপন্সিভিস্টদের। ভাবছে ওরা হয়তো জনসংখ্যা কমিয়ে আনার কাজ করবে।'

'এবার দেখা যাক কীভাবে অমলকে সাহায্য করা যায়,' বলল রানা। 'আমরা কোনও ডিপ্রোগ্রামারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি?'

'হ্যাঁ,' বলল গগল। মৃদু হাসল উর্বশীর দিকে চেয়ে।

'বলতে গেলে কিডন্যাপ করতে চলেছি আমরা অমলকে,' বলল অনিল। 'কাজেই যতদ্রুত সম্ভব ওকে গ্রিস থেকে সরিয়ে নিতে হবে। আমরা চাই না স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে কোনও বিবাদে জড়াতে।' গগলের দিকে চাইল অনিল।

'একজন কাউন্সেলার রোমে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন.'

শুরু করল গগল। 'তোমরা জানো একটা গালফ-স্ট্রিম জেট প্লেন তৈরি থাকবে। ওটা রিভিয়েরা থেকে নামবে এথেন্স এয়ারপোর্টে। তারপর অমলকে নিয়ে যাবে ইতালিতে। কলোসিয়ামের কাছে একটা হোটেলে সুইট বুক করেছি। ওই ডিপ্রোগ্রামারের নাম লিয়োনার্দো চার্চ। তিনি বিশেষ করে রেসপন্সিভিস্টদের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। তাঁর কারণে মোহমুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পেরেছে অনেকে। এই বিষয়ে তিনিই বর্তমান দুনিয়ার সেরা কাউন্সেলার।'

'নিজে আগে রেসপন্সিভিস্ট ছিলেন?' জানতে চাইল রানা। অনেকেই রয়েছেন যাঁরা আগে কোনও কাল্টের সঙ্গে ছিলেন। পরে হয়ে উঠেছেন ডিপ্রোগ্রামার। এখন উল্টো লড়াই করছেন ওই কাল্টের বিরুদ্ধে। প্রায়ই এমন হয়: নেশাখোর মাদক ছেড়ে দিয়ে নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়ে মাদকাসক্তদের নেশা ছাড়াতে। এরাই হয় দক্ষ কাউন্সেলার।

'তা ছিলেন না,' বলল অনিল। 'তবে এঁর জীবনের একমাত্র ব্রত ওই গোষ্ঠীকে বিলীন করা। উনি আড়াই শ'র বেশি লোককে চিকিৎসা দিয়েছেন। এরা গত দশ বছরে রেসপন্সিভিজম থেকে সরে গেছে।'

'উনি তার আগে কী ছিলেন?'

'ছিলেন লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতেন। ফী দেখে চমকে উঠবে বেশিরভাগ মানুষ। বিশ হাজার ডলার ফী, সঙ্গে অন্যান্য খরচপাতি তো আছেই। তবে আশা করা যায়, তাঁর কাজ শেষে স্বাভাবিক-সুস্থ জীবনে ফিরবে অমল।'

'ভাল হলেই ভাল, নইলে জবাব দিতে হবে তার আমার কাছে,' ভুরু কুঁচকে উঠল উর্বশীর।

'এক লোক জীবিকা নির্বাহ করছে মানুষকে ডিপ্রোগ্রামিং

করে, তার মানে ওই গোষ্ঠী যথেষ্ট বড়,' বলল আতাসি। 'ওদের সদস্য কত?'

'অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের বক্তব্য অনুযায়ী ওদের সদস্য এক লাখের বেশি,' বলল অনিল। 'এদিকে লিয়োনার্দো চার্চের সাইটে লিখেছে, ওই সংগঠনের সদস্য-সংখ্যা আন্দাজ পঞ্চাশ হাজার মত। যাই হোক, ওদের আছে হাজারে হাজারে সদস্য। সঙ্গে রয়েছে নামীদামি কিছু হলিউডি সেলিব্রেটি। এসব তারকাদের কারণে হুড়মুড় করে রেসপন্সিভিস্টদের সংগঠনে ভিড় করছে সাধারণ মানুষ।'

'ধর্, চার্চের সঙ্গে দেখা করলাম, কী হবে আমার কাভার স্টোরি?' জানতে চাইল রানা।

'আমার রিপোর্টে সব লিখেছি,' বাইণ্ডার তুলে দেখাল সোহেল। 'উর্বশী রিয়াল-এস্টেট ডেভেলাপার, লস এঞ্জেলেস থেকে এসেছে। ওর ভাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। আমরা একটা প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানি। উর্বশী আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, কাজেই সঙ্গে গেছে ফু-চুং, সব ধরনের কোঅর্ডিনেট করবে। আমি যখন চার্চের অ্যাসিস্ট্যাণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম, মনে হলো না অবাক হয়েছে। আগেও এ ধরনের কাজ নিয়েছে তারা।'

'বেশ, আমাদের কাজ অমলকে ছিনিয়ে নিয়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেয়া। গালফ-স্ট্রিম জেট তৈরি থাকবে, নিয়ে যাবে ওকে রোমে।' চট্ করে আরেকটা কথা মনে পড়ল রানার। 'অমলের পাসপোর্ট বোধহয় নিয়ে নিয়েছে রেপন্সিভিস্টরা, ওর নতুন একটা দরকার পড়বে।'

'ওটা কোনও সমস্যা নয়,' বলল সোহেল। 'উর্বশীর মা ই-মেইলে অমলের ছবি পাঠিয়েছেন। আমাদের কাছে খালি

পাসপোর্ট আছে, নতুন একটা তৈরি করে দেবে মোফিজ বিল্লাহ।'

'এবার আসা যাক দুই নম্বর সমস্যায়,' বলল রানা। 'গোল্ড অভ মার্সে কী ঘটেছে? এবং কেন? আমরা এ বিষয়ে কতটুকু জেনেছি?'

ল্যাপটপের চাবি টিপতে শুরু করেছে অনিল, স্ক্রিনে ফুটে উঠল তথ্য। 'গোল্ড অভ মার্সের সিস্টার শিপ রয়েছে। ডায়মণ্ড ক্রুজ লাইন্সের আরও দুটো জাহাজঃ পার্ল অভ মুন ও ডায়মণ্ড অভ নেপচুন। এই কোম্পানির অফিস ডেনমার্কে। ব্যবসা করছে আশির দশক থেকে। আর সব ক্রুজ লাইন্সের মত এদের রয়েছে ক্যারিবিয়ান, মেডিটারেনিয়ান ও দক্ষিণ সাগরে প্রমোদতরী। কোনও দল বিশেষ কোনও উৎসবে ভাড়া নেয় জাহাজ।

'চার মাস আগে এই কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হয় রেসপন্সিভিস্ট সংগঠনের। ঠিক হয় ফিলিপিন্স থেকে পাঁচ শ' চব্বিশজন রেসপন্সিভিস্টকে পৌঁছে দিতে হবে গ্রিসে। সেই সময় একটা মাত্র জাহাজ পাওয়া যায়, সেটা গোল্ড অভ মার্স।'

'মনে হয় বহু লোক লাগে ওসব ক্লিনিকে,' মন্তব্য করল রানা।

'আমারও তাই মনে হয়েছে,' বলল অনিল। 'কাজেই কাদা খুঁড়তে শুরু করেছি। রেসপন্সিভিস্টদের ওয়েব সাইটে ওই ভ্রমণ সম্পর্কে কিছু নেই। ওই সংগঠন থেকে জানানো হয়নি এত লোক সরিয়ে নেয়া হবে ফিলিপিন্স থেকে। ...আরও আছে...'

'বলতে থাক,' বলল রানা।

'ফু-চুঙের নিয়ে আসা লগ অনুযায়ী এরা ম্যানিলা ছেড়েছে সতেরো তারিখে। কোনও ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেনি। সব ছিল স্বাভাবিক।'

'মানুষগুলো সব মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত,' বলল সোহেল।

কাঁধ ঝাঁকাল অনিল। 'সবাই মরেনি। ইউএভির কম্পিউটারের ডিস্ক খুঁজে দেখেছি। যখন জাহাজের উপর ঘুরছে খুদে বিমান, তখন অন্য কিছু দেখেছে। গোল্ড অভ মার্সের একটা লাইফ বোট কম ছিল।' রানার দিকে চাইল অনিল, মুখটা আরক্তিম। 'গতকাল এটা খেয়াল করিনি।'

'হতেই পারে, আপনারা ব্যস্ত ছিলেন হাসপাতাল থেকে মানুষ উদ্ধার করার কাজে,' সান্ত্বনা দিল আতাসি।

ফারা গম্ভীর হয়ে অন্য দিকে চাইল।

'জাহাজের কম্পিউটারের লগ অনুযায়ী, আমরা ওখানে পৌঁছুবার আট ঘণ্টা আগে সাগরে নামানো হয় ওই লাইফ বোট।'

'তার মানে খুনি বা খুনিরা ক্রুজে পুরো সময় জুড়ে ছিল?'

'তাই তো মনে হয়। ফু-চুং আর আমি ক্রুজ লাইন্সের কম্পিউটার হ্যাক করেছি। ওদের যাত্রী ম্যানিফেস্ট ও ক্রুদের লিস্ট পেয়েছি। কিন্তু জানার উপায় নেই ওই জাহাজে কতজন মারা গেছে। জাহাজ তলিয়ে না গেলে জানা যেত কারা খুনি।' সবার পরের প্রশ্নের জবাব জানিয়ে দিল অনিল, 'পুরো লিস্ট খুঁজে দেখেছি। এ যাত্রায় কোনও ক্রুকে সরিয়ে দেয়া হয়নি। নতুন কেউ যোগও দেয়নি। নতুন করে বাদ পড়েনি বা যোগ হয়নি কোনও যাত্রী। সব ছিল স্বাভাবিক। যাদের থাকবার কথা, তারাই ছিল জাহাজে।'

'তা হলে মানুষগুলোকে খুন করল কে?' জানতে চাইল ফারা।

'যদি আন্দাজ করতে হয়, আমি বলব, নিজেরাই নিজেদের শেষ করেছে রেসপন্সিভিস্টরা। তবে এরা জিম জোন্সের

জনগণের মন্দির, বা জাপানের ওউম শিনরিকিয়োর কাল্টের মত নয়। অনেকে বলে অতিরিক্ত রেসপন্সিভিজম দেখাতে গিয়ে মরেছে লিঙ্ক চ্যাপেল। তবে এই দল আত্মহত্যাকে সমর্থন করে না। এরা বলে, যেহেতু তুমি পৃথিবীতে চলে এসেছ, তোমার দায়িত্ব এই বিশ্বাসকে ছড়িয়ে দেয়া, নিজেকে শেষ না করা। ...অন্য কিছুও হতে পারে, হয়তো তাদের ভিতর ঢুকে পড়ে শত্রুরা।'

'কাউকে সন্দেহ হয়?'

উর্বশী বলল, 'ওরা যেহেতু জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ও সন্তান ফেলে দেয়ার ব্যাপারে অবস্থান নিয়েছে, সেহেতু কয়েক বছর ধরেই ভ্যাটিকানের সঙ্গে লড়ছে। বেশ কিছু খ্রিস্টান অর্গানাইজেশন রেসপন্সিভিস্টদের বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'এক উন্মাদ খুন করল কোনও অ্যাবোর্শন ডাক্তারকে, এটা হতে পারে। কিন্তু এত মানুষকে খুন করা... এটা হাইলি অর্গানাইযড এবং ওয়েল ফাণ্ডেড টিমের কাজ। কয়েকজন পাদ্রী বা নান ঢুকে পড়বে শক্তিশালী কোনও কাল্টে, খুন করবে শত শত মানুষকে, এটা হয়?'

'এরা বোধহয় একদল যিলট*,' বলল আতাসি। 'রেসপন্সিভিস্টদের কাউণ্টার কাল্ট। হয়তো আগে এ সংগঠনের সদস্য ছিল। ...রেসপন্সিভিস্টরা কেবল জন্মনিয়ন্ত্রণ না, আমার ধারণা আরও গূঢ় কোনও ব্যাপারে জড়িত!'

'বলতে থাকো, আতাসি,' উৎসাহ দিল রানা।

* zealots. এরা একদল বিদ্রোহী ইহুদি, লড়াই করে প্রাচীন রোমানদের বিরুদ্ধে।

লেবানিজ ইন্টেলিজেন্সের এই এজেন্ট পারতপক্ষে মুখ খোলে না, কিন্তু মাথায় রাখে তুখোড় বুদ্ধি। হয়তো বেরিয়ে আসবে নতুন কোনও দৃষ্টিভঙ্গি। 'বস্, কখনও মেমব্রেন থিওরির কথা শুনেছেন?'

'না শোনার মতই।'

'জিনিসটা বিদঘুটে। ঠিক বোঝাতে পারব না।' অন্যদের দিকে চাইল আতাসি। 'আপনারা কেউ বোঝাতে পারেন?'

মাথা দোলাল ফু-চুং। 'আইনস্টাইন ইউনিভার্সের যে চারটি শক্তিকে গুছিয়ে বলতে পারেননি, সেটা এক কথায়—আমাদের চারমাত্রিক বিশ্ব। এটাতে রয়েছে একটি মাত্র মেমব্রেন। কিন্তু এই ইউনিভার্সেরই অন্য ডাইমেনশনে আরও কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে। সেগুলো আমাদের এতই কাছে যে যিরো-পয়েন্ট ম্যাটার ও এনার্জি সেগুলোর ভিতর দিয়ে বইছে। এবং আমাদের এই ইউনিভার্সের মাধ্যাকর্ষণের শক্তি সেই ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। খুবই প্যাঁচালো ব্যাপার। এর ফলাফল নিয়ে ভাবছে মস্ত সব পদার্থ বিজ্ঞানী।'

'তোর সব কথা মেনে নিলাম,' গম্ভীর স্বরে বলল রানা।

'তা ছাড়া উপায় কী?' খুকখুক করে কাশল সোহেল। 'কে-ই বা বুঝবে এই মাল! ফু-চুং ওর চৈনিক মগজ দিয়ে বোম-বোম জিনিস ঝাড়ছে!'

এই দুই বন্ধুর বিমর্ষ চেহারা দেখে হেসে ফেলল ফারা।

'আরও কিছু বলবি?' করুণ স্বরে জানতে চাইল সোহেল। ভাব দেখে মনে হয় মাস্টারের পড়া তৈরি না করে শাস্তি পেয়েছে।

'আমি কিন্তু এখনও শুরু করিনি,' বলল ফু-চুং। 'এই মেমব্রেন থিওরি নব্বুই দশকে টেনেছে থিওরেটিকাল

ফিযিসিস্টদের। আর ওই রেসপন্সিভিজমের প্রণেতা লিঙ্ক চ্যাপেল ব্যাপারটাকে আরও এগিয়ে নিল। তার ধারণা, আমাদের এই ইউনিভার্স থেকে শুধু কোয়ান্টাম পার্টিকেলই আসা-যাওয়া করছে না, আরও বেশি কিছু ঘটছে। ফোর্থ ডাইমেনশন থেকে সেই ফাঁক গলে চলে আসছে অপার্থিব ইন্টেলিজেন্স: ভিন্ন ইউনিভার্সের অচিন গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণী প্রভাব বিস্তার করে নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদের দৈনন্দিন জীবন। প্রতিনিয়ত আমাদেরকে তাদের ইচ্ছেমত চালাবার চেষ্টা করছে ওরা, কিন্তু আমরা টের পাই না। আমাদের সব কষ্ট-যাতনার মূলে ওই বিজাতীয় প্রাণী। ভদ্রলোক মারা যাওয়ার কিছু দিন আগে শিষ্যদের শেখাতে লাগল, কী করে কমিয়ে আনা যায় তাদের প্রভাব, কীভাবে উদ্ধার মিলবে ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীর কবল থেকে।'

'আর ওই বস্তা-পচা মাল বেমালুম গিলল কেউ?' তিক্ত হাসল উর্বশী। রেগে গেছে। ওর ভাইটা আস্ত গাধা, না কী?

'হ্যাঁ, মানুষ ওই থিওরি লুফে নিল। যারা দুর্বল, বিশ্বাস রাখল ওটার উপর। বিশ্বাস রাখলে নিজের মনের জোর বাড়ে, অনেক লাভ হয়। ধরা যাক, এক লোকের কপাল খুলছে না, মন খারাপ, একের পর ভুল করছে, কষ্টেসৃষ্টে জীবন চলছে—তার মানে এসব ঘটছে শুধু ওই অনেক দূরের এক মেমব্রেনের কারণে। আমি প্রমোশন পেলাম না ওই ভিনগ্রহের প্রাণীর কারণে! প্রেমের সম্পর্ক ভাঙল, ওই কসমিক শক্তি বারোটা বাজিয়েছে আমার প্রেমের! ...আসল কথা, আমার নিজের দোষে কিছু ঘটছে না। যদি এভাবে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয়া যায়, নিজের কোনও দায়-দায়িত্ব থাকে না। রেসপন্সিভিজম জুগিয়ে দিয়েছে জুতসই, এই শক্তিশালী যুক্তি—এই

দারিদ্র্যপীড়িত জীবনযাত্রা ভাল চলছে না, এ আমার নিজের কারণে নয়. এই সব ঘটছে শুধু নিয়তি বা ওই মের্মব্রেনের শয়তানির জন্য।'

'ফাস্ট-ফুডের কোম্পানিগুলোর নামে আদালতে মামলা করছে মানুষ, কারণ তারা ওদের বেশি বেশি খাইয়ে মোটা করে তুলছে,' আস্তে করে মাথা দোলাল রানা, 'এখানে মোটিভেশনটা বুঝতে পারি। ভাবছে, মামলায় জিতলে অনেক টাকা পেয়ে যাবে। কিন্তু কোনও লোক একটা জাহাজ তলিয়ে দিল, তার আগে খুন করল শত শত মানুষকে, কীসের মোটিভেশন?'

'এমনও হতে পারে এই মানুষগুলো কাল্ট থেকে বেরিয়ে যেতে চেয়েছে,' বলল ফু-চুং। 'কাজেই উল্টোপাল্টা করলে কী ঘটবে সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছে গোষ্ঠীর নেতারা। অনিল তো আগেই বলেছে, এরা এমন কী কিডন্যাপও করতে পারে। তার পরের ধাপ কিন্তু খুন, হয়তো ঠিক তা-ই করেছে ওরা!'

ভাইয়ের কথা ভেবে একটু চমকে গেল উর্বশী।

'হতে পারে,' বলল অনিল। একবার উর্বশীর দিকে চাইল। 'অমল ভ্রান্ত, ভ্রষ্ট নীতি গ্রহণ করেছে, ওদের কাছ থেকে সরে যেতে চাইছে না। কিন্তু ওকে সরিয়ে আনতে গেলে কী ঘটতে পারে, সেটা আমাদের বুঝে নিতে হবে। ...তোমার সামনে এ নিয়ে আলাপ করতে চাইনি, উর্বশী, তবে...'

'উর্বশী, তুমি এই মিটিং বাদ দিয়ে কেবিনে ফিরতে পারো,' নরম স্বরে বলল রানা।

'না, আমি থাকব,' জেদ প্রকাশ পেল উর্বশীর কণ্ঠে। 'আমার ভাইয়ের বিষয়টা আমাকে বিব্রত করছে, সেই সঙ্গে কষ্টও লাগছে। ওর সঙ্গে জড়িত যে-কোনও বিষয় আমার জানা উচিত। ...কী বলব... মন বলছে, উচিত ছিল ওকে অনেক বেশি সময়

দেয়া। তা পারিনি আমি। নইলে এমন বখাটে হতো না। যদি আরও অনেক ভাল বোন হতাম, ও চলে যেত না ভুল পথে।'

উর্বশীর কথাগুলো হাহাকারের মত মিলিয়ে গেল বাতাসে, ঘরের পরিবেশ থমথম করছে। গগল কঠোর মানুষ, যা বলে সরাসরি বলে। কাউকে ছাড় দেয় না। আধ মিনিট পর মুখ খুলল সে. 'উর্বশী. আমি বড় হয়েছি খুব বিশ্রী পরিবেশে আমার বাবা ছিল মাতাল। প্রায় রাতেই পেটাত আমাকে, আমার মাকে। লোকটা যখনই ভোদকার বোতল কিনতে পারত, বেহেড মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরে পেটাত আমাদের। কচি বয়সে কত দুঃসহ হতে পারে জীবন, আমি দেখেছি। আমার মা একরাতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল। আমি বেরিয়ে এলাম ওই বস্তি থেকে। আর কখনও ফিরিনি। এরপর একদিন শুনলাম ওই লোকের গলা ফাঁক করে দিয়েছে এক পতিতা। সে তো মরল, কিন্তু আমার মনে কোনও কষ্ট রইল না। রাস্তায় রাস্তায় থেকেছি। নিউজ পেপারের হকার হয়েছি। মানুষের জুতো কালি করেছি। আরও কত কী—কিন্তু লেখাপড়া চালিয়ে গেছি। বড় হতে হবে আমাকে! ...একটা কথা উর্বশী. মানুষের পারিবারিক জীবন আসল, ওটা নিয়ন্ত্রণ করে সবার জীবনকে। তুমি নিজেকে গড়ে তুলেছ, চাইলে যেতে পারতে খারাপ পথে—তা যাওনি। তুমি যদি বাড়িতে বেশি সময় দিতে, হয়তো তোমার ভাই অনেক কিছু শিখত। কিন্তু, তা না-ও হতে পারত। কী হতো বা কী হতো না, নিশ্চিত হয়ে বলবে কে? এ হিসাব কারও মেলে না। মূল কথা: অমল যা চেয়েছে, ও তা-ই হয়েছে। ...এ নিয়ে নিজেকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।'

গগল সম্বন্ধে এ তথ্য রানা ছাড়া কেউ জানত না, চোখ নিচু করে হাতের দিকে চেয়ে রইল উর্বশী।

কিছুক্ষণ পর গগল বলল, 'ফু-চুঙের থিওরি নিয়ে অন্য কারও মতামত?' আর্মস ডিলার চাইছে ঘরের পরিবেশ স্বাভাবিক হোক।

'আমরা রেসপন্সিভিস্টদের কম্পিউটার সিস্টেমে হ্যাক করতে পারি,' বলল অনিল। 'নতুন কিছু বেরিয়ে আসতে পারে। তবে খুব একটা এগুতে পারব না সদস্য লিস্ট পেলে। তাদের কে ভাল আর কে মন্দ, নিশ্চয়ই লিখে রাখেনি।'

'তবুও চেষ্টা করে দ্যাখ,' বলল রানা। আলোচনা শুরু হওয়ায় মনে মনে হাঁফ ছেড়েছে। 'এরা যা করছে সেসবের সঙ্গে ক্রস রেফারেন্স কর যাত্রীদের ম্যানিফেস্টকে। বেরিয়ে আসতে পারে জরুরি তথ্য। ওই লোকগুলো যদি কাল্ট থেকে বেরিয়ে না গিয়ে থাকে, তো অন্য কিছু ঘটেছে।' ঘড়ি দেখল রানা। 'একটা ব্যাপার জানা দরকার—ফিলিপিন্স-এ রেসপন্সিভিস্টদের এত লোক কেন ছিল? এর জবাব পেলে হয়তো মিলবে জোরালো ক্লু।'

মুখে বলল না মিটিং শেষ, চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল রানা। 'আপাতত আমার ছুটি। গগল, কারও সন্দেহ না জাগিয়ে এগুতে থাকো গ্রিসের দিকে। পানিতে ভরে নাও ট্যাঙ্ক। কালো ধোঁয়া তোলো চিমনি দিয়ে। ডেকে অস্বাভাবিক কিছু না থাকলেই হলো। সবার বিশ্রাম শেষ হলে জলিলদের সঙ্গে আলাপ সারব। অমলকে বের করে আনার প্ল্যান চূড়ান্ত হবে তখন।'

ঠিক করেছে রানা, আগামী দু'দিনের ভিতর ছেলেটাকে তুলে দেবে ডিপ্রোগ্রামারের হাতে। এরপর সোজা রিভিয়েরা। কান-পাতার কাজ শেষে, ওদের সত্যিকারের ছুটি। সেই ছুটির ভিতর খুঁজে বের করতে হবে হতভাগ্য মানুষগুলোর হত্যাকারীদের!

তেরো

কানের ভিতর রেডিও ইয়ারবাড ভাল করে গুঁজে নিল রানা, টোকা দিল থ্রোট মাইকে। সবাই বুঝে নেবে, ও পৌঁছে গেছে ঠিক জায়গায়। নীচের প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডে ছড়ানো-ছিটানো দালানগুলো সিমেন্টের ব্লক দিয়ে তৈরি সাদা রঙ করা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। কম্পাউণ্ডের পিছনে পাথুরে সৈকত। ওখান থেকে এক শ' ফুট গেছে কাঠের জেটি গালফ অভ কোরিন্থ-এ। ঝিরঝিরে বাতাসে নোনা পানির সোঁদা গন্ধ। জোয়ার আসছে।

দালানগুলোর দিকে চাইল রানা। স্থপতি ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইটের অনুকরণে তৈরি করা হয়েছে জমি-ছোঁয়া নিচু দালান। থার্ড জেনারেশন নাইট ভিশন গগলসের কারণে ছাতের ব্যারেল টাইলস লাগছে কুচকুচে কালো। শেষ ব্রিফিঙে দেখেছে রানা, আসলে ওগুলো লাল টালি। খরার কারণে মারা পড়েছে লনের বাদামি ঘাস আর এদিক-ওদিকে দাঁড়ানো বাঁকাচোরা জলপাই গাছ।

রাত তিনটে।

সামান্য আলো আসছে স্ট্র্যাটিজিক্যালি বসানো কিছু ল্যাম্পপোস্ট থেকে। দেয়ালের উপর মনোযোগ ফেরাল রানা। ওটা দশ ফুট উঁচু। দুই স্তরে সিমেন্টের ব্লক, বেশ পুরু। কম্পাউণ্ডের এদিকটা দৈর্ঘ্যে আট শ' ফুটের মত। ইউরোপে

অনুপ্রবেশকারীকে ঠেকাতে দেয়ালের উপর বসানো হয় চোখা কাঁচ। কিন্তু গতকাল কাছের কোরিন্থ শহরে একমাত্র সিকিউরিটি কোম্পানিতে ঢুঁ দিয়েছে উর্বশী ও রানা। পরিচয় দিয়েছে, ওরা আমেরিকান দম্পতি, কিছুদিন আগে বাড়ি কিনেছে সাগর-তীরে। ওদের ইচ্ছে: বাড়িতে বসাবে অ্যালার্ম সিস্টেম। ওই দোকানের মালিক জানিয়েছে, রেসপন্সিভিস্টদের বিশাল এক কম্পাউণ্ডের সমস্ত সিকিউরিটি সিস্টেম সে নিজে বসিয়েছে। গর্ব করে দেখিয়েছে আট বাই দশ ইঞ্চির ঝলমলে এক ছবি। ওটা প্রমাণ করে, সে ওই কম্পাউণ্ডে কাজ করেছে। অটোগ্রাফ দিয়েছে স্বয়ং অভিনেত্রী পার্লা মোনা।

এখানে এসেই প্রথমে রানার চোখে পড়েছে দেয়ালের উপর ট্রিপ ওয়ায়ার। এ ছাড়া রয়েছে অনেকগুলো ক্যামেরা। মার্ভেলের টিম চারপাশ দেখে জানিয়েছে, শুধু বাইরেই রয়েছে তেরোটা ক্যামেরা। দালানগুলোর ভিতর আরও বেশি থাকতে পারে।

পাথরের প্রধান ড্রাইভওয়েকে থামিয়ে দিয়েছে সিঙ্গল রোলিং গেট। ফ্যাসিলিটির পিছন দিকে ছোট আরেকটা গেট, ওদিক দিয়ে যাওয়া যায় জেটিতে। কম্পাউণ্ডের দেয়াল থেকে বেরিয়েছে এক জোড়া চেইন লিঙ্কের বেড়া, সৈকতের দু'পাশ থেকে কেউ এলে তাকে ঠেকাবে।

কোথাও লেখা নেই: *অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ।* তবে যে-কেউ বুঝবে বেড়া ডিঙানো চলবে না। বোধহয় নিজেদের সদস্যদেরই সাবধান করা হচ্ছে এভাবে, ভাবল রানা। বেরিয়ে যাওয়া চলবে না, থাকতে হবে কম্পাউণ্ডের ভিতর!

চারপাশের বিশাল উঠান দেখে নিল রানা। প্রধান দালানের সামনে পার্ক করা তিনটে জিপ। থার্মাল স্ক্যান জানিয়ে দিল ইঞ্জিনগুলো ঠাণ্ডা। গোটা কম্পাউণ্ডে অজস্র ফুটপাথ, সেখানে

টহল দিচ্ছে না গার্ডরা। কোনও কুকুর নেই। ছাতের পাশে বা ল্যাম্প পোস্টের উপর নড়ছে না কোনও ক্যামেরা। বোধহয় দালানের ভিতর সিকিউরিটি স্টেশন, সেখানে রয়েছে কিছু মনিটর, ওগুলোর উপর চোখ রাখছে কোনও গার্ড। এটা হতেই পারে, তাই সোহেলের নেতৃত্বে স্বর্ণা ও কাশেমকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে রানা। ওরা মার্ভেল থেকে কপ্টারে উঠে আগেই পৌঁছে গেছে এথেন্সে। এখানে এসেছে ভাড়া গাড়িতে করে।

সোহেল ও স্বর্ণা উপকূলীয় সড়কের ওপাশে এক জলপাই বাগানে ঢুকেছে। ওখান থেকে নজর রেখেছে ফ্যাসিলিটির উপর। একটা মানচিত্র তৈরি করেছে ওরা, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিটি ক্যামেরা কোথায় এবং ঠিক কোনদিকে রয়েছে ব্লাইণ্ড স্পট। সর্বক্ষণ মার্ভেলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল রেডিওতে। ওরা আন্দাজ করেছে, রেসপন্সিভিস্ট কম্পাউণ্ডে এখন কমপক্ষে পঁয়তাল্লিশজন সদস্য রয়েছে। অবশ্য সব দালানে মানুষ থাকলে, লোকসংখ্যা এর দ্বিগুণও হতে পারে।

পরিকল্পনা তৈরি হতেই চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারিত হয়েছে কৌশল। এদিকে সোহেলের নেতৃত্বে শোর টিম অন্যান্য কাজ সেরেছে। ভাড়া নেয়া হয়েছে গাড়ি, ঠিক করা হয়েছে পালানোর সময় কোন পথে যাবে। খুব কাছেই জায়গা খুঁজে বের করেছে সোহেল। ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ সহজে নামাতে পারবেন কপ্টার। অমলকে তুলে দেয়া হবে কপ্টারে, পরিয়ে দেয়া হবে এভিয়েশন অ্যাপ্রন, এরপর সোজা এথেন্স এলফথেরিয়োস ভেনিযেলোস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। এদিকে গালফ-স্ট্রিম একযিকিউটিভ জেট নিয়ে মন্টিকার্লো থেকে পৌঁচেছে রানার পরিচিত এক বাঙালি ক্যাপ্টেন। অমলকে পৌঁছে দেবে সে রোমে। পেপার ওঅর্ক আগেই শেষ। রোমে তৈরি থাকবে একটা

লিমাযিন।

কিন্তু যদি সব ঠিক ভাবে না ঘটে? তারও ব্যবস্থা রয়েছে। একপলকে বদলে নেবে ওরা পরিকল্পনা। খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয়ে এমন ভাবে আলাপ হয়েছে, একটু চমকেই গেছে জুনিয়ররা— এত রকম বিষয় মাথায় রাখেন সিনিয়ররা? যেমন ওই মিস্টার গগল, উনি দেখেছেন টাইডাল চার্ট, জানিয়ে দিয়েছেন ঠিক কোন্ সময়ে ছিনিয়ে নিতে হবে অমলকে।

নিজের কাঁধে এ কাজ নিয়েছে রানা। তবে সোহেলের নির্দেশে চলবে শোর টিম, ওরা ঠিক সময়ে ঢুকে পড়বে রেসপন্সিভিস্টদের কম্পাউণ্ডে, শুরু হবে সাঁড়াশি আক্রমণ। কে কী করছে তা বুঝে নিয়ে নির্দেশ দেবে সোহেল।

'কাজ থেকে এক মিনিট দূরে,' কানের ভিতর ফিসফিস শুনতে পেল রানা। 'আর আধ মিনিট, রানা।'

ট্র্যান্সমিট বাটন টিপে জানিয়ে দিল রানা, ও শুনেছে। ওর দু'কোমরে ঝুলছে হোলস্টার, দ্রুত হাতে গ্লক ১৯এস পরীক্ষা করে নিল। একটানে উঠে আসছে। বাধ্য না হলে ব্যবহার করবে না। এটা কোনও কিলিং মিশন নয়। মার্ভেলের আর্মারি থেকে ওরা নিয়েছে হালকা গ্লক নাইন এমএম রাউণ্ড। ভিতরে রয়েছে শুধু অর্ধেক চার্জ। সীসার বদলে প্লাস্টিকের বুলেট। খুব কাছের রেঞ্জে ওই বুলেট যে কাউকে হত্যা করবে। তবে পনেরো ফুটের বেশি দূরের কাউকে শুধু জোর ধাক্কায় বিহ্বল করবে, অচল করে দেবে দশ মিনিটের জন্য।

এক এক করে মুহূর্ত পেরিয়ে চলেছে, তারপর যেন কারও ইঙ্গিত পেয়ে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল সরু চাঁদ। রাত হয়ে উঠল জমাট কালো। খুব অস্পষ্ট একটা আওয়াজ পেল রানা। রবিনসন আর-৪৪ নিয়ে পজিশন নিয়েছেন আলম সিরাজ।

'তুমি তৈরি?' আতাসির দিকে চাইল রানা। ওরা আছে রাস্তার পাশে শুকনো এক ডোবার ভিতর।

পাশেই উঁবু হয়ে বসেছে আতাসি, মুখে ক্যামোফ্লেজ রং। নিচু স্বরে বলল, 'তিনদিনে দুটো মিশন, বস্, আমি আবার তরুণ হয়ে উঠছি!'

'নতুন কিছু শিখছ। এই প্রথম কম্পিউটার হ্যাক করবে।'

নিজের ডান আস্তিনের দিকে চাইল রানা। ওখানে সেলাই করে আটকে দেয়া খুব ছোট একটা ফ্লেক্সিবল্ কম্পিউটার স্ক্রিন। ই-পেপারের রেযোলিউশন ঠিক স্ফটিকের মত পরিষ্কার। ওটার স্ক্রিনে হাজার ফুট উপর থেকে দেখানো হচ্ছে রেসপন্সিভিস্টদের কম্পাউণ্ড। দূরে একটা ভ্যান নিয়ে অপেক্ষা করছে উর্বশী, ও রয়েছে ইউএভি-র কন্ট্রোলে। ক্যামেরা জুম করা হয়েছে, ফলে ফ্যাসিলিটির চারপাশের সব চোখে পড়ছে। তবে তার চেয়েও জরুরি, রানা দেখতে পাবে উঠানে কে কোথায় কী অবস্থানে রয়েছে। ডক্টর শামশের আলীর এই এক্সপেরিমেণ্টাল স্ক্রিন বড় বেশি আলো ছিটিয়ে চলেছে। খুদে নব ঘুরিয়ে আলো কিছুটা কমিয়ে নিল রানা। জিনিসটার ব্যাটারি ও কম্পিউটার সেলাই করে আটকে দেয়া হয়েছে কমব্যাট ভেস্টের পিছনে।

'চলো!' সোহেলের কণ্ঠ শুনতে পেল রানা। আতাসির কাঁধে টোকা দিল ও। একই সঙ্গে ডোবার ভিতর থেকে উঠে এল ওরা, পেরিয়ে গেল রাস্তা। বুটের নরম সোলের কারণে সামান্যতম আওয়াজ নেই।

সিমেণ্ট-ব্লকের দেয়ালের কাছে পৌঁছে পিছন ফিরল আতাসি, তারপর একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়াল। একসঙ্গে পেতে দিল দু'হাত। সেগুলোর উপর পা রেখে উঠল রানা, তারপর কাঁধে। এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল আতাসি।

দেয়ালের মাথার উপর হাত রাখল না রানা, দু'সেকেণ্ড লাগল ভারসাম্য ঠিক করে নিতে। আগে থেকে না জানলে হাত দিত দেয়ালের মোনোফিলামেন্ট সিকিউরিটি ট্রিপ ওয়ায়ারের উপর। ওটা প্রায় চোখেই পড়ে না। কম্পাউণ্ডের চার দেয়ালের উপর এ জিনিস. বাইরের দিকে আধ ইঞ্চি স্ট্রিপ। সঙ্গে ডজন খানেক অতি ক্ষুদ্র ইনসুলেটর। আন্দাজ করল রানা, দশ পাউণ্ডের কম ওজন কেটে দেবে স্ট্রিপ, মুহূর্তে বেজে উঠবে অ্যালার্ম। কোমরের থলি থেকে ভোল্টমিটার বের করল ও, পরীক্ষা করে নিল পলক। স্ট্রিপ। কাজ শেষে বেছে নিল তার দিয়ে জোড়া দুটো অ্যালিগেটর ক্ল্যাম্প। তিন ফুট দূরত্বে এঁটে বসল ওগুলো ওয়ায়ারের সঙ্গে। বাইপাস হয়ে যেতেই কেটে দিল ওয়ায়ার। কান পাতল। পাঁচ সেকেণ্ড পর বুঝল, হৈ-চৈ নেই, বাজতে শুরু করেনি ক্ল্যাক্সন, বাতি জ্বলে ওঠেনি কোনও দালানে।

আতাসির দেহ নড়ছে না. কিন্তু উপরে উঠে গেছে ডানহাত। ওর কাছ থেকে কার্বন-ফাইবার কাপড় নিল রানা, বিছিয়ে দিল দেয়ালের উপর, তারপর উঠে পড়ল। ক্ষুরের মত ধারাল কাঁচের টুকরো বিঁধল না বুটের ভিতর। কিছুদিন হলো এই হাই-টেক কাপড় আবিষ্কার করেছে বিসিআইয়ের গবেষকরা। প্রায় নিঃশব্দে আঙিনার ভিতর নামল রানা. একটু সরে দাঁড়াল। আধ মিনিট পর বাইরে থেকে এল ধস্তাধস্তির আওয়াজ। তারপর দেয়ালের উপর আছড়ে-পাছড়ে উঠল আতাসি, ধুপ করে নেমে এল এদিকের মাটিতে।

ওর ধস্তাধস্তি দেখে মুচকি হাসল রানা। থ্রোট মাইকে জানিয়ে দিল, 'আমরা ভিতরে।'

কম্পাউণ্ডের উল্টোদিকে রয়েছে ভিডিও ক্যামেরার একটা

ব্লাইণ্ড স্পট, সেখান দিয়ে ঢুকেছে সোহেল ও কাশেম।

'আমরাও, রানা,' জানাল সোহেল।

আতাসিকে হাতের ইশারা করল রানা, সরতে শুরু করেছে দেয়াল থেকে। ক্যামেরাগুলোকে ফাঁকি দিয়ে এগুতে হবে। প্রধান দালানের ছাতে বেশ কিছু স্যাটালাইট ডিশ ও রেডিও ট্র্যান্সমিশন টাওয়ার। সেদিকে চলেছে রানা ও আতাসি। ওখানে ক্রল করে পৌঁছতে লেগে গেল বেশ কিছু সময়।

চোখ থেকে গগলস খুলে ফেলল রানা, দু'হাতের আঙুলগুলো গোল করে বিনকিউলার বানিয়ে উঁকি দিল কাঁচের জানালা দিয়ে। ঘরের পিছন দেয়াল থেকে আবছা আলো আসছে। ওখানে রয়েছে স্ট্যাণ্ডবাই মোডে কোনও কম্পিউটার। নিশ্চিত হয়ে গেল রানা ওই অফিস-ঘরটাই ক্যাম্পের ডিরেক্টরের।

জানালার ফ্রেমের সঙ্গে রয়েছে অ্যালার্ম পড, কেউ জানালা খুললেই বেজে উঠবে। কমব্যাট ভেস্টের ভিতর থেকে একটা যন্ত্র বের করল রানা, ওটা তাক করল অ্যালার্মের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ইনডিকেটরে জ্বলে উঠল লাল বাতি। কাঁচের চারপাশে ফ্রেমের উপর ডিভাইস বোলাতে শুরু করল রানা। দুই কাঁচের সঙ্গে তার রয়েছে কি না দেখতে চাইছে। না, নেই। জ্বলে ওঠেনি আলো। এই যদি হয় কোরিন্থের সেরা সিকিউরিটি কোম্পানির কাজ, ভাবল রানা, তো এত দিন ধরে বসে আছি কেন আমি? এসপিয়োনাজ ছেড়ে চুরির পেশায় নামলে ফতুর হয়ে যাবে গ্রিক ব্যবসায়ীরা!

কাঁচের সঙ্গে দুটো সাকশান কাপ আটকে দিল রানা। এবার কাটার দিয়ে কাটতে শুরু করল জানালা। খুব ধীরে কাজ করে চলেছে। সামান্য খ্যাস-খ্যাস আওয়াজ উঠছে। কিছুক্ষণ পর ভ্যাকুয়ামের ভিতর দুই ইনসুলেটেড কাঁচ চলে আসতেই আস্তে

করে শ্বাস ফেলল। এবার কাপদুটো আতাসির হাতে ধরিয়ে দিল। ফ্রেম থেকে সাবধানে সরিয়ে নিল জানালার কাঁচ। একই কাজ করল ভিতরের কাঁচে। কাজ শেষে ঘরের ভিতরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল কাঁচটা।

এবার জানালার চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল রানা। ওর পর পর এল আতাসি। জানালার উপর নামিয়ে দিল শেড।

'আমরা অফিসে,' নিচু স্বরে বলল রানা।

'ঠিক আছে,' বলল সোহেল।

কম্পিউটার দেখিয়ে দিল রানা। 'যা করবে জলদি, আতাসি।'

মুট্-মুট্ করে আঙুল ফোটাল বেদুঈন, এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল ডেস্কের পিছনে। সিস্টেম চালু করবার আগে বন্ধ করে দিল স্ক্রিন সেভার। কোমরের থলি থেকে বেরুল ছোট এক ইলেকট্রনিক্ গ্যাজেট। উপরে কয়েকটা স্টিকার, তার উপর থকথক করছে শুকনো আঠা। জিনিসটা কম্পিউটারের ইউএসবি পোর্টে গুঁজে দিল আতাসি। কয়েক সেকেণ্ড পেরুল, তারপর স্ক্রিনে ভেসে উঠল একটা হাসি-মুখ। ওটা মিলিয়ে যেতেই একহাতে কি-বোর্ড টিপতে লাগল ও। আরেক হাতে দ্রুত নাড়ছে মাউস। ভাব দেখে মনে হলো ছোট্ট কোনও ছেলে খেলনা ট্রাক নিয়ে খেলছে।

ওকে কাজ করতে দিয়ে ঘরের মাঝখানে চলে গেল রানা। খুদে পেন-লাইট দিয়ে চারপাশ দেখতে লাগল। জানালা থেকে দূরে থাকছে, ছায়া পড়ছে না শেডের উপর। রেসপন্সিভিস্ট ওয়েব সাইট থেকে ওরা জেনেছে, এই ফ্যাসিলিটির ডিরেক্টর এক ক্যালিফোর্নিয়ান, নাম ক্রিস ক্রিংগল। একটু খোঁজ নিতেই বেরিয়ে এসেছে, এ লোক এই গোষ্ঠীতে যোগ দেয়ার আগে

বেভারলি হিলসে বিক্রি করত দামি গাড়ি। বেশ কয়েকবার তদন্ত হয় তার বিরুদ্ধে। ধারণা করা হয় সে চোরাই গাড়ি বিক্রি করছে। তবে কখনও অভিযোগ আনা হয়নি। তার বিরুদ্ধে তদন্ত করবার সময় বেমালুম হারিয়ে যায় কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী।

ঘরের আসবাবপত্র কেমন হতে পারে, আগেই আন্দাজ করেছে রানা। ডেস্ক, নিচু ক্যাবিনেট, কয়েকটা চেয়ার, এক দেয়ালের পাশে সোফা, তার পাশে কফি টেবিল। প্রতিটি জিনিস দামি। কফি টেবিলের নীচে প্রাচ্যের কার্পেট। ওটা বোধহয় অ্যান্টিক, তোলা যেতে পারে নিলামে। দেয়ালে রয়েছে বেশ কিছু ফ্রেম বাঁধানো ছবি। লোকটা বোধহয় ছবিগুলোকে পূজা করে। এদের বেশির ভাগকে চেনে না রানা। সবার সঙ্গে হাসিমুখে আছে ক্রিস ক্রিংগল। কিছু ছবির মানুষকে অবশ্য চিনতে পারল। কয়েকটা ছবি পার্লা মোনার। অদ্ভুত সুন্দরী ওই অভিনেত্রী। ব্রোঞ্জের দেবী যেন। ঝিকমিক করছে কালো চুল, চোখদুটো বাদামি, চোয়ালের গঠন চমৎকার। সবমিলে যেন অপরূপ এক রাজকুমারী।

আনমনে ভাবল রানা, মেয়েটার জীবনে কীসের এত কষ্ট যে এমন এক কাল্টের সঙ্গে মিশতে হলো!

আরেকটা ছবি মনোযোগ কেড়ে নিল রানার। ওটা বেশ পুরনো। এক লোকের সঙ্গে ক্রিংগল, দাঁড়িয়েছে একটা সেইলবোটের ডেকে। ছবির এক পাশে সই করা। 'সবসময় বিশ্বাস রাখো। লিঙ্ক চ্যাপেল।''

লিঙ্ক চ্যাপেল সাগরে হারিয়ে যাওয়ার কিছুদিন আগে এ ছবি তোলা হয়। কোস্টগার্ডদের রিপোর্ট ঘেঁটে দেখেছে রানা। এক আকস্মিক ঝড়ের সময় ডুবে যায় ওই বোট। ওটা ছাড়াও পাঁচটি বোট ডোবে। মারা পড়ে তিনজন মানুষ।

এই বিজ্ঞানী শেষদিকে ঘোষণা দেন তিনিই শেষ নবী। তাঁর কাজ মানুষকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়া। ছবির দিকে দ্বিতীয়বার চাইল রানা। মানুষটার মুখে অজাগতিক কোনও ছাপ নেই। তবে চেহারা সমাহিত, যেন অদ্ভুত এক শান্তি বিরাজ করছে মনে। মাথার খুলি ডিম্বাকৃতির। চোখে চশমা। মাথার চুল পিছাতে শুরু করেছে। চোখ বাদামি। দাড়ি-গোঁফও। গজিয়েছে সামান্য ভুঁড়ি। বয়স ছিল সত্তরের কাছাকাছি। হতে পারতেন অবসর নেয়া কোনও সফল গবেষক। এ লোক নিজের পথে কীভাবে হাজার মানুষকে টেনেছেন, বুঝে পেল না রানা। আগে যদি দেয়ালে লিঙ্ক চ্যাপেলের ছবি না দেখত, ও আন্দাজ করত ক্রিস ক্রিংগলের সঙ্গে ছবি তুলেছে তার অ্যাকাউন্টেন্ট।

'পেয়েছি!' হঠাৎ একটু জোরে বলে উঠল আতাসি। ঘুরে চাইল রানার দিকে। চেহারায় দোষী বাচ্চাদের ছাপ। 'দুঃখিত, বস্। সিস্টেমের ভিতর ঢুকে পড়েছি। এবার বাকি সব সহজ।'

ঘরের দূর প্রান্ত থেকে চলে এল রানা। 'বলতে পারো অমল কোন্ ঘরে?'

'এরা সব ক্রস রেফারেন্স করেছে। অমল আছে সি দালানে। ওটা নতুন তৈরি করা হয়েছে। যেখানে দেয়াল টপকেছেন সোহেল বস্ আর কাশেম, সেখান থেকে ওটা খুব কাছে। অমল দাশার ঘরের নম্বর এক-ষোলো। তবে একা নেই সে।' স্ক্রিনের দিকে চেয়ে বলল আতাসি, 'তার রুম-মেট মাইকেল ডাহ্ল।'

'গুড, আতাসি,' বলল রানা। সোহেল ও কাশেমকে এ তথ্য নিচু স্বরে জানিয়ে দিল। 'ঠিক আছে, এবার কম্পিউটার থেকে যা পাও, ডাউনলোড করে নাও।'

ট্যাকটিক্যাল নেটে উর্বশীর কণ্ঠ শোনা গেল, 'রানা, তোমার স্ক্রিন খেয়াল করো। লোক আসছে।'

ডান আস্তিনের দিকে চাইল রানা। মেইনটেনেন্স ওভারঅল পরা দুই লোক, সঙ্গে টুলবক্স। আঙিনা পেরিয়ে এ দালানের দিকে আসছে। যদি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফরা তলব করত, গলার আওয়াজ শুনতে পেত ওরা। যাই ঘটে থাকুক, মনে কু ডাকছে রানার।

'আতাসি, বাদ দাও ডাউনলোড। বেরিয়ে যেতে হবে।'

জানালার দিকে রওনা হয়ে গেল রানা, ডেস্ক পাশ কাটানোর সময় ল্যাম্পের নীচে রাখল একটা ছারপোকা। ওরা যে এ ঘরে ঢুকেছে, বুঝতে দেরি হবে না রেসপন্সিভিস্টদের। জানালার অবস্থা দেখেই আবিষ্কার করে ফেলবে ছারপোকা, তবে ক্রিংগলের অফিসে প্রথম কিছুক্ষণ কী কথাবার্তা হয় সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। জানালার পাশে থামল রানা। স্ক্রিন সামান্য ফাঁক করে বাইরে চাইল। সামনের দিক থেকে দরজার দিকে আসছে মেইনটেনেন্স কর্মীরা। কাজেই বেরিয়ে যাবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।

খুব ধীরে শেড সরাল রানা, জানালার চৌকাঠ পেরিয়ে বেরিয়ে এল এপাশে। হাতে বেরিয়ে এসেছে গ্লক পিস্তল। এক সেকেণ্ডে মনে করে নিল এ কম্পাউণ্ডের মানচিত্র। পাশে চলে এসেছে আতাসি। স্বাভাবিক পায়ে চলল ওরা সি দালানের দিকে। ওদের বুটের নীচে মসমস আওয়াজ তুলছে শুকনো ঘাস। রেসপন্সিভিস্ট কম্পাউণ্ডের অন্যান্য দালানের মতই সি দালান, একতলা। দেয়ালগুলো সাদা রঙের। ছাতে ব্যারেল টাইলস।

সি দালানের দরজার পাশে সোহেল ও কাশেম, দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে। ওদের ঠিক মাথার উপর ক্যামেরা। কিছুই দেখবে না ওটা। দরজার ডানদিকে একটা সিকিউরিটি কি-প্যাড। তবে এখন ওটার ফেসপ্লেট সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কি-

প্যাড থেকে বেরিয়ে এসেছে এক দঙ্গল তার। সোহেল এরইমধ্যে বাইপাস করে ফেলেছে। কয়েকটি দেশের আর্মি অফিসারদের ভিতর শুধু রানা ও সোহেল স্যাণ্ডফোর্ড থেকে পাশ করেছিল লকপিক টেস্ট। প্রশিক্ষক বলেন, এই দুজনের হাত ব্রেইন সার্জনদের মত! খুদে একটা পিক দিয়ে টর্শন রড ঠিক জায়গায় নিয়ে এল সোহেল, তালা ধরে মোচড় দিল বামদিকে। প্রায় নিঃশব্দে খুলল দরজা।

'চোদ্দ সেকেণ্ড,' ফিসফিস করে বলল কাশেম। 'সোহেল ভাই, আপনি জাদুকর মাইস্ট্রো!' আস্তে করে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে। সামনে লম্বা এক করিডোর। দালানের শেষে গিয়ে থেমেছে।

দু'পাশে চব্বিশটা দরজা। করিডোরের ছাত থেকে ঝুলছে ফ্লুরেসেন্ট ফিক্সচার। একটু পর পর মৃদু আলোর বৃত্ত। মেঝের উপর ধূসর কার্পেট, সিমেন্টের এই দালানের মতই কঠিন। চারপাশ দেখলে মনে হয় এটা অফিস-বাড়ি। ওরা চারজন পাশাপাশি এগুলো করিডোর ধরে। বামে পড়ল মস্ত এক কিচেন। এর পরের ঘর বড়সড় লণ্ড্রি। দু'দেয়াল ঘেঁষে কমার্শিয়াল ওয়াশিং মেশিন। কোনও ড্রায়ার চোখে পড়ল না রানার। এরা বোধহয় দালানের পিছনে শুকাতে দেয় কাপড়। রেসপন্সিভিস্টদের শেখানো হয়, যান্ত্রিক কিছু চাপিয়ে দিয়ো না প্রকৃতির উপর। কাজেই ড্রায়ার নেই। ওরা অসংখ্য সোলার প্যানেল দেখেছে এক দালানের ছাতে।

দু'মিনিট পেরুনোর আগেই ওরা পেয়ে গেল এক-ষোলো রুমটা। গোড়ালি উঁচু করে কাছের বাতির ফিক্সচার ধরল আতাসি, ওটা খুলে ব্র্যাকেটের ভিতর থেকে বের করে নিল ফ্লুরেসেন্ট টিউব। আবছা আঁধারে নাইট ভিশন গগলস পরে নিল

ওরা। দরজার নব ঘোরাল রানা। সামনের ঘরটা যে-কোনও সাধারণ ডরমেটরি-রুমের মত। দু'পাশে দুটো লোহা দিয়ে তৈরি কট্। মাথার কাছে ডেস্ক ও ওয়ার্ড্রোব। এক পাশে টাইলস লাগানো ছোট একটা বাথরুম। মেঝের একপাশে অগভীর ড্রেন। গোসলের পানি ওদিক দিয়ে বের হয়। গগলসের কারণে সব আবছা সবুজ মত লাগছে। ঘরে আর কালো বলে কিছু নেই। পরিষ্কার চোখে পড়ল দুই কট। ঘুমিয়ে রয়েছে দু'জন। নাক ডেকে চলেছে জোরেশোরে।

প্যান্টের পকেট থেকে ছোট প্লাস্টিকের কেস বের করল রানা। ভিতর থেকে বেরুল চারটে হাইপোডারমিক নিডল। সিরিঞ্জের ভিতর শক্তিশালী নার্কোটিক। ছ'ফুটি লোককে বিশ সেকেণ্ডে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে। অমল যেহেতু ইচ্ছা করে এই কাল্টের সঙ্গে জড়িয়েছে, ওকে নিয়ে যেতে চাইলে ঝামেলা করাই স্বাভাবিক। এ নিয়ে ডিপ্রোগ্রামার লিয়োনার্দো চার্চের সঙ্গে কথা বলেছে উর্বশী। সে জানিয়েছে অমলকে ড্রাগ দিয়ে নিয়ে যাওয়া ভাল। অবশ্য সে না বললেও একই কাজ করত রানা। আতাসির হাতে একটা সিরিঞ্জ দিল ও।

বাম দিকের কটের পাশে চলে গেল বেদুঈন। মানুষটার চেহারা দেখা গেল না। দেয়ালের দিকে মুখ। উপুড় হয়ে ঘুমাচ্ছে। বাম হাতে তার মুখ চেপে ধরল আতাসি, ঘাড়ের পিছনে গুঁজে দিল নিডল। বুড়ো আঙুলের চাপ পড়তেই দাবতে লাগল প্লাঞ্জার।

ঘরের ওদিকে একই ঘটনা ঘটছে। বিছানার উপর লাফিয়ে উঠতে চাইল রানার শিকার, ভয়ে বিস্ফারিত চোখ। কিন্তু নাক-মুখ থেকে হাত সরালো না রানা, জোর করে শুইয়ে রাখল। ছোকরা ব্যস্ত হয়ে দু'পা ছুঁড়তে চাইল। এক এক করে সেকেণ্ড

গুনছে রানা। দশ সেকেণ্ড যেতেই ঝট্‌কা-ঝট্‌কি কমে এল। আরও চার সেকেণ্ড পর নিথর হয়ে গেল। পেন-লাইট জ্বালল রানা, আলো ফেলল মুখের উপর। অমল দাশা বোনের মত দেখতে নয়, তবে মিল রয়েছে চোখের আদল ও ভুরুতে।

'মাল আমাদের হাতে,' বলল সোহেল।

ওর কাছ থেকে দুটো ফ্লেক্সি কাফ নিল রানা, অমলের দুই কব্জি ও গোড়ালি আটকে দিল। নিজের কাজ শেষ করে ফিরেছে আতাসি। অনায়াসে অচেতন বন্দিকে তুলে নিল কাঁধে।

'তোমার কোনও অসুবিধে নেই তো?' জানতে চাইল রানা।

চওড়া হাসল আতাসি। 'বস্‌, মনে পড়ে তিনবছর আগে আহত হন? আপনাকে কাঁধে নিয়ে ইজরায়েল থেকে বেরিয়ে এলাম। দৌড়াতে হলো আট মাইল। কাজেই বুঝে নেন—আপনার তুলনায় এ ছোকরা তো চড়ুই পাখি!'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। আস্তিনের ই-পেপার স্ক্রিনের উপর চোখ। বিশাল কম্পাউণ্ডে কেউ হাঁটছে না। নীরব নিশুতি রাত। কনফার্মেশনের জন্য রেডিও করল ও।

'ওই লোকগুলো এখনও সেই দালানের ভিতর,' জানাল উর্বশী। 'কম্পাউণ্ডের আরেক দিকে আলো জ্বলেছে, তবে এক মিনিট আট সেকেণ্ড পর নিভে গেছে।'

'ঠিক আছে।'

'তোমরা বেরিয়ে আসতে পারো।'

'আসছি।' সঙ্গীদের দিকে চাইল রানা। 'চলো।'

করিডোরে বেরিয়ে এল ওরা। দরজার দিকে চলেছে, ঠিক তখনই ঢং-ঢং করে বেজে উঠল ঘণ্টি! আওয়াজটা যেন ফায়ার অ্যালার্ম। তীক্ষ্ণ! মুহূর্তে মাথা ধরিয়ে দেয়। যেন কানের ভিতর খুঁচিয়ে চলেছে ছোরা দিয়ে। এই আওয়াজের উপর দিয়ে কথা

বলা অসম্ভব। তবে রানা, সোহেল, আতাসি ও কাশেম জানে এবার কী ঘটতে পারে। ওরা মানসিক ভাবে তৈরি।

আতাসি ও কাশেমের সামনে ছুটছে সোহেল। ওরা জানে আর লুকিয়ে থাকা চলবে না, এবার এখান থেকে বেরুতে হবে। অমলকে সহজে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ আর নেই। এখন ওদের ঝেড়ে দৌড় দিয়ে পৌঁছুতে হবে দেয়ালের কাছে। ওখানে রেখেছে একটা লিমপেট মাইন। ওটা উড়িয়ে দেবে দেয়ালের ব্লকগুলো। কাছেই থাকবে উর্বশী, শুনেছে ক্ল্যাক্সনের আওয়াজ। এতক্ষণে আলম সিরাজকে রেডিও করা হয়ে গেছে। উনি রবিনসন নিয়ে হাজির হবেন, নেমে আসবেন কম্পাউণ্ডের বাইরের সড়কে। গার্ডরা কিছু বুঝবার আগেই ভাঙা দেয়াল দিয়ে বেরুবে সোহেল ও আতাসি। অমলকে নিয়ে উঠে পড়বে কপ্টারে, সরে পড়বে এখান থেকে।

রানার পাশের একটা দরজা দড়াম করে খুলে গেল। পায়জামা পরা এক লোক চোখে ঘুম নিয়ে বেরুল করিডোরে। তার চোয়ালের উপর পড়ল রানার ভাঁজ করা বাম কনুই। হাড়ে হাড়ে খটাস্ করে লাগল। লোকটা ঘুরেই ছিটকে গিয়ে পড়ল কার্পেটের উপর। গোঙানির ফাঁকে করুণ চিৎকার ছাড়ল, 'ওরে বাপরে, মেরে ফেলল!'

সামনে আরেক লোক ঘর থেকে উঁকি দিয়েছে করিডোরে। অমলের শিথিল দেহ কাঁধের উপর, কিন্তু ছুটবার ফাঁকে খানিক ডানে সরল আতাসি, ওর বিশাল থাবা গিয়ে পড়ল লোকটার ঘাড়ে। প্রচণ্ড চাপড় খেয়ে ছিটকে গিয়ে ইস্পাতের ডোরফ্রেমের উপর পড়ল রেসপন্সিভিস্ট, সেখান থেকে মুখ থুবড়ে ঘরের মেঝেতে। ওকে পাশ কাটানোর সময় খেয়াল করল রানা, জ্ঞান হারিয়েছে লোকটা।

সামনের দরজার আগে ব্রেক কষল সোহেল। স্ক্রিনে ভিডিও ফিড দেখে নিল রানা। বোধহয় আলম সিরাজের সঙ্গে আলাপ করছে উর্বশী। ক্যামেরা নিয়ে আঁধার সাগরের উপর ঘুরছে ড্রোন। ইয়ারবাডে উর্বশীর কথা শুনতে পেল রানা। তবে বোঝা গেল না কিছু। বড় বেশি জোরে বাজছে অ্যালার্ম।

আর দেরি করল না রানা, খুলে ফেলল দরজা। গ্লক পিস্তল হাতে চারপাশে চাইল। তীক্ষ্ণ আওয়াজে চেঁচিয়ে চলেছে অ্যালার্ম। তবে বিশাল কম্পাউণ্ড শান্ত, ছুটে আসছে না গার্ডরা। কোনও কিছুর নড়াচড়া নেই। এমন কী বাড়তি আলো জ্বেলে দেয়া হয়নি।

ডরমেটরির ভিতর কান ঝনঝন করছে ওদের। বামহাতে কান চাপা দিল রানা, বুঝতে চাইল উর্বশী কী বলতে চাইছে।

'ও-ও... ওখান থেকে! সামনের দিক থেকে আসছে গার্ডরা! চলে আসছেন সিরাজ! বেরোও, জলদি!'

নাইট ভিশন গগলস ঠিক ভাবে পরে নিতে চাইল রানা। তার ফাঁকে দেখল, পাশের দালানের কোনা ঘুরে বেরিয়ে এসেছে ধূসর ইউনিফর্ম পরা তিন গার্ড। এক সেকেণ্ড দেরি করল রানা, বুঝতে চাইল তাদের কাছে অস্ত্র আছে কি না। এদের একজনের হাতে ছোটখাটো এক সাবমেশিন-গান। গুলিবর্ষণ শুরু করল সে। ক্ষত-বিক্ষত হলো দালানের সামনের প্লাস্টার। চারপাশে ছিটকে গেল সিমেন্টের টুকরো। এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা, পরক্ষণে গুলি করল। নিখুঁত লক্ষ্য, গার্ডের বুকে বিঁধল বুলেট। তবে পড়ে গেল না, শুধু পিছিয়ে গেল এক পা।

'সবাই ভেতরে ঢোকো!' গলা ফাটিয়ে বলল রানা। অমলকে নিয়ে করিডোরে ক্রল করে ঢুকে পড়ল আতাসি। পিছনে সোহেল-কাশেম। পা দিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল

রানা, অ্যালার্মের উপর দিয়ে বলল, 'ওদের সঙ্গে অটোমেটিক অস্ত্র, পরনে কেভলার ভেস্ট। আমাদের প্লাস্টিক বুলেট দিয়ে কিছুই করা যাবে না।'

সামনের পুরু দরজা ভেদ করতে চাইছে অজস্র বুলেট। শব্দ শুনে মনে হলো থরথর করে কাঁপছে গোটা দালান।

এক পাশ থেকে চেয়ার নিল কাশেম, ঠেসে দিল দরজার হ্যাণ্ডেলের নীচে। আপাতত বাইরে থেকে দরজা খুলবে না। ডানদিকে সরে গেল সে, দেয়ালের মাউন্ট থেকে ছিঁড়ে নিল হর্ন। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল অ্যালার্মের আওয়াজ। 'আহ্ কী যে শান্তি,' স্বস্তি নিয়ে বলল। 'যেন আর্টিলারির ব্লো গানের লড়াই থামল!'

চোদ্দ

ঠিক পাঁচ সেকেণ্ড লাগল রানার পরিকল্পনা ঠিক করতে। 'অমলের ঘরের জানালা দালানের পাশে! বাইরের দেয়াল থেকে অনেক কাছে! চলো!'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, সবাইকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল করিডোর ধরে। দু'পাশের ঘর থেকে উঁকি দিতে শুরু করেছে রেসপন্সিভিস্টরা। তবে পিস্তল তাক করলেই সুড়সুড় করে ঢুকে পড়ছে ঘরে, ধুপ-ধাপ বন্ধ হচ্ছে কপাট।

এত আওয়াজের ভিতরও ড্রাগের নেশায় অচেতন অমলের রুম-মেট, কোনও সাড়া নেই। ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকল রানা,

পর পর ক'বার গুলি ছুঁড়ল বিশাল জানালা লক্ষ্য করে। প্লাস্টিকের বুলেট থরথর করে কাঁপিয়ে দিল পিকচার উইণ্ডোকে। আলগা হয়ে এসেছে কাঁচ। ততক্ষণে পৌঁছে গেছে রানা, না থেমে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাঁচের উপর। চারপাশে ছিটকে গেল কাঁচ হাজারো টুকরো হয়ে। সবকিছুর ভিতর দিয়ে উড়ে গেল রানা, লনে পড়েই গড়িয়ে দিল নিজেকে। টের পেল ঘাড়ের পিছনদিক ও দু'হাত চিরে দিয়েছে তীক্ষ্ণ কিছু কাঁচ।

ডরমেটরির ঘরগুলো থেকে আসছে জোরালো বাতি। সে আলো ওকে দেখিয়ে দিল পনেরো গজ দূরে সিমেন্ট ব্লক দেয়াল। ওদিকে দরজা লক্ষ্য করে একের পর এক গুলি করছে গার্ডরা। দালান ঘুরে এদিকে এলে বিপদ। পিছনে আঁতাসি-সোহেল-কাশেমের পদশব্দ। এইমাত্র ভাঙা জানালা পেরিয়ে লনে নেমেছে।

রানার দুঃসাহস ওদের সামান্য বাড়তি সময় এনে দিয়েছে।

অনেক দূরের দেয়াল এবং এই দালানের মাঝে বিস্ফোরক রেখেছে সোহেল-কাশেম। ক্যামেরা থেকে দূরে ওদিকের দেয়াল ছিল সেরা ট্যাকটিকাল লোকেশন। তবে সেখানে পৌঁছতে হলে এখন পেরুতে হবে এক শ' গজ ফাঁকা জমি। সে সুযোগ মিলবে না, ডালে বসা পাখির মত ওদের গুলি করে ফেলে দেবে রেসপন্সিভিস্ট গার্ডরা অনায়াসে।

'উর্বশী, পরিস্থিতি জানাও,' বলল রানা। খুদে ই-পেপার দিয়ে চলবে না, এখন প্রয়োজন পরিষ্কার মতামত ও বিশ্লেষণ।

'তোমরাই কি জানালা ভেঙে বেরিয়েছ?'

'হ্যাঁ। চারপাশের অবস্থা কী?'

'ডরমেটরির দরজার কাছে তিন গার্ড। এদিকে পুরো কম্পাউণ্ড ঘিরে আসছে বারোজন গার্ড। সবার সঙ্গে ভারী অস্ত্র।

দু'জন আসছে জিপ গাড়ি নিয়ে। সিরাজ আসছেন। নিশ্চয়ই শুনছ কপ্টারের আওয়াজ?'

রাতের আকাশে ধুপ-ধুপ আওয়াজ তুলছে রবিনসনের পাখা। 'অনিল আর গগলকে জানিয়ে দাও, বোধহয় সি প্ল্যান ধরে এগুতে হবে।'

'আমি নেটে আছি, রানা,' রেডিও থেকে বেরিয়ে এল গগলের কণ্ঠ। 'আমরা রওনা হয়ে গেছি। পেয়েছ উর্বশীর ভাইকে?'

'হ্যাঁ। ভাল আছে।'

দ্রুত কাছে চলে আসছে কপ্টার, বাতাসে তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলছে রোটর। দেয়ালের উপর দিয়ে ছুটে এল রবিনসন। ঘাড় ফিরিয়ে প্রিয় বন্ধুর দিকে চাইল রানা। কথার প্রয়োজন হলো না। ওরা জানে কী করতে হবে। ওদের 'এ' প্ল্যান ভেস্তে গেছে। এবার 'বি' প্ল্যান ধরে কাজ করতে হবে। সোহেলের হাতে বিস্ফোরকের ডেটোনেটর। একটু অপেক্ষা করল। ওদিক থেকে অল টেরেইন এটিভি নিয়ে আসছে এক গার্ড। বোমার কাছাকাছি পৌঁচেছে। ধীর ভঙ্গিতে ডেটোনেট করল সোহেল।

দেয়ালের এক অংশ বিস্ফোরিত হলো। চার দিকে ছিটকে গেছে কংক্রিটের হাজারো টুকরো। বলকে উঠছে ব্যাঙের ছাতার মত ধুলো। তার ভিতর দিয়ে আকাশে উঠল আগুনের লেলিহান জিভ। মেঘের মত চার দিকে ছড়িয়ে গেল সাদা ঘন ধুলো। কানে এল বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ। তার ফাঁকে চোখে পড়ল এটিভির উপর থেকে আকাশে উঠেছে গার্ড। ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে নামল গিয়ে বিশ ফুট দূরে। কয়েক গড়ান খেয়ে স্থির হলো, আর নড়ছে না। কাত হয়ে পড়েছে তার এটিভি। বেলুনের মত টায়ারগুলো ঘুরছে বনবন করে।

মরিয়া দৌড় লাগাল মার্ভেল টিম। বাম কাঁধে অমলকে নিয়ে অনায়াসে সবার সঙ্গে তাল রাখছে আতাসি। দালানের কোণে পৌঁছে গেল ওরা। ওদিকে উঁকি দিল রানা। যে গার্ড প্রথমে গুলি শুরু করে, এখন তার মুখ-মাথা রক্তাক্ত। সিমেন্টের চাপড়া লেগেছে, গভীর ভাবে কেটে গেছে মাথার পাশ। তাকে দু'পাশ থেকে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে দু'জন গার্ড।

রানা আগেই জানে গার্ডদের কোমর বা বুকে তাক করে কিছুই করতে পারবে না ওরা। প্লাস্টিকের বুলেট এনেছে খুন করবার ইচ্ছে নেই বলেই। খুব সতর্ক হয়ে বাকি চারটে বুলেট খরচ করল রানা। সুস্থ দুই গার্ডের জন্য দুটো করে। ওর উদ্দেশ্য তাদেরকে আপাতত অচল করে দেয়া। আগামী কয়েক সপ্তাহ ফুলে থাকুক না ওদের বিচি! ওর তাতে কী?

প্রিয় সম্পত্তি দু'হাতে খামচে ধরল লোকদুটো, আকাশ ফাটানো বিকট চিৎকার দিয়ে উবু হয়ে গেছে। তারপর মাঝের আহত গার্ডের সঙ্গে তারাও ধপ্ করে পড়ল মাটিতে। গড়াগড়ি দিচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে তারস্বরে।

'আরে!' খেপে ওঠার ভান করল সোহেল। 'এত আহাজারি কীসের? তোরা তো ওই জিনিস চাস-ই না!' রানার পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে সে এ-কান ও-কান।

দেরি না করে সংগ্রহ করে নিল ওরা মিনি-উজিগুলো। কাছের টার্গেটে এ জিনিস দারুণ কাজের, কিন্তু একটু দূরের কাউকে লাগানো প্রায় অসম্ভব।

কালো রবিনসন আর-৪৪ হঠাৎ চলে এল ওদের মাথার উপর। এত কাছে নেমে এসেছে যে ছাতের টাইলস থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি উপরে রইল স্কিডগুলো। আসবার সময় আঙিনার উপর কপ্টার পাগলের মত নাচিয়েছেন সিরাজ, তৈরি হয়েছে

জোরালো বালি-ঝড়। ধুলো ও পাথরের কণা আড়াল দিয়েছে রানাদের। এই মুহূর্তে এগুতে পারছে না গার্ডরা।

কান ফাটানো আওয়াজ তুলছে পাখাগুলো, সেইসঙ্গে চারপাশে হৈ-চৈ হুলুস্থূল, গুলি। রানারা বুঝল না হঠাৎ কোথা থেকে আসছে এত গুলি। হঠাৎ মাকড়সার সাদা জালের মত কী যেন দেখা গেল কপ্টারের উইণ্ডশিল্ড ও পাইলটের জানালার উপর। উত্তপ্ত বুলেটগুলো হামলে পড়ল এয়ার-ক্রাফটের উপর। ভ্রমরের গুঞ্জন তুলে ঢুকছে বুলেট ককপিটে। সামনে ঝুঁকে গেলেন সিরাজ, দ্রুত সরাতে চাইলেন কপ্টার। মনে হলো রিঙের ভিতর ওটা ক্ষ্যাপা ষাঁড়। তবে ট্রেসার বুলেটগুলো লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছে। অসংখ্য বুলেট ঠকা-ঠক লাগছে কপ্টারে। হঠাৎ ইঞ্জিনের কাউলিং থেকে ভুস্ করে বেরিয়ে এল ধূসর ধোঁয়া।

ব্যস্ত হাতে রেডিওর ফ্রিকোয়েন্সি পাল্টে নিল রানা, প্রচণ্ড আওয়াজের ভিতর গলা ফাটিয়ে বলল, 'এখান থেকে সরে যান, সিরাজ! পালান! এখুনি!'

'যেতেই হবে, আমি কিছুই করতে পারলাম না, দুঃখিত,' বললেন ক্যাপ্টেন। ড্রাগন-ফ্লাইয়ের মত কপ্টার ঘুরিয়ে নিলেন তিনি, দেয়ালের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পিছনে রইল শুধু রাতের চেয়ে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

'এবার, বস্?' জানতে চাইল আতাসি।

সামনে পঁচাত্তর গজ ফাঁকা জমিন। এদিকে নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছে রেসপন্সিভিস্টরা। অগভীর এক নালার ভিতর আশ্রয় নিয়েছে রানারা। তবে এখানে বেশিক্ষণ থাকা চলবে না। এরইমধ্যে সার্চ পার্টি তৈরি করছে গার্ডরা। রাতের আঁধারে জ্বলে উঠছে তাদের ফ্ল্যাশলাইট।

'তুমি কোথায়, উর্বশী,' জানতে চাইল রানা।

'দেয়ালের পাশেই। দেয়াল যেখানে উড়িয়ে দিয়েছ, তার একটু দূরে। আসতে পারবে আমার ভ্যান পর্যন্ত?'

'উঁহুঁ, সম্ভব না। চারপাশে অনেক বেশি গার্ড। কাভার নেই।'

'জায়গাটা মিলিটারি ব্যারাকের মত,' বলল সোহেল।

'তা হলে ডাইভার্শান দরকার,' বলল উর্বশী।

'ভাল কিছু হতে হবে।' রেডিওতে একটা আওয়াজ শুনছে রানা। দ্রুত চলছে ইঞ্জিন। আর সাড়া দিল না উর্বশী।

তিরিশ সেকেণ্ড পর কব্জা ছিঁড়ে ধসে পড়ল কম্পাউণ্ডের মেইন গেট। দেখা গেল একটা ভ্যান, হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকছে। খসে পড়েছে ভাড়া নেয়া গাড়ির পিছন বাম্পার। বারো-চোদ্দোজন গার্ড ব্যস্ত ফ্যাসিলিটি ঘিরতে, একইসঙ্গে ঘুরে চাইল তারা ভ্যানের দিকে। কয়েকজন নতুন এই হুমকি মোকাবিলা করতে ছুটতে শুরু করেছে। কেউ খেয়াল করল না কালভার্টের নীচ থেকে বেরিয়ে এসেছে কালো কিছু ছায়া। ছুটে চলেছে দেয়াল লক্ষ্য করে।

উর্বশীর ভ্যানের দিকে গুলি করছে গার্ডরা। পাঁচ সেকেণ্ড পেরুনোর আগেই বডিতে তৈরি হলো চল্লিশটা ফুটো। ইস্পাতের পাতের আড়ালে বসেছে ইন্দোনেশিয়ান লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার, কসরৎ করছে ট্র্যান্সমিশন নিয়ে। ফিরে যেতে চাইছে ড্রাইভওয়ের উপর। চাকাগুলো বনবন করে ঘুরতে লাগল, তারপর ট্র্যাকশন পেল নুড়ি পাথরের উপর। বিধ্বস্ত গেটের উপর দিয়ে ছুটল ভ্যান, সরে গেল গোলাগুলির সামনে থেকে।

দেয়াল লক্ষ্য করে ছুটছে মার্ভেল টিম। মাইক্রোফোনে বলল রানা, 'সোহেল, আতাসি, প্ল্যান সি! তোমাদের সঙ্গে পরে দেখা হবে!'

'আপনি কোথায় চললেন, মাসুদ ভাই?' দৌড়ের ফাঁকে

জানতে চাইল কাশেম।

'ওরা উর্বশীর একটা চাকা ফুটো করে দিয়েছে। মেইন বিল্ডিঙের সামনে জিপ দেখেছি। আধ মাইল যাওয়ার আগেই ধরা পড়বে উর্বশী। আমি ওদের দেরি করিয়ে দেব। এদিকে তোমরা সোজা পেরিয়ে যাবে সেতু।'

'এ কাজ আমাকে দে,' প্রায় অনুরোধ ঝরল সোহেলের কণ্ঠে।

'না। খামোকা তর্ক করিস না। তোর দায়িত্ব আতাসি, অমল আর কাশেমকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। এবার রওনা হ' তুই।'

ধোঁয়া-ওঠা বিধ্বস্ত দেয়াল থেকে সরে গেল রানা, আরেক দিকে বাঁক নিয়ে ছুটতে শুরু করেছে। একটু সামনে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে এটিভি, সাইলেন্সার পাইপ থেকে বেরুচ্ছে সাদা ধোঁয়া। একবার ঘুরে চাইল রানা, ভাঙা দেয়ালের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গেছে ওর দলের সবাই। এবার এটিভির হ্যাণ্ডলবার ধরল রানা, সোজা করে নিল। ছ' শ' পাউণ্ডের ফোর-হুইলারকে মোটর সাইকেলের মত গায়ের জোরে সোজা করতে চাইল না, থ্রটল মুচড়ে কাজে লাগাল চাকাগুলোর শক্তি। বিদঘুটে যান রাবারের ফোলা চাকাগুলোর উপর লাফিয়ে স্থির হলো। বাম পা সিটের উপর দিয়ে পার করে দিল রানা, বসে পড়ল ধপ্ করে। তার আগেই রওনা হয়ে গেছে।

সাত শ' পঞ্চাশ সিসির ইঞ্জিন নিচু গর্জন ছাড়ছে। আড়াআড়ি ভাবে পেরুচ্ছে উঠান। কয়েকজন গার্ড একই দিকে চলেছে। তাদের উদ্দেশ্য ছাত-খোলা জিপ। অন্যরা দেয়ালের কাছাকাছি, ধাওয়া করতে চাইছে সোহেলদের।

এতক্ষণ নাইট-ভিশন গগলসের বাড়তি সুযোগ পেয়েছে রানা, কিন্তু সেটা হারাতে হলো। কম্পাউণ্ডের চারপাশে জ্বলে

উঠছে আলো। ল্যাম্প-পোস্টের ইনক্যানডিসেন্ট বালব শুরু করল তীব্র বিকিরণ। আর বড়জোর এক মিনিট, তারপর রেসপন্সিভিস্টরা বুঝে ফেলবে যে লোক এটিভি চালিয়ে নিয়ে চলেছে, সে তাদের কেউ নয়। রানা এমন ভাব নিয়েছে যেন অবাঞ্ছিত আগন্তুকদের খুঁজছে। আসলে খুঁজছে আলো থেকে দূরের কোনও গার্ডকে। একজনকে দেখল, লোকটা দেয়ালের কোণে প্রায়-মৃত গাছগুলোর আড়াল নিয়েছে। গতি বাড়িয়ে সেদিকে চলেছে রানা, চোখ থেকে খুলে ফেলল গগলস। ছায়ার ভিতর দিয়ে ছুটছে, কেউ চট্ করে বুঝবে না ও বাইরের লোক। তবে গার্ড কোন্ ভাষায় কথা বলবে কে জানে! মুখ বন্ধ রাখল রানা, ফোর-হুইলার থামিয়ে হাতের ইশারা করল। ভাব দেখে মনে হলো বলবে, 'এখানে দেরি করছ কেন, এখুনি এসো!'

দ্বিধা করল না গার্ড, দৌড়ে এসে লাফিয়ে বসল রানার পিছনে। একহাত রেখেছে রানার কাঁধের উপর। আরেক হাতে মেশিন পিস্তল।

'বাছা, আজকের দিন তোমার ভাল কাটবে না,' মনে মনে বলল রানা। মুচড়ে ধরল থ্রটল।

'রানা ছাড়া সবাই ভ্যানে উঠেছে,' রেডিওতে জানাল উর্বশী। 'বড় রাস্তা ধরে চলেছি।'

একটু আগে জেনেছে বুলেট আঁচড় কেটেছে পাইলটের কাফ মাসলে। শুনেই বলেছে, এইসব ঘটছে শুধু ওর কারণে। মেনে নেয়া কঠিন, সবাই এতবড় ঝুঁকি নিয়েছে ওরই জন্য। এখন ওদের মিশন ভেস্তে যেতে চলেছে। পিছনে রয়ে গেল রানা, ট্যাকটিক্যাল নেট থেকে হারিয়ে গেছে! মার্ভেল থেকে ওকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা চলবে। যদি না পাওয়া যায়? নিজেকে মাফ করতে পারছে না উর্বশী। অবশ্য সোহেল ও আতাসি এককথায়

বলেছে, এসব নিয়ে ভাবতে হবে না। ওর দায়িত্ব শুধু ভ্যান নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। তবে ছোট হয়ে গেছে ওর মন, বারবার ভাবছে, ওরা যদি প্লাস্টিকের বুলেট সঙ্গে না নিত... ওরা কেউ কেন বুঝতে পারল না ওই কম্পাউণ্ডে আর্মড্ গার্ড থাকতে পারে! কেন কোনও কাল্টের লোক এত অস্ত্র রাখবে? রেসপন্সিভিস্টদের ব্যাপারে যতটুকু জেনেছে, মা'র কাছ থেকে শুনেছে: এরা নাকি শান্তি-প্রিয়! কোনও ধরনের হিংস্রতা পছন্দ করে না।

এদের সঙ্গে গোল্ড অভ মার্সের গণহত্যার কী সম্পর্ক? অন্য কোনও কাল্ট এদের সঙ্গে লড়ছে? এমন কোনও কাল্ট, যাদের নাম এখন পর্যন্ত কেউ জানে না? এমন এক দল, যারা অনায়াসে খুন করে মানুষ? কিন্তু রেসপন্সিভিস্টদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করবার ইচ্ছার সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক?

বুট দিয়ে অ্যাক্সেলারেটর টিপে ধরল উর্বশী, মনে মনে বলল, 'রানা, আমরা শহরের দিকে চললাম। তুমি ওই কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে এসো।'

প্রধান দালানের দিকে যাওয়ার পথে জিপ গাড়িগুলোর দিকে চাইল রানা। গার্ডদের নিয়ে তৈরি প্রথম জিপ, অনুপ্রবেশকারীদের ধাওয়া করবে। ড্রাইভার ছাড়া পাশের প্যাসেঞ্জার সিটে এক গার্ড। পিছনে আরও দুই সঙ্গী, লোহার উঁচু রোল বার শক্ত করে ধরেছে। রানা জানে উর্বশীর ভ্যানের এক চাকা ফুটো, তারপরও ভেলকি দেখাতে চাইবে সে। তবে পঞ্চাশ মাইলের বেশি গতি তুলতে পারবে না। তা ছাড়া উপযুক্ত অস্ত্রের অভাবে শেষে হার মানতে হবে। আর জিপ তো মাত্র একটি নয়, ওটার পিছু নেবে আরও কয়েকটা।

কাজেই এখনই সঠিক সময় কিছু করবার।

রানার কাঁধে টোকা দিল গার্ড। হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল ওদের উচিত ডরমিটরির পিছনে যাওয়া। রানার ভঙ্গি দেখে মনে হলো, কথা মেনে নিয়েছে। শুকনো ঘাসের উপর দিয়ে মসৃণ ভাবে চলেছে ফোর-হুইলার। ওদের দিকে চেয়ে রইল অন্য গার্ডরা। তাদের পিছনে ফেলল রানা, অপেক্ষা করছে, তারপর আরও খানিক গিয়ে সুযোগ নিল—হঠাৎ ডানদিকে ঘুরিয়ে দিল হ্যাণ্ডলবার। বেলুন টায়ারগুলো ছিঁড়ে দিতে চাইল শুষ্ক জমিন। ধড়াস্ করে উল্টে যেত ফোর-হুইলার, কিন্তু বামদিকে সমস্ত ওজন নিয়ে কাত হয়েছে রানা। লাফিয়ে উঠে আবারও চার চাকার উপর স্থির হলো ফোর-হুইল, সোজা ঘুরে গেছে দেয়ালের দিকে। পুরো থ্রটল খুলে দিল রানা। তারই ফাঁকে লোকটার হাত থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নিল মিনি-উজি, গুঁজে নিল নিজের বেল্টে। দু'সেকেণ্ড দ্বিধার ভিতর পড়ল গার্ড, তবে কাটিয়ে উঠল। এক হাতে রানার গলা পেঁচিয়ে ধরল সে। বাইসেপ যেন দড়ির মত টানটান, প্রচণ্ড শক্তিতে ভেঙে দিতে চাইল রানার ল্যারিংক্স ও শ্বাসনালী।

চমকে গেল রানা, মুহূর্তে আটকে গেছে শ্বাস। একটু বাতাস পেতে ব্যস্ত হয়ে উঠল ফুসফুস। তারই ফাঁকে তীব্র গতি তুলল এটিভির। চলেছে ভাঙা দেয়ালের দিকে। এবড়োখেবড়ো বৃত্তাকার ফোকর মাত্র ছ'ফুট। সামনের মাটিতে জমেছে ভাঙাচোরা সিমেন্টের ব্লক ও ধুলো-বালি। ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল গতি তুলে ছুটছে ফোর-হুইলার। আর মাত্র পনেরো গজ দূরে দেয়াল। তবে রেসপন্সিভিস্ট গার্ডরা ধারণা করে নিয়েছে এটিভির ওই দুই লোক বাইরের। গাড়িটা লক্ষ্য করে আসতে লাগল গুলি। দেয়ালে লেগে ওড়াতে লাগল সিমেন্টের চল্টা ও বালি। ছিটকে লাগছে এটিভিতে।

আশপাশে বুলেটের শিস শুনল রানা। একটা বুলেট ওর বাম আস্তিন ছিঁড়ে নিয়ে গেল। ওদিকে মনোযোগ দিল না, পুরো খেয়াল দেয়ালের ফোকরের উপর। এদিকে বাতাস নিতে পাগল হয়ে উঠেছে ফুসফুস। শ্বাস-নালীর উপর দ্বিগুণ চাপ বাড়িয়ে দিল গার্ড। যেন গলা টিপেই শেষ করবে রানাকে।

'শুধু একবার ঠিক করে গুলি কর্, হারামজাদারা! মাত্র একবার!' ভাবল রানা। চোখে আর কিছু দেখছে না। যেন চারপাশে কালো গহ্বর। গভীর এক সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে ছুটছে।

'একবার!' রানা বুঝতে পারছে জ্ঞান হারাতে চলেছে। ওর শেষ ইচ্ছা, লোকটা ছেড়ে দিক ওর গলা। তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল। মনে হলো হাতুড়ি মেরেছে কেউ মেরুদণ্ডের উপর। গলা থেকে সরে গেল গার্ডের হাত, ঢলে পড়ল লোকটা ওর গায়ের উপর। গরগরা করবার মত আওয়াজ এল। ফুটো হয়ে গেছে ফুসফুস, মুখ থেকে ছিটকে বেরুল রক্ত। কাঁধ ভেসে গেল রানার। রেসপন্সিভিস্টদের গুলি লেগেছে তাদেরই লোকের পিঠে। কাত হয়ে সিট থেকে খসে পড়ল গার্ড। ঠিক তখনই উঁচু জঞ্জালের উপর চড়ে বসল এটিভি। পেট-ফোলা চাকা সহজে ডিঙিয়ে চলেছে ময়লার স্তূপ। মুহূর্তে ঢাল পেরুল এটিভি, ঢুকে পড়ল ফোকরের ভিতর। আগেই ঝুঁকেছে রানা, নইলে মাথা ছিঁড়ে নিত দেয়ালের উপরের অংশ। পরক্ষণে দেয়ালের এপাশে চলে এল। ফোকর পেরিয়ে দু'পায়ের জোরে সিট ছাড়ল রানা। নিতম্ব উঁচু করে অপেক্ষা করল, কয়েক সেকেণ্ড পর এল জোর ঝাঁকি। ধুপ করে মাটিতে নামল এটিভি।

সাসপেনশনের উপর এলোপাথাড়ি নাচতে নাচতে চলেছে বড়সড় কাওয়াসাকি। যে-কোন সময় হাত থেকে হ্যাণ্ডলবার ছুটে

গিয়ে ছিটকে মাটিতে পড়তে পারে রানা। কান থেকে খুলে গেছে ইয়ারবাড, বুকের উপর ঝুলছে তার। তিক্ত চেহারায় দম নিতে চাইল রানা। ফুসফুস স্বস্তি পেল, কিন্তু জ্বলছে ক্ষতিগ্রস্ত শ্বাস-নালী। এটিভির দুলুনি থেমে আসতেই হ্যাণ্ডলবার ঘুরিয়ে নিল রানা, এগুতে হবে উপকূলীয় সড়ক ধরে। এ রাস্তা গেছে গেটের সামনে দিয়ে বারো মাইল দূরের কোরিন্থে।

পাকা রাস্তায় উঠে এল রানা। ঠিক তখনই বিধ্বস্ত গেটের বাইরে নাক বের করল প্রথম জিপ। মাত্র আধ মাইল দূরে উর্বশী। ধরা পড়ে যাবে, জিপের জন্য এই দূরত্ব কিছুই নয়। কিছু একটা করা দরকার। হ্যাণ্ডলবারের একটা সুইচ টিপে ডিজএনগেজ করল রানা এটিভির সামনের দুই চাকা। ফলে বুলেটের গতি পেল গাড়িটা। কম্পাউণ্ডের দেয়ালের পাশ দিয়ে ছুটছে।

গেট আর বিশ গজ দূরে, এমন সময়ে দ্বিতীয় জিপ বাঁক নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়, চার পাশে ছড়িয়ে দিল ধুলো। চাকাগুলো উঠে এল সড়কে, ছুটছে প্রথম জিপের পিছনে। দ্বিতীয় জিপে ড্রাইভার ছাড়া দু'জন গার্ড। একজন প্যাসেঞ্জার সিটে, অন্যজন দাঁড়িয়ে আছে খোলা জিপের পিছনে। হাতে একে-৪৭।

এটিভির বাড়তি গতি কাজে লাগাল রানা, ছুটে চলল জিপের পিছনে। কাছাকাছি গিয়েই উঠে দাঁড়াল স্যাডল সিটের উপর। হু-হু করে সামনে থেকে আসছে হাওয়া, সেই সঙ্গে জিপের ওড়ানো ধুলো। সরু হয়ে গেল ওর চোখ। স্পিড কমাল, জিপের চেয়ে সামান্য বেশি গতিতে ছুটছে। সোজা গিয়ে গুঁতো দিল এটিভি জিপের পিছনের বাম্পারে।

এ ধাক্কা কাওয়াসাকি থেকে আকাশে তুলে দিল রানাকে, বাম হাঁটু ঠেকিয়ে নামল ও পিছনের গার্ডের পিঠে। এক হাতে

পেঁচিয়ে ধরতে চেয়েছিল লোকটার গলা, কিন্তু তার আগেই রোল বারের সঙ্গে ছেঁচে গেল ওর নাক-মুখ। থ্যাচ্ করে আওয়াজ উঠল। পিছনে বাঁকা হয়ে গেল লোকটা, তারপর ধসে পড়ল জিপের মেঝেতে। রানা নেমে দাঁড়িয়েছে আগেই। বুঝল, আর কিছু করতে হবে না; যদি মরে না থাকে, এ লোক লড়বার সাধ্য-হারিয়েছে। বিদ্যুদ্বেগে ডান পা চালাল ও এবার। প্যাসেঞ্জার সিটের গার্ড কিছু বুঝবার আগেই মাথার পাশে লাথি খেল। জিপের দু'পাশে দরজা নেই, কিছু ধরবার সুযোগ পেল না লোকটা, ভাঙা পুতুলের মত গিয়ে পড়ল রাস্তার উপর। দেখতে না দেখতে পিছিয়ে গেল দেহটা।

ঘাড় ফেরালো চালক। চমকে উঠল রানার মারমূর্তি দেখে। কোমরে গোঁজা মিনি-উজি একটানে বের করে ফেলেছে রানা, মাযল ঠেকাল ড্রাইভারের মাথায়।

'লাফিয়ে পড়ো, বাছা, নইলে খুন হয়ে যাবে!'

দুটোর কোনওটাই করল না ড্রাইভার, প্রাণপণে ব্রেক কষল। জমে গেল চাকাগুলো। বিশ্রী আওয়াজ তুলল পোড়া রাবার। রাস্তা ছেড়ে প্রায় আকাশে উঠল জিপের পিছন দিক। ছিটকে গিয়ে উইণ্ডশিল্ডের উপর পড়ল রানা। অসংখ্য কাঁচ নিয়ে দু'ভাঁজ হয়ে গেছে। হুডের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। তারপর পড়ে গেল জিপের নাকের ডগা থেকে। সব এত দ্রুত ঘটল যে ধরতে পারল না ইঞ্জিনের গ্রিল।

রানা অদৃশ্য হতেই ব্রেক ছেড়ে দিল ড্রাইভার, টিপে ধরল অ্যাক্সেলারেটার। জানে, যে লোক তাদের আক্রমণ করেছিল, সে এখন অসহায়ভাবে পড়ে আছে রাস্তার উপর।

পনেরো

আইয়োনিয়ান সাগর। কুচকুচে কালো ঢেউ কেটে চলেছে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস। ওটার ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইনামিক ইঞ্জিনগুলো চালু করে ওরা কোরিন্থের পশ্চিমে, পেলোপোনেজিয়ান পেনিনসুলা ঘুরে ছুটে চলেছে পুবে। আশপাশে মেরিটাইম ট্রাফিক নেই বললেই চলে। রেইডারস্কোপে শুধু কয়েকটা জেলে-নৌকা। রাতে খাবারের সন্ধানে সাগর সমতলে উঠে আসা স্কুইড ধরছে।

অপারেশন্স সেন্টারে একটা কম্পিউটার মনিটরে ব্যস্ত অনিল। ইউএভি নিয়ে ঘুরছে রেসপন্সিভিস্ট কমপ্লেক্সের উপর। কিছুক্ষণ আগে উর্বশীর কাছ থেকে কর্তৃত্ব নিয়েছে। একটু পর রবিনসন আর-৪৪ নিয়ে ফিরবেন আলম সিরাজ, তখন বুঝে নেবেন ড্রোন। এদিকে তীরের কাছে চলে এসেছে মার্ভেল, কাজেই জাহাজের দায়িত্ব নিয়েছে গগল।

'মার্ভেল, আমি সিরাজ বলছি।' অন্য এক কমিউনিকেশন ক্লার্ক বসেছে আতাসির সিটে। ওভারহেড স্পিকার চালু করে দিল সে। কপ্টারের চ্যানেল ধরল। 'আমি আপনাদের দেখতে পাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, সিরাজ, চলে আসুন,' বলল গগল। 'আমরা এগুব পাঁচ নট গতি তুলে।' কয়েকটা কি টিপল সে। মার্ভেলের

ড্রাইভ টিউবের ভিতর কমে গেল পানির স্রোত। পাম্পগুলো রিভার্স করতেই নির্ধারিত হলো জাহাজের গতি। স্রোত ও ঢেউ সরিয়ে নিতে চাইছে। আরও কয়েকটা কি টিপে সন্তুষ্ট হলো গগল। এবার সহজে জাহাজে নামতে পারবেন সিরাজ। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল গগল। ঘরের পিছনে ড্যামেজ-কন্ট্রোল অফিসার নিজ স্টেশনে। 'ফায়ার টিম রেডি?'

পাথরের মত বসে আছে বাঙালি অফিসার। 'জী, স্যর। ওয়াটার ক্যাননের উপর আঙুল রেখে অপেক্ষা করছি।'

'গুড। কম ক্লার্ক, সিরাজকে জানিয়ে দাও, আমরা তৈরি। উনি আসতে পারেন।' ইন্টারকম টিপল গগল। ডক্টর রাইনার রয়েছে হ্যাঙারে। 'ফারা, এখুনি আসছেন সিরাজ।'

একটু আগে ওরা জেনেছে বুলেট আঁচড় কেটেছে পাইলটের কাফ মাসলে। বিশাল স্ক্রিনে চেয়ে রইল গগল। মার্ভেলের প্রধান মাস্তুলের উপর শক্তিশালী ক্যামেরা, ওটা দেখিয়ে চলেছে পিছন দিকের কার্গো হ্যাচ। ওটার নীচ থেকে উপরে উঠে এসেছে হেলিপ্যাড। চাঁদের আভায় নামতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত রবিনসন আর-৪৪কে। স্টার্ন রেলিঙের উপর দিয়ে এলেন আলম সিরাজ। ইঞ্জিন কাউলিং থেকে বেরুচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়া।

সাধারণ পাইলট যা করবে না, বিনা দ্বিধায় তা-ই করতে পারেন দুঃসাহসী সিরাজ। আঁধার সাগরের উপর দিয়ে বিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়েছেন ভাঙাচোরা কপ্টার নিয়ে। অন্য কেউ হলে নেমে পড়ত কোনও খামার-মালিকের মাঠে। সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলী হয়ে উঠত মানুষ। হাজারো প্রশ্ন তুলত গ্রিক কর্তৃপক্ষ। তার চেয়েও বড় কথা, মাসুদ রানার প্ল্যান সি অনুযায়ী জাহাজে থাকতে হবে সবাইকে। যত দ্রুত সম্ভব জাহাজ নিয়ে সরে যেতে হবে গ্রিস থেকে বারো মাইল দূরে, আন্তর্জাতিক সাগরে।

ডেকের কয়েক ফুট উপর ভাসছেন সিরাজ, খুব ধীরে নামাতে লাগলেন কপ্টার। স্কিডগুলো ডেক স্পর্শ করবার এক সেকেণ্ড আগে কপ্টারের একযস্ট থেকে বেরুল বিপুল ধোঁয়া। ইঞ্জিন সিয করেছে, ল্যাণ্ডিং প্যাডে ধপ করে নেমে এল রবিনসন। মড়াৎ করে ভেঙে গেল একটা স্ট্রাট। স্ক্রিনে আলম সিরাজকে দেখতে পেল গগল, শান্ত ভঙ্গিতে একে একে বন্ধ করছেন কপ্টারের সিস্টেম। তারপর সিট বেল্ট খুলে ফেললেন, হ্যাঙারের এলিভেটর নামতে শুরু হওয়ায় নেমে এলেন মেঝের উপর। সরাসরি চাইলেন ক্যামেরার দিকে। ঠোঁটে তিক্ত হাসি।

জাহাজে একজন ফিরল, ভাবল গগল। বাকি রইল আরও ছয়জন।

ভাড়া করা ভ্যান নিয়ে ছুটছে উর্বশী, এক চাকা ফুটো। বাঁক নিলে রাস্তা থেকে নেমে যেতে চাইছে গাড়ি। পেলোপোনিজের নতুন জাতীয় সড়কের দিকে চলেছে। রিয়ারভিউ মিররে চোখ রেখে ভাবছে, পিছনে কেউ নেই। তবে বেশিক্ষণ সহায়তা করবে না ভাগ্য। ভ্যানের ভিতর দড়িদড়া ঠিক করছে আতাসি ও কাশেম। যারা পিছু নিয়েছে তাদের গতি কমাতে হবে, কাজেই এমন কিছু খুঁজছে সোহেল, যেটা কাজে লাগবে। ল্যাপটপ দিয়ে ইউএভি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে উর্বশী। তবে ওটা দিয়ে কিছু করা কঠিন। সোহেলের জন্য ভ্যানের ভিতর রোলিং চেয়ার ও ছোট ডেস্ক বসিয়েছে উর্বশী। হয়তো ওগুলো কাজে লাগবে। দরজা দিয়ে ফেলা যায় পিছনে। সবার অস্ত্র ও গুলি জমা নিয়েছে সোহেল। ওদের সঙ্গে তিনটে পিস্তল ও ছয়টা বাড়তি ম্যাগাজিন। কিন্তু সেগুলোর ভিতর আবার প্লাস্টিকের বুলেট। এ দিয়ে হয়তো ফুটো হবে উইণ্ডশিল্ড, কিন্তু চাকায় গুলি করলে

ছিটকে চলে যাবে আরেক দিকে।

সড়কের পাশে ছোট ছোট গ্রাম পিছনে পড়ছে। সিমেণ্টের প্রলেপ দেওয়া বাড়িঘর। পিছিয়ে গেল আঙুরের মাচার নীচে চেয়ার-টেবিল পাতা টাভার্না—গ্রিক রেস্তোরাঁ। এত রাতে বন্ধ। পিছিয়ে গেল এক পাল ছাগল। উপকূলীয় সড়কের পাশে ইদানীং জায়গা কিনে বাগানবাড়ি করছে বিদেশিরা। কিন্তু মাত্র দুই-এক মাইল দূরেই পাওয়া যায় সত্যিকারের গ্রামাঞ্চল, সেখানে জীবন-যাত্রা এখনও এক শ' বছর আগের আমলের।

হঠাৎ রিয়ার-মিররে আলোর ছটা দেখল উর্বশী। এত রাতে ওরা ছাড়া কেউ ছিল না সড়কে। বুঝে নিতে দেরি হলো না ওই বাতি রেসপন্সিভিস্টদের জিপ গাড়ির।

'আমাদের সঙ্গী জুটেছে,' বলল। মেঝের সঙ্গে টিপে ধরল অ্যাক্সেলারেটর। ভারসাম্য রাখতে চাইছে তীব্র গতি ও ছিঁড়ে যাওয়া চাকার ভিতর।

'ওদেরকে কাছে আসতে দাও,' ভ্যানের পিছন থেকে জানাল সোহেল। হাত রেখেছে পিছন দরজার হ্যাণ্ডেলে, ওটা খুলে দিয়েই হাতে তুলে নেবে পিস্তল। ওর কণ্ঠ হাস্যকর শোনাল। ফাটা চাকার কারণে নাচতে নাচতে চলেছে গাড়ি।

আশি মাইল গতি তুলে আসছে জিপ। দেখতে না দেখতে দুই গাড়ির মধ্যকার দূরত্ব অনেক কমে এল। পিছনের জানালা দিয়ে দেখছে সোহেল। একটু পরেই বুঝল, ভ্যানের পিছনে থাকবে না জিপ, চলে আসবে পাশে।

'সোহেল!' তীক্ষ্ণ শোনাল উর্বশীর কণ্ঠ।

'দেখেছি।'

মাত্র দশ গজ দূরে জিপ। ঝটকা দিয়ে দরজা খুলল সোহেল, হাতে উঠে এল গ্লক পিস্তল। যন্ত্রের মত টিপতে শুরু করেছে

ট্রিগার। ওর প্রথম বুলেট জিপের গ্রিল ও হুডের উপর দিয়ে পিছলে গেল। পরের কয়েকটা লাগল উইণ্ডশিল্ডে। তিনটে গুলি ফুটো করল কাঁচ। ড্রাইভার ভয়ে একপাশে সরতে চাইল। দ্রুত কমে গেল গতি। বিশ্রী আওয়াজ তুলেছে চাকাগুলো। মনে হলো সড়ক থেকে ছিটকে পড়বে জিপ। তবে শেষ মুহূর্তে স্টিয়ারিং-হুইল ঘোরাল ড্রাইভার। গাড়ি যেদিকে পিছলে গেছে, তার উল্টোদিকে বনবন করে ঘুরছে হুইল। ছেঁচড়ে চলেছে জিপ, তারপর বামদিকের চাকা ফিরে এল পেভমেন্টে।

আবার ধাওয়া শুরু করল জিপ। উইণ্ডশিল্ডের ওপাশ থেকে উঠে দাঁড়াল প্যাসেঞ্জার সিটের গার্ড, হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল।

'আতাসি, কাশেম, শুয়ে পড়ো!' তাড়া দিল সোহেল। 'উর্বশী, সোজা রাখো গাড়ি, মাথা নিচু!'

কর্কশ আওয়াজ ছাড়ল গার্ডের রাইফেল। ভ্যানের ভিতর তীক্ষ্ণ শিস তুলে ঢুকছে বুলেট। প্রচণ্ড তাপে হিসহিস আওয়াজ তুলছে ফুটো হয়ে যাওয়া ধাতব প্লেট। পিছনের জানালা বিস্ফোরিত হলো। চারপাশে হীরার টুকরোর মত ছিটকে পড়ল কাঁচ। ভ্যানের ভিতর নানাদিকে ছুটল একটা বুলেট, তারপর বিঁধল গিয়ে উর্বশীর সিটের পিছনে।

উইণ্ডো ফ্রেমের উপর দ্বিতীয় পিস্তল তুলল সোহেল, পাল্টা গুলি শুরু করল। আতাসি ও কাশেম দেহ দিয়ে ঢেকে দিয়েছে অচেতন অমলকে।

'লাগল কী করে!' ড্রাইভিং সিট থেকে বলল উর্বশী। হুইলের উপর ঝুঁকে পড়েছে। তারই ফাঁকে দেখছে রিয়ারভিউ মিরর। 'সোহেল, ওই লোকের বুকে গুলি লেগেছে।'

'কপাল গুণে। ব্যাটার কী অবস্থা?' পিস্তলে নতুন ম্যাগাজিন ভরল সোহেল।

'তা জানি না। রাইফেল নিয়েছে পিছনের লোকটা। এক মিনিট!'

সরে গিয়ে জিপের গতি-পথে পৌঁছল উর্বশী, দেরি না করে কড়া ব্রেক কষল। প্রচণ্ড সংঘর্ষ হলো দুই গাড়ির ভিতর। ধাক্কা খেয়ে দুলে উঠল ভ্যান, থামতে চাইছে। এদিকে তুবড়ে গেল জিপের বাম্পার। মুহূর্তের জন্য পিছিয়ে গেল ড্রাইভার। পরক্ষণে গতি বাড়িয়ে আবার গুঁতো দিল ভ্যানের পিছনে। জিপ থেকে ছিটকে পড়ল আহত গার্ড। তার সঙ্গী আছড়ে পড়ল রোল বারের উপর।

মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটার চেপে ধরেছে উর্বশী। পিছনে পড়ল জিপ। দেখতে না দেখতে এক শ' গজ এগিয়ে গেল ভ্যান। নিজেকে সামলে নিয়েছে গার্ড। আবারও ধাওয়া শুরু করল জিপের ড্রাইভার।

'মার্ভেল, আমরা কত দূরে?' জানতে চাইল উর্বশী।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল অনিল, 'ইউএভি দিয়ে তোমাদের দেখছি। আরও ছয় মাইল যেতে হবে।'

কপালকে অভিশাপ দিল উর্বশী।

'আরও খারাপ খবর,' বলল অনিল। 'প্রথমটার পিছনে আসছে আরও দুটো জিপ। একটা সিকি মাইল। আরেকটা আরও খানিক পিছনে।'

আবার কাছাকাছি হয়েছে পিছনের জিপ। তবে বেশি কাছে আসছে না। ভ্যানের চাকা লক্ষ্য করে গুলি করছে গার্ড। এঁকেবেঁকে এগুতে শুরু করল উর্বশী। জানে, এভাবে বেশিক্ষণ চলা সম্ভব নয়। 'কেউ পরামর্শ দেবেন?' জানতে চাইল।

'আমার পরামর্শের ঝুলি শেষ,' বলল সোহেল। পরক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ। মাইক্রোফোনে টোকা দিল। 'অনিল,

জিপের উপর ইউএভি নামিয়ে আনলে?'

'কী?'

'ওই ড্রোন। মনে কর্ ওটা ক্রুজ মিসাইল। প্যাসেঞ্জার সিটের উপর নেমে এলে? ওটার ভিতর ফিউয়েল আছে, আছড়ে পড়লে বিস্ফোরিত হবে।'

'কিন্তু ওটা না থাকলে খুঁজে পাব রানাকে?'

'পাঁচ মিনিটের ভিতর ওর সঙ্গে কথা হয়েছে?' জানতে চাইল সোহেল।

'না।'

'তা হলে ওই ইউএভি ওর দরকার নেই। যা করার তাড়াতাড়ি কর্।'

'ঠিক আছে।'

জিপের সামনে পেভমেন্টের উপর পড়ল রানা, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরল ড্রাইভার। দেহ সোজা করে নিতে মাত্র এক সেকেণ্ড পেল রানা, তারই ফাঁকে খপ্ করে ধরল অগ্রসরমান ফ্রন্ট বাম্পার। ভাল করেই ধরেছে, কিন্তু ওকে ছেঁচড়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল জিপ। দু'হাতের জোরে পিঠ ও কোমর উঁচু করল রানা, তবে বুটের হিলদুটো খেয়ে নিতে চাইল কর্কশ পেভমেন্ট।

কয়েক সেকেণ্ড ওভাবে রইল রানা, স্বাভাবিক করে নিল শ্বাস। মিনি-উজি হারিয়েছে, তবে গ্লক পিস্তল কোমরের হোলস্টারে। বাম্পারে বামহাতের জোর বাড়াল ও, ইয়ারবাড কানে গুঁজে নিল ডানহাতে। সোহেল ও অনিলের শেষ ক'টা কথা শুনতে পেল।

'নেগেটিভ, ওটা লাগবে আমাদের,' বলল থ্রোট মাইকে।

মুখের কাছে গর্জন করছে জিপের ইঞ্জিন।

'রানা, কোথায় তুমি?' ভেসে এল উর্বশীর কণ্ঠ।

'বাদুড়ের মত ঝুলছি একটা জিপের নীচে,' ঘাড় কাত করে রাস্তার দিকে চাইল রানা। চিত হয়ে থাকবার ফলে সব উল্টো লাগছে। গাড়ির দুটো টেইল-লাইট দেখতে পেল। ওগুলোর উপর ঝিকিয়ে উঠছে রাইফেলের লালচে আগুন। 'একটু অপেক্ষা করো। ভ্যানের পিছু নেবে না কেউ।'

'বড়জোর আধ মিনিট সময় পাব।'

'এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো।' দু'কাঁধের জোরে নিজেকে বাম্পারের সামনে আনতে চাইল রানা। ইঞ্জিনের গ্রিল বেয়ে উঠতে হবে, কিন্তু জানতে দেয়া চলবে না ড্রাইভারকে। বামহাতে বাম্পার ধরে রইল রানা, ডানহাতে শক্ত করে ধরেছে গ্রিল। পরক্ষণে দুই হাতের জোরে ধরল ইস্পাতের জাল, ভাঁজ করে নিল পাদুটো। বাম্পারে উঠে পরমুহূর্তে হামাগুড়ি দিয়ে উঠল হুডের উপর। হোলস্টার থেকে বেরিয়ে এল গ্লক।

দ্বিতীয় সেকেণ্ড ব্যয় করল না রানা, পরপর দু'বার গুলি করল ড্রাইভারের বুকে। এত কাছের রেঞ্জে প্লাস্টিকের বুলেট যে কাউকে খুন করবে, তবে লোকটার পরনে কেভলার ভেস্ট। দুই বুলেটের ধাক্কা যেন খচ্চরের দুই জোরালো লাথি। ফুসফুস মুচড়ে গেল তার, শ্বাস আটকে খাবি খেতে শুরু করল ড্রাইভার।

হুড বেয়ে উঠে এল রানা, উইণ্ডশিল্ড পেরিয়ে নেমে পড়ল সিটে। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ড্রাইভারকে। লোকটার চেহারা ফ্যাকাসে, বিকট হাঁ করে বাতাস নেয়ার চেষ্টা করছে। রাস্তার মাঝখান দিয়ে ছুটছে জিপ, তবে সেদিকে খেয়াল দিল না রানা। ড্রাইভারের ডান পা এখনও চেপে রেখেছে অ্যাক্সেলারেটার।

ঝট করে পিস্তল তুলল রানা, গুলি করল লোকটার উরুর

উপর। ড্যাশবোর্ডে ছিটকে লাগল রক্ত। ড্রাইভারের পা সরে গেল গ্যাস পেডাল থেকে। কমে আসতে শুরু করেছে গাড়ির গতি। বিশ মাইলের নীচে নেমে আসতেই লোকটার কপালে পিস্তল তাক করল রানা। 'বেরিয়ে যাও।'

অলস ভঙ্গিতে লাফ দিল লোকটা, ধুপ করে নামল সড়কের পাশে। নুড়ি-পাথরে পিছলে ধড়াস্ করে পড়ল, গড়াতে শুরু করেছে থামল কয়েক গড়ান দিয়ে। দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছে আহত উরু। সারা দেহ ফেটে বেরুচ্ছে রক্ত।

ড্রাইভিং সিটে বসে পড়ল রানা, রওনা হয়ে গেল প্রথম জিপ লক্ষ্য করে। রিয়ারভিউ মিররে হেডলাইট দেখল। আসছে রেসপন্সিভিস্ট গার্ডদের তৃতীয় জিপ। লোকগুলোর ধাওয়া করবার ভঙ্গি সতর্ক করে তুলছে রানাকে। তবে আপাতত এ নিয়ে ভাববার সময় নেই।

যারা উর্বশীর ভ্যানের দিকে গুলি করছে, তারা জানে না ও পিছন থেকে আসছে। এ-ও জানে না তৃতীয় জিপ কাছাকাছি পৌঁচেছে। গতি আরও তুলল রানা। পেরুল একটা সাইনবোর্ড। তাতে গ্রিক ও ইংরেজিতে লেখা: সামনে নতুন জাতীয় সড়কের সঙ্গে মিশেছে এই সড়কের র‍্যাম্প। সামনে কোরিন্থের খাল ও সেতু।

সঠিক সময়ে পৌঁছতে হবে, বুঝতে পারছে রানা। তার আগে খসিয়ে দিতে হবে লোকগুলোকে। ডানদিকে চোখে পড়ল র‍্যাম্প। পঞ্চাশ গজ পিছনে চলে এসেছে তৃতীয় জিপ। ভ্যানের পিছনে তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে লাগছে বুলেট।

সামনের জিপের দিকে চাইল রানা। এদিকে ওর পিছনটা শুঁকছে এসে তৃতীয় জিপ। 'উর্বশী,' তাড়া দিল ও। 'গতি বাড়াও। চাকা খসে পড়লে পড়ুক।'

প্রথম জিপের কাছ থেকে সরতে শুরু করেছে ভ্যান। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটার দাবাল ড্রাইভার, কমিয়ে আনল দূরত্ব। ততক্ষণে তার পিছনে হাজির হয়েছে রানা। ও যা করতে চলেছে তাকে পুলিশ অফিসাররা বলে 'পিট'—প্রেসিশন ইম্মোবিলাইযেশন টেকনিক। সঠিক ভাবে ধাক্কা দিতে হয়। সামনের জিপের পিছনে জোরে গুঁতো দিল না রানা, এর বেশি দরকারও পড়ল না। এক পাশে ধাক্কা দিতেই চরকির মত ঘুরে গেল গাড়িটা।

রানা যেন স্টক-কার ড্রাইভার, সামনে এগিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত। পাশ থেকে আরেকবার ধাক্কা দিল। প্রথম গুঁতো সামলে নিতে চেষ্টা করছে ড্রাইভার, এমনি সময় দ্বিতীয় ধাক্কা একেবারে বেসামাল করে দিল তাকে। স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে জিপের উপর চড়াও হয়েছে রানা। আর কিছু করবার রইল না ড্রাইভারের, বনবন করে ঘুরল গাড়ি। গতি থামল না, সড়কের মাঝখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে চলে গেল আরেক পাশে। বামদিকের চাকা আকাশে উঠল, পরক্ষণে ডিগবাজি শুরু করল জিপ। তিনবার গড়িয়ে থামল ছাতের উপর ভর করে। ততক্ষণে হয়ে গেছে মুড়ির টিন। ভিতরে আটকা পড়েছে ড্রাইভার ও গার্ড।

থ্রুওয়েতে ওঠার সিঙ্গেল লেনের মুখটা আটকে দিয়েছে জিপ। পিছন ফিরে চাইল রানা। এখন আর উর্বশীর পিছনে ধাওয়া করবে না তৃতীয় জিপ। ভ্যান নিয়ে পৌঁছে যাবে সোহেলরা সেতু পর্যন্ত। রিয়ারভিউ মিররে চোখ রেখেছে রানা, দেখতে পেল তৃতীয় জিপ। মন্থর গতিতে আসছে ওটা র‍্যাম্পের দিকে। লোকগুলো জানে, উড়ে গেছে পাখি। র‍্যাম্পে না থেমে আবার গতি তুলল ড্রাইভার, ধাওয়া শুরু করল রানাকে।

কোরিন্থের দিকে চলেছে রানা।

ভ্যান ও জিপগুলোর উপর ঘুরছে ড্রোন, ওটার ক্যামেরার ছবি দেখে অবাক হয়ে গেছে অপারেশন্স সেণ্টারের সবাই। অনিল যোগাযোগ করতে চাইল রানার সঙ্গে। 'দ্বিতীয় জিপে কী তুই, রানা?'

'হ্যাঁ।'

'দারুণ দেখালি!'

'থ্যাঙ্কস। চারপাশের অবস্থা কী?'

'উর্বশী সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। কেউ ধাওয়া করছে না। রেসপন্সিভিস্টদের আখড়া থেকে নতুন কোনও গাড়িও রওনা হয়নি। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এখনও জানে না গোলাগুলির কথা। আর দুই মিনিটের মধ্যেই খালের ভিতর ঢুকছি আমরা। এইমাত্র হ্যাঙার থেকে এলেন সিরাজ, ওঁর হাতে তুলে দিচ্ছি ইউএভি।'

'আমি শহরে ঢুকছি.' বলল রানা। 'সামনের পথ খোলা?'

'গতবার যখন দেখলাম, সব পরিষ্কার। উর্বশীরা সেতুর উপর উঠলে তোর দিকে মনোযোগ দেয়া হবে। তখন থেকে এরিয়াল কাভারেজ পাবি।'

'ঠিক আছে। পরে দেখা হবে।'

ফ্লাইট সুট পরে অপারেশন্স সেণ্টারে এসে ঢুকেছেন আলম সিরাজ, ডান পা'র প্যাণ্ট ছেঁড়া, কাফ মাসলের উপর বড় এক ব্যাণ্ডেজ। কম্পিউটারের সামনে বসে পড়লেন। পা ভাঁজ করতে পারছেন না।

'আপনার কী অবস্থা?' জানতে চাইল অনিল।

'বউ থাকলে গর্ব করে বলতাম, যুদ্ধ করেছি।'

'কয়টা স্টিচ?'

'আট। ও নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি না, কিন্তু আমাদের

রবিনসনের অবস্থা করুণ। পনিরের মত সারা গায়ে ফুটো হয়েছে। ক্যানোপির ভিতর ঢুকেছে এগারোটা বুলেট। ...ঠিক আছে, মিস্টার অনিল, আমি তৈরি।'

ইউএভির কন্ট্রোল সিরাজের হাতে ছেড়ে দিল অনিল। চাইল বিশাল স্ক্রিনের দিকে। ফ্রেইটার নিয়ে কোরিন্থ ক্যানেলের ভিতর দিয়ে চলেছে গগল।

প্রথমবার রোমানদের স্বর্ণযুগে প্রস্তাব করা হয়, কঠিন হয়ে উঠছে সরু ইস্থ্‌মুস দিয়ে চলাচল, কাজেই খনন করা উচিত কোনও ক্যানেল। কিন্তু খাল তৈরি হলো না. সম্রাটের সেরা ইঞ্জিনিয়ার দল গড়ে তুলল নতুন এক পথ। তার নাম দিল গ্রিকরা, দাইওকোস। তখন থেকে অন্য নিয়ম শুরু হলো। রোমানদের জাহাজ থেকে মালামাল নামাল ক্রীতদাসরা, কাঠের চাকা লাগিয়ে ঠেলে জাহাজ নিয়ে গেল পরের টার্মিনাসে। ওখানে আবার ভাসানো হলো জাহাজ, নতুন করে তোলা হলো মালামাল। এই চলল উনিশ শতকের শেষ তক, তারপর মানুষ শিখল নতুন প্রযুক্তি। হাতে চলে এসেছে নতুন খনন যন্ত্র। দায়িত্ব পেল একটা ফ্রেঞ্চ কোম্পানি। কিন্তু খাল খনন করতে ব্যর্থ হলো ওরা। এবার দায়িত্ব নিল এক গ্রিক কোম্পানি। তাদের কাজ শেষ হলো আঠারো শ' তিরানব্বুই সালে। ক্যানেল খনন শেষ হলে, আধুনিক জাহাজগুলোকে আর পেলোপোনিজ ঘুরিয়ে এক শ' ষাট মাইল বয়ে নেয়ার প্রয়োজন রইল না।

এই ক্যানেলের দৈর্ঘ্য চার মাইলেরও কম, পাশে বিরাশি ফুট। দেখবার মত তেমন কিছু নেই ক্যানেলে, তবে রয়েছে একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। এই ক্যানেল তৈরি করা হয় পানির নীচে-উপরে নিখাদ পাথর কেটে। কাটার পর মাথার উপর এখনও রয়ে গেছে দুই শ' পঞ্চাশ ফুট পুরু পাথুরে পাহাড়। তার নীচ

দিয়ে চলে জাহাজ। দেখলে মনে হয় কোনও দৈত্য কুঠার দিয়ে পাথর কেটে সরু এক পথ তৈরি করেছে। এই ক্যানেলের সেতুগুলো টুরিস্টদের পছন্দের জায়গা, ওখান থেকে নীচে চাইলে দেখা যায় সমুদ্রগামী জাহাজ।

খুদে পসিডোনিয়া শহরের আলো চোখে না পড়লে স্ক্রিনে মনে হতো ছুটে গিয়ে পাহাড়ে ধাক্কা দেবে বুঝি জাহাজ। এই ক্যানেল এতই সরু যে সাগর থেকে চোখেই পড়ে না। তবে বোঝা যায়, সামনে কালচে পাথুরে উপকূল। এক মাইল দূরে এক সেতুর উপর ঘুরছে শক্তিশালী একটা ঝকঝকে আলো।

'কোনও ভুল হবে না তো, গগল?' জানতে চাইল অনিল।

'জোয়ার চলছে। আমাদের দু'পাশের উইং ব্রিজ থেকে চার ফুট দূরে থাকবে তীর। বলা যায় না, কোথাও চল্টে যেতে পারে রং। তবে বেরিয়ে যাব।'

'চালিয়ে যান,' বলল ফু-চুং। 'আমি স্ক্রিনে দেখতে রাজি নই। লাইভ শো দেখব। ব্রিজে উঠছি।'

'তবে বাইরে বেরুবেন না।' সাবধান করে দিল গগল। 'এদিক-ওদিক হলে মুস্কিল হবে।'

'আপনার কথাই রাখব।' মনে মনে হাসল ফু-চুং। এলিভেটরে উঠে পড়ল, এক মিনিটের ভিতর পৌঁছে গেল পাইলট হাউসে। একবার পিছনে চাইল। ডেকের উপর ক্রুরা প্রস্তুত। তাদের কাজ পরীক্ষা করছে জলিল খান ও সানজিদা স্বর্ণা। প্রত্যেকে সশস্ত্র। বো'র দিকে কয়েকজন কমাণ্ডো।

সরু ক্যানেল ধরে বিশ নট গতি তুলে ছুটছে মার্ভেল। আজকাল এই ক্যানেল ব্যবহার করে শুধু প্লেযার বোট ও সাইটসিইং ক্রাফট। বড় জাহাজগুলোকে টেনে নিয়ে যায় টাগ বোট। সঙ্কীর্ণ পথ, কাজেই গতি তোলা হয় দুই থেকে চার নট।

তবে মার্ভেলের সবাই জানে ক্যাপ্টেন হিসাবে অস্ত্র-ব্যবসায়ী গগল তুলনাহীন, তারপরও বুকের ভিতর কেমন যেন আড়ষ্ট বোধ করছে ফু-চুং।

স্টারবোর্ডে দীর্ঘ ব্রেকওয়াটার পেরুল মার্ভেল। প্রতিটি কম্পার্টমেন্টে বাজতে লাগল কলিশন অ্যালার্ম। কী ঘটতে পারে, জানে সবাই। প্রত্যেকে কিছু না কিছু ধরে দাঁড়িয়েছে।

খালের দু'পাশকে যুক্ত করেছে ছোট ছোট কয়েকটা সেতু। এগুলো উঁচু ট্রাস ব্রিজ নয়, দুই লেনের, সাগর-সমতল থেকে কিছুটা উপরে। কোনও জাহাজ আসবার সময় এই সেতুগুলো যন্ত্রের সাহায্যে নামিয়ে দেয়া হয় সাগরের মেঝেতে। তার উপর দিয়ে পেরিয়ে যায় জাহাজ। তারপর আবার চাকা ঘুরিয়ে তুলে আনা হয় সেতু। আবার শুরু হয় গাড়ি চলাচল।

বো'র দিকে চাইল ফু-চুং। ওটা রিইনফোর্সড্, সাগরের বরফ কেটে এগুতে পারে। সামনের সেতুকে ধাক্কা দিল মার্ভেল, ইস্পাতের সঙ্গে ইস্পাতের সংঘর্ষে কান ফাটানো আওয়াজ হলো। সেতুটা ভাঙল না, মার্ভেলের প্রচণ্ড ওজন ছুটিয়ে দিল লক, সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের নীচে তলিয়ে গেল সেতু। মনে হলো চমকে উঠল মার্ভেল, তারপর বিপুল পানি ছলকে দিয়ে এগুতে শুরু করল। খালের দু'পাশের তীর ভেসে গেল পানিতে। টলতে শুরু করল মার্ভেল, তারপর উচ্ছল পানির ভিতর দিয়ে এগুতে লাগল।

দু'পাশে চাইল ফু-চুং, দু'দিকে বৈশিষ্ট্যহীন কালো পাথুরে তীর। তবে সামনের দু'পাশ উঠে গেছে আকাশের দিকে। ওই পাহাড় যেন বামন করে দিয়েছে মার্ভেলকে। খানিক দূরে গাড়ি ও রেলরোড সেতু। দেখে মনে হয় ছোট ছেলেদের খেলনা লোগো সেট।

খালের ভিতর দিয়ে দ্রুত গতিতে চলেছে মার্ভেল, কোনও ভুল করেনি গগল। খালের মাঝখান দিয়ে ছুটছে। এমনই সচ্ছন্দে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করছে আথর্টশিপ থ্রাস্টার, অন্য কেউ হলে দ্বিতীয়বার চিন্তা করত। একবারও ফ্লাইং ব্রিজগুলো স্পর্শ করল না মার্ভেল। পাইলট হাউস থেকে বেরুল ফু-চুং, চলে গেল পিছনে। এ কাজ বোকামি, এবং বিপজ্জনক। এখন যদি কোনও ভুল করে গগল, এই তীব্র গতির কারণে সুপারস্ট্রাকচার থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে প্ল্যাটফর্ম। কিন্তু মনে লোভ জেগে উঠেছে ফু-চুঙের, হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করে দেখল পাথর—শীতল, রুক্ষ। ক্যানেলের এত গভীরে দিনের বেশির ভাগ সময় ছায়া থাকে, পাহাড়কে উত্তপ্ত করতে পারে না সূর্য—তাই ঠাণ্ডা।

সন্তুষ্ট হয়ে আবার ব্রিজে ঢুকল ফু-চুং, ঠিক তখনই মার্ভেলের রেলিং ঘষা দিল ক্যানেলের দেয়ালকে। জাহাজটা সামান্য সরিয়ে নিল গগল। আবার ফিরে এল খালের মাঝখানে।

'উর্বশীর ভ্যান নিউ ন্যাশনাল রোড ব্রিজের মুখে,' ইণ্টারকমে শোনা গেল সিরাজের কণ্ঠ। 'আমি মিস্টার রানাকে দেখতে পেয়েছি। উনি এখনও এগিয়ে আছেন। পিছনে চলছে আরেকটা জিপ।'

'আমরা সবাই তৈরি,' মনে মনে বলল ফু-চুং।

ক্ষত-বিক্ষত টায়ার শেষে ছিঁড়েই গেল। সেতু এখনও সিকি মাইল দূরে। বাকি পথ এগুতে হবে রিমের উপর দিয়ে। অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে চলেছে উর্বশীর ভ্যান। আওয়াজটা সহ্য করবার মত নয়। মনে হলো চকবোর্ডের উপর নখ দিয়ে আঁচড় কাটছে কেউ। দাঁতে দাঁত টিপে বসে আছে উর্বশী। তবে সেতুর

মাঝখানের স্প্যানে পৌঁছে যেতেই ভাবল, 'স্রষ্টা, তোমাকে ধন্যবাদ, বাড়ি পৌঁছে গেছি।' ভ্যান থামিয়ে বিরাট শ্বাস ফেলল।

পাশের দরজা খুলে ফেলল আতাসি, দেখতে পেল দ্রুত এগিয়ে আসছে মার্ভেল। সেতুর উপর থেকে মোটা চারটে ক্লাইম্বিং নাইলন দড়ি ফেলল। দড়িগুলো বেঁধে দেয়া হয়েছে ভ্যানের সিটগুলোর ফ্রেমে। গোল করে পেঁচিয়ে থাকা দড়ি দ্রুত নীচের দিকে রওনা হলো, থামল গিয়ে পানির দশ ফুট উপরে।

সিট থেকে নেমে এল উর্বশী, দ্রুত হাতে আটকে নিল র‍্যাপেলিং গিয়ার—হার্নেস, হেলমেট ও গ্লাভস। ওদের দু শ' ফুট নীচে মার্ভেলের স্টার্ন থেকে বিপুল পানি পিছন দিকে ছুটছে। শক্তিশালী ইঞ্জিনগুলো থ্রাস্টার দিয়ে গতি কমিয়ে আনছে। দেখতে না দেখতে একদম থেমে গেল জাহাজ।

ট্যানডেম প্যারাশুট জাম্পারদের মত নিজেকে হার্নেসের সঙ্গে আটকে নিয়েছে আতাসি। কাশেম ও সোহেল সাহায্য করছে ওকে। আতাসির হার্নেসের সঙ্গে ওরা আটকে দিল অচেতন অমলকে। এবার নিজেরা আটকে নিল হার্নেস। নীচের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করল।

মার্ভেলের ডেকে দড়িগুলো খপ্ করে ধরল ক্রুরা, রওনা হয়ে গেল জাহাজের পিছনের দিকে। যখন বুঝল সুপারস্ট্রাকচার, কমিউনিকেশন অ্যান্টেনা বা আর কিছুর সঙ্গে দড়ি জড়িয়ে যাবে না, ইশারা করল। পাল্টা ইশারা করল ফু-চুং।

ওরা তৈরি।

উচ্চতার কথা মনেই রাখল না উর্বশী, গার্ডরেইল ডিঙিয়ে নামতে শুরু করল। ওর পাশে নামছে সোহেল। ওর হার্নেসে রয়েছে বিশেষ আঙটা, সঠিক সময়ে ওটার সুইচ গতি কমিয়ে দেবে। অমলকে নিয়ে কাশেমের পাশে নামছে আতাসি।

গার্ডারগুলো পেরিয়ে যেতেই রইল শুধু মার্ভেলের ডেক। দুই শ' ফুট নীচে। ওদের ওজন রাখছে শুধু পৌনে এক ইঞ্চি দড়ি।

নামছে উর্বশী। ওর'পর পর সোহেল, কাশেম ও আতাসি। তীব্র গতিতে নেমে চলেছে। কিছুক্ষণ পর র‍্যাপেলিং হার্নেস ব্যবহার করে কমিয়ে আনল ওরা নামার গতি। প্রায় একই সময়ে ডেকের উপর নামল ওরা, অপেক্ষা করল। হার্নেস থেকে ওদের মুক্তি দিল ক্রুরা। লাইনগুলো সরিয়ে নিয়ে আটকে দেয়া হলো কাস্ট-আয়রন বোলার্ডগুলোর সঙ্গে।

দ্রুত নেমে এসেছে ওরা, রক্তের ভিতর নাচছে অ্যাড্রেনালিন। উর্বশী বলল, 'এবার খেলা শেষ করুন, গগল।'

ক্লোজড্-সার্কিট টেলিভিশনে ডেকের সবই দেখছে গগল, এবার টি হ্যাণ্ডেল থ্রটল সামনের দিকে ঠেলে দিল। রওনা হয়ে গেল মার্ভেল। মুহূর্তে বিদায় নিল দড়ির ঢিলা ভাব, থরথর করে উঠল। ভাড়া নেয়া ভ্যানকে প্রচণ্ড টান দিল জাহাজের থ্রাস্টার। সেতুর গার্ডরেইল পেরুল ভ্যান, পাথরের মত নামতে শুরু করল। কয়েক সেকেণ্ড পর এসে পড়ল পানির ভিতর। ভিজে গেল মার্ভেলের ফ্যানটেইল। পিঠ দিয়ে পড়েছে ভ্যান। চেপ্টে গেল ছাত, বিস্ফোরিত হলো জানালাগুলো। মার্ভেলের ইঞ্জিনগুলো উপুড় করে দিল ভ্যানটাকে। দেখে মনে হলো ওটা হাঁস, মাছের আশায় ডুব দিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে মার্ভেল, ভ্যানের জানালা দিয়ে হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকছে পানি। দেখতে না দেখতে ডুবে গেল গাড়ি। ওটাকে টেনে নিয়ে চলেছে মার্ভেল। ঈজিয়ান সাগরে বেরিয়ে কেটে দেয়া হবে দড়িগুলো, হারিয়ে যাবে ভ্যান।

ওটা ভাড়া নেয়া হয় ছদ্ম-পরিচয়ে, কাউকে খুঁজে পাবে না কর্তৃপক্ষ। মার্ভেলের কারও সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই ওই

ভ্যানের। কেউ জানবে না একদল দক্ষ এসপিয়োনাজ এজেন্ট একটা মিশন নিয়ে এসেছিল। এবং তারা বাধ্য হয়ে তাদের 'সি' প্ল্যান ব্যবহার করে। আর মাত্র একজন বাকি রইল, যে জাহাজে ফিরলে সফল বলা যায় এই মিশনটাকে।

কোরিন্থ ক্যানেলের দিকে ছুটে চলেছে মাসুদ রানা। দু'পাশে স্যাঁৎ-স্যাঁৎ করে পিছনে পড়ছে একের পর এক গ্রাম ও খামার। চাঁদের আলোয় সাইপ্রেস গাছগুলো যেন আর্মির সেন্ট্রি, পাহারা দিচ্ছে মাঠগুলোকে।

রানা তীব্র গতিতে সড়কের বাঁক নিচ্ছে, ট্র্যান্সমিশনের কাছ থেকে আরও গতি আদায় করতে চাইছে। কিন্তু পিছনে লেগেই রয়েছে লেজ। যেন নিজেদের কিডন্যাপ্‌ড্‌ সদস্যকে হারিয়ে পাগল হয়ে উঠেছে রেসপন্সিভিস্ট গার্ডরা। প্রচণ্ড গতি তুলছে ড্রাইভার, বারবার দুই লেন ব্যবহার করছে। ধাওয়া করতে গিয়ে পিছলে চলে যাচ্ছে নুড়ি-পাথরের উপর। বারকয়েক রানাকে লক্ষ্য করে গুলিও করেছে তারা। তবে যে গতি তুলে ছুটছে তাতে লক্ষ্য-ভেদ প্রায় অসম্ভব। এটা বুঝতে পেরেই গুলি বন্ধ করেছে, এখন চেষ্টা করছে কাছে পৌঁছুতে।

উইণ্ডস্ক্রিন ভাঙা না থাকলে ভাল হতো, ভাবছে রানা। আশি মাইল গতির বাতাস এসে উড়িয়ে নিতে চাইছে ওকে। পরিস্থিতি আরও সঙ্গীন হয়ে উঠল সামনে থেকে বাতাস শুরু হওয়ায়। সড়কের বালু ও পাথরের কণাগুলো ছিটকে এসে লাগছে চোখে। মুহূর্তে পিছনে পড়ে গেল প্রাচীন ইস্‌থ্‌মিয়া। ওটা গ্রিসের অন্য সব ছোট ধ্বংসস্তূপের মত নয়। নীচু টিলার মত অংশে দেখবার মত কিছু নেই। নেই কোনও মন্দির বা কলাম, বদলে একটা সাইন। তাতে লেখা খুদে এক জাদুঘরের পরিচয়। আরেকটু

এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল বড় নোটিস বোর্ড। সামনে দুই কিলোমিটার দূরে আধুনিক শহর ইস্থমিয়া। মার্ভেল যদি ঠিক সময়ে হাজির না হয়, মস্ত বিপদে পড়বে, ভাবছে রানা। জিপের গ্যাস গজ জানিয়ে চলেছে, ট্যাঙ্ক প্রায় খালি।

কানের ভিতর ইয়ারবাডে নিজের নাম শুনতে পেল রানা। অ্যাডজাস্ট করে নিল রেডিও। 'রানা বলছি।'

'মিস্টার রানা, আমি সিরাজ। মিস্টার সোহেল সবাইকে নিয়ে নিরাপদে পৌঁছে গেছেন। আপনাকে ড্রোন দিয়ে দেখছি। মিস্টার গগল হিসাব কষছেন এখন। তবে মনে হয় আপনার উচিত গতি কমানো।'

'নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন পিছনে কী?'

'তা দেখেছি। কিন্তু আপনি যদি ঠিক সময়ে না আসেন, হঠাৎ দেখবেন আকাশে উড়াল দিয়েছেন। আর তারপর কী ঘটবে তা তো বুঝতেই পারছেন। লোহার দেয়ালে চেপ্টে যাবেন। মাছি যেমন থাবড়া খেয়ে মরে।'

'চোখের সামনে এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়ে দেয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ,' তিক্ত মনে বিড় বিড় করল রানা।

সামনে উপকূলীয় সড়ক নীচের দিকে গেছে। রানা ফিউল নষ্ট না করতে টিপে ধরল ক্লাচ। মাধ্যাকর্ষণের টানে নীচের দিকে ছুটে চলেছে জিপ। ড্রাইভ করছে, সেই সঙ্গে এক চোখ রেখেছে সাইড গ্লাসের উপর। পাঁচ সেকেণ্ড পর দেখল রেসপন্সিভিস্টদের হেডলাইটগুলো। আবার গিয়ার এনগেজ করল রানা।

ফটফট আওয়াজ শুরু করল ইঞ্জিন। পর মুহূর্তে শক্তি ফিরে পেল। তবে তা মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। ইঞ্জিনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দুর্বল কাশির আওয়াজ। পুরনো মালটানা গাড়ির ড্রাইভার যে বুদ্ধি কাজে লাগায়, ঠিক তাই করতে চাইল

রানা। সাপের মত এঁকেবেঁকে চলল কিছুক্ষণ, তাতে যদি ছলকে উঠে ট্যাঙ্ক থেকে কিছু গ্যাসোলিন যায় লাইনে। মনে হচ্ছে বুদ্ধিটা ভাল, নতুন উদ্যমে চলতে শুরু করেছে ইঞ্জিন।

'মিস্টার রানা, মিস্টার গগলের হিসাব নেয়া শেষ,' জানালেন সিরাজ। 'আপনি সেতু থেকে আট শ' ষাট মিটার দূরে। তার মানে আপনি বড় দ্রুত চলছেন। গতি কমাতে হবে। পঞ্চাশ মাইল গতিতে এগিয়ে আসুন, নইলে কিন্তু...'

পিছনের জিপ আশি গজ পিছনে। দ্রুত এগিয়ে আসছে। সামনের সড়ক সোজা লাইনের মত। এদিক-ওদিক বেঁকে রেসপন্সিভিস্ট জিপ ঠেকানো অসম্ভব। পুরো রাস্তা জুড়ে এগুতে চাইছে রানা। জবাবে পিছন থেকে এল গুলি। হিসহিস আওয়াজ শুরু করল ইঞ্জিন, বেঁকে বসছে। কপাল খারাপ। 'আমি পুরো গতি নিয়ে আসছি,' বলল রানা। 'গগলকেই বলুন গতি বাড়ানো-কমানো যা খুশি করুক।'

ইস্‌থমিয়া শহরে ঢুকে পড়েছে রানা। কীসের শহর, ওটা বড় জোর উপকূলীয় একটা গ্রাম। সাগরের নোনা হাওয়া নাকে এল। চারপাশে আইয়োডিন দেয়া শুঁটকি ও জালের আঁশটে গন্ধ। বাড়িঘরগুলো হোয়াইট-ওয়াশ করা। ছাতের উপর লাল টাইলস। বেশিরভাগ ছাতে স্যাটালাইট ডিশ, ঠিক যেন হাই-টেক ব্যাঙের ছাতা। গ্রামের মাঝে বড়সড় এক স্কয়্যার। ওটা পেরুল রানা, খানিক দূরে সরু সেতু নামানো-ওঠানোর স্ট্যানশন।

'ঠিক আছে, রানা,' ভেসে এল গগলের কণ্ঠ। 'এবার গতি কমাতেই হবে। ঠিক পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার গতি তুলে এসো, নইলে মস্ত বিপদ হবে।'

'কোনও ভুল হয়নি তো?'

'এ তো সহজ অঙ্ক। হাই স্কুলের ফিযিক্স।' ভাব দেখে মনে

হলো বেশ নাখোশ হয়েছে গগল। ‘আমার কথার উপর বিশ্বাস রাখতে পারো।’

পিছন থেকে রাইফেলের আওয়াজ ভেসে এল। রানা জানে না বুলেট কোথায় গেছে। জেনেই বা কী করবে? রাইফেলের কথা ভুলে যেতে চাইল। ওর কাজ শুধু এগিয়ে যাওয়া। তবে গতি কমাতে হবে। একে-৪৭ থেকে ব্রাশ ফায়ার করা হলো বুলেট খটাখট লাগছে জিপের পিছনে। একটা বুলেট ওর মাথার উপর দিয়ে হুইশ্ শব্দে বেরিয়ে গেল।

সেতু আর মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। বড় জোর পঞ্চাশ গজ পিছনে রেসপন্সিভিস্ট জিপ। সামনের দিকে চাইল রানা। এখন গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কিন্তু মগজ বলে চলেছে: ওরে ব্যাটা, গতি তোল্, পালা! মেঝের সঙ্গে পিষে ফ্যাল অ্যাক্সেলারেটার।

হঠাৎ এক বিশাল মূর্তির মত উদয় হলো মার্ভেলের বো। পিছনে চারতলা সুপারস্ট্রাকচার। ওটার কারণে হারিয়ে গেল খালের দৃশ্য। সামনে শুধু লোহার বিরাট দালান। রানার মনে হলো, এত সুন্দর দৃশ্য আগে কখনও দেখেনি।

হঠাৎ ঝাঁকি খেল মার্ভেল, যেন পিছুবে। বিকট আওয়াজ শুরু হলো। সেতুর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে বো’র। প্রথম যখন মার্ভেল এই খালের ভিতর ঢুকল, তখনও এমনই ঘটেছে। মনে হলো দেখতে না দেখতে আরও উঁচু হয়ে গেল মার্ভেল। তারপর সেতুর উপর দিয়ে এগিয়ে যেতে চাইল। যেন বরফ কাটতে শুরু করেছে বো। ‘ক্লিঙ্ক’ শব্দে কেঁপে উঠল চারপাশ। যে মেকানিকাল সিস্টেম সেতু পরিচালনা করে, সেটা বিপুল ওজনের চাপে খুলে গেল। ধাতব আওয়াজ তুলে হারিয়ে গেল সেতুর দু’পাশের দুই অংশ। ঝপাস্ করে খালের উপর নেমে এল মার্ভেল। মনে হলো সামান্যতম কমেনি গতি।

গাড়ি নিয়ে এগিয়ে চলেছে রানা। ওর মনে হলো জাহাজের পাশে গিয়ে বিধ্বস্ত হবে। পিছনের জিপ থেকে লোকগুলো বোধহয় ধরে নিয়েছে, সামনের লোকটা উন্মাদ, আত্মহত্যা করতে চলেছে।

আর পনেরো গজ, প্রতি ফুট লক্ষ করছে রানা। মাথার ভিতর ঝনঝন করছে সতর্ক ঘণ্টি। গগল বোধহয় ভুল হিসাব কষেছে! জাহাজের আর্মার্ড প্লেটে গিয়ে গুঁতো দেবে ও, সেখান থেকে পড়বে খালের ভিতর। ক্ষত-বিক্ষত লাশ নিয়ে ডুবে যাবে জিপ! পিছন থেকে এল গুলির আওয়াজ। মার্ভেলের উপর থেকে জবাব দিল কয়েকটা রাইফেল। অন্ধকার রেলিঙের ওপাশে কারা যেন!

আর কয়েক সেকেণ্ড! সবই গতি, অঙ্কের হিসাব ও গতিপথ। কিন্তু জুয়ায় হেরে গেছে রানা! শেষ মুহূর্তে ও ঠিক করল, ঘুরিয়ে দেবে স্টিয়ারিং হুইল। কিন্তু ঠিক তখনই সামনে বিকট এক হাঁ দেখল। খুলে গেছে বোট গ্যারাজ। ভিতরে জ্বলছে লাল ব্যাটল বাতি। নিখুঁত ভাবে রাস্তার পাশে মার্ভেলকে নিয়ে এসেছে গগল। ওই খোলা গ্যারাজের র‍্যাম্প দিয়ে নেমে যায় যোডিয়াক। রাস্তার এক ফুট দূর দিয়ে চলেছে ওটা, রাস্তা থেকে দু' ইঞ্চি নীচে।

সেতুর মুখে ঠিক পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার গতি নিয়ে রাস্তা ছাড়ল রানা। মাঝখানের এক ফুট দূরত্ব উড়ে পেরুল জিপ, সোজা গিয়ে ঢুকল মার্ভেলের ভিতর। দেরি না করে ব্রেক কষেছে রানা, তবে মুহূর্তে গতি থামিয়ে দিল রিইনফোর্সড নেটিং। ওটা ব্যবহার করা হয় হাই-স্পিড বোট ম্যানুভারিঙের সময়। হঠাৎ গতি থেমে যাওয়ায় ফুলে উঠেছে জিপের এয়ার ব্যাগ, ধাক্কা থেকে বাঁচাবার জন্য চেপে ধরেছে রানাকে।

বাইরে থেকে ভেসে এল কড়া ব্রেক কষবার আওয়াজ।

চাকাগুলো পেভমেণ্ট ছিঁড়ে নিতে চাইল। বদলে নিজেরা ক্ষয় হলো। দ্রুত স্টিয়ারিং ঘুরিয়েছে ড্রাইভার, থামতে চেয়ে ধাক্কা দিল জাহাজের খোলে। ধাতব বিশ্রী আওয়াজ হলো। মার্ভেল এগিয়ে চলেছে, ওটার পাশে কাত হয়ে রইল জিপ। জাহাজ দ্রুত সরছে। থ্রাস্টার সামান্য নাড়ল গগল. একটু সরেই চ্যাপ্টা করে দিল ওটাকে পাড়ের পাথরের সঙ্গে পিষে। দু'সেকেণ্ড শূন্যে ভেসে রইল ওটা, তারপর থেঁতলে যাওয়া লোকগুলোকে নিয়ে ঝপাস্ করে পড়ল ক্যানেলের ভিতর।

রানার জিপের পাশে চলে এল উর্বশী, দু'হাতে টেনে সরিয়ে দিল ডিফ্লেটেড এয়ারব্যাগ। যেন খেয়ালই করল না অন্য কেউ থাকতে পারে, চট্ করে চুমু দিল রানার গালে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তুমি সত্যিই পাগল!' লজ্জা পেয়ে সরে গেল নিজেই। খেয়াল করেছে ওর দিকে চেয়ে হাসছে ফারা ও সোহেল।

'সি' প্ল্যান শেষ পর্যন্ত তা হলে কাজে লাগল।' জিপ থেকে নেমে এল রানা। 'অমল কেমন আছে?'

'ফারার দায়িত্বে, ঘুমে কাতর।'

'ঠিক হয়ে যাবে।'

'জানি,' বলল উর্বশী। সরাসরি চাইল রানার চোখে। তারপর আস্তে করে চোখ নামিয়ে নিল। 'তোমাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে আর ছোট করব না।'

'আমরা এমনিতেই যথেষ্ট ছোট, তাই তো?' হেসে ফেলল রানা। 'চলো দেখে আসি অমলকে।'

'চলো যাই,' সোহেল, ফারা ও রানার পাশে রওনা হয়ে গেল উর্বশী। কয়েক পা গিয়ে বলল, 'এ-ই তোমার "সি" প্ল্যান? কেউ এমন পাগলামি করতে পারে?'

'ওর একটা "ডি" প্ল্যানও ছিল,' তথ্য যোগান দিল সোহেল।

'তবে ওটা এর চেয়ে সামান্য বিপজ্জনক ছিল।'

ফারার দিকে চাইল উর্বশী, তারপর আস্তে করে মাথা নেড়ে হাসল। নীরবে যেন বলতে চাইল, এ দুই বন্ধু কখন যে কী করবে শুধু তারাই জানে!

ষোলো

ডিমের কুসুমের মত সূর্যটা উঠতে শুরু করেছে আকাশে, এমন সময় এল হেলেনিক কোস্ট গার্ডদের প্যাট্রল ক্রাফট। তরতর করে চলেছে মার্ভেলের পাশে। ওটার কমাণ্ডার জানে না মার্ভেল প্রচণ্ড গতি তুলে পিছনে ফেলেছে কোরিন্থ ক্যানেল, চলে এসেছে ষাট মাইল দূরে। আপাতত চোদ্দ নট গতি তুলে ছুটছে। যে-কেউ বলবে এই পুরনো জাহাজ বহু কষ্টে এই গতি তুলেছে। চিমনি দিয়ে ভক-ভক করে বেরুচ্ছে কালো ধোঁয়া, বোঝা যায় অতিরিক্ত ডিজেল খরচ করছে ইঞ্জিন। চল্লিশ ফুটি প্যাট্রল বোটের কমাণ্ডার রেডিও করল মার্ভেলকে। তবে তার জানা, এই জং-ধরা জাহাজ নিয়ে ভাববার কিছু নেই। অপরাধ যেখানে সংগঠিত হয়, সে এলাকা থেকে অনেক দূরে এই জাহাজ। নিয়ম অনুযায়ী প্রশ্ন করতে হবে, তাই যোগাযোগ করছে।

'কই, না তো, ক্যাপ্টেন,' বিস্মিত কণ্ঠে বলল রানা। 'আমরা কোরিন্থের আশপাশেও ছিলাম না। পাইরিয়াসের দিকে যাচ্ছিলাম, আমাদের এজেন্ট রেডিও করে জানাল, বাতিল হয়ে

গেছে কণ্ট্রাক্ট। জলপাই তেল পৌঁছে দিতে হবে না মিশরে। এখন চলেছি ইস্তাম্বুলের পথে। আপনার কথা শুনে একটু অবাকই হচ্ছি। মনে হয় না আমার জাহাজ ওই ক্যানেলে ঢুকতে পারবে। এ বুড়ির কোমর বেশি মোটা।' অশ্লীল ভঙ্গিতে হেসে উঠল রানা। 'আমরা যদি কোনও ব্রিজে গুঁতো দিতাম, গুঁড়ো হয়ে যেত আমাদের বো। আপনি তো দেখছেন, আস্ত আছে এর বো। তবু যদি জাহাজে উঠতে চান, আপনি সাদরে আমন্ত্রিত।'

'না, তার দরকার পড়বে না,' বলল কমাণ্ডার। 'ওই দুর্ঘটনা ঘটে এখান থেকে এক শ' কিলোমিটার দূরে। কিন্তু ওখান থেকে এখানে আসতে এই জাহাজ লাগাবে কম পক্ষে আট ঘণ্টা।'

'আট ঘণ্টার ভিতর আসতে পারতাম, যদি পিছন থেকে জোর হাওয়া সাহায্য করত,' বলল রানা।

'আপনারা যদি কোনও জাহাজকে অস্বাভাবিক আচরণ করতে দেখেন, বা যদি দেখেন বো ভাঙা, সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। ঠিকাছে?'

'নিশ্চয়ই। আশা করি ধরা পড়বে কালপ্রিট। বেস্ট অভ লাক! দ্য গুড গুজ আউট।'

উইং ব্রিজ থেকে কাটারের দিকে হাত নাড়ল রানা, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঢুকে পড়ল পাইলট হাউসে। হুকে ঝুলিয়ে দিল রেডিও হ্যাণ্ড মাইক। মেঝের উপর পড়ে রইল প্যাঁচানো কর্ড।

'প্রতিবার আমন্ত্রণ জানাতে হয়, মাসুদ ভাই?' আপত্তির সুরে বলল জলিল খান। দাঁড়িয়েছে জাহাজের হুইলের সামনে। এতক্ষণ ভঙ্গি করেছে, যেন চালিয়ে নিয়ে চলেছে জাহাজ। 'যদি আসত?'

'আসত না। গ্রিক কর্তৃপক্ষ এমন এক জাহাজ খুঁজছে যেটা কোরিন্থের আশপাশে থাকবে।'

'কিন্তু যারা চাক্ষুষ দেখেছে সব? তারা তো সাক্ষ্য দেবে। ওরা একটু ঘাঁটাঘাঁটি করলেই দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে ফেলবে। জেনে যাবে ঘটনার সময় ওদিকে ছিল একমাত্র এই জাহাজই।'

'ঘাঁটুক, ততক্ষণে আমরা আন্তর্জাতিক জলসীমায় থাকব। আর খুঁজবে ওরা ''দ্য গুড গুজ'' নামের জাহাজ। আশপাশ থেকে অন্য জাহাজ সরে গেলেই ফ্যান-টেইল আর ফেয়ারলিডগুলো থেকে সরিয়ে নেব নাম, আবার ফিরবে মার্ভেল।' এক মুহূর্ত পর বলল রানা, 'আর যদি কেউ দেখে থাকে, সবই মনে রাখতে পারে, তাতেই বা কী? আমরা গ্রিসের ধারে-কাছেই থাকছি না।'

'মাসুদ ভাইয়ের মত সবই মাথার ভিতর রাখতে হয়,' মনে মনে নিজেকে জানান দিল জলিল খান।

'এবার প্রথম ওয়াচ আসবে, গিয়ে বিশ্রাম নাও তুমি। ঘুম থেকে উঠে কাশেমের কাছ থেকে অ্যাকশন-রিপোর্ট নেবে। ওটা বিকেল চারটেয় পৌঁছে দিয়ো আমার ডেস্কে।'

পাইলট হাউস ছেড়ে বেরিয়ে গেল জলিল। তার পাঁচ সেকেণ্ড পর এসে ঢুকল ফু-চুং। দু'হাতে দুটো বিয়ারের ক্যান। একটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। 'একেই বলে একেবারে ভীমরুলের চাকে ঢিল দেয়া, তাই না রে?'

বিয়ার নিয়ে খুলল রানা, চুমুক দিয়ে বলল, 'তোরা তো ওদের ওয়েব-সাইট দেখলি। সব তথ্য দিতে পারেনি ডিপ্রোগ্রামার। বোধহয় রেসপন্সিভিস্টরা গোপন কিছু লুকিয়ে রাখছে।'

'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সেটা কী? হয়তো কিছু জানা যাবে। তুই তো রেখে এসেছিস্ ছারপোকা।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'ওদের সিকিউরিটি হেডের

প্রথম কাজই হবে চারপাশে লিসেনিং ডিভাইস খোঁজা।'

'সেক্ষেত্রে...'

'হ্যাঁ, ধরে নে ছারপোকা কাজে আসছে না। কাজেই আমাদের নিজেদের কাউকে ঢুকিয়ে দিতে হবে ভিতরে।'

'আমি যাব।'

'মনে হয় না তোকে দিয়ে চলবে। আমাকে দিয়েও না। সে এমন কেউ হবে, যাকে দেখলে মনে হয় জীবনের উপর বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। এমন ভঙ্গি নেবে, অন্ধের মত কাউকে অনুসরণ করতে চাইছে।'

'আমাদের জলিল খান? চলবে?'

'খানিক মেলে। প্রেমে বারবার ব্যর্থ, কিন্তু কই, হাল তো ছাড়েনি। রেসপন্সিভিস্টদের সঙ্গে মানায়? ...না। উপযুক্ত নয় কাশেমও। আমি স্বর্ণার কথা ভাবছি। ভাল অভিনয় জানে। তবে অভিনয় করতে হবে ব্যর্থ-প্রেমিকার। কোনও মেয়ে গেলে সন্দেহ কম হবে।'

'ওর পরিচয়, ব্যাক গ্রাউণ্ড?'

ক্লান্ত হাসল রানা। 'এখন বাদ দে। ঘুমাতে হবে। তুই নিজেও চিন্তা কর্। পরে আমরা যখন ডিনারে বসব, তখন ভাবব কাকে পাঠানো যায়।'

গম্ভীর চেহারা করল ফু-চুং। 'ঠিক আছে। তবে "সি" প্ল্যানের মত কিছু না হলেই ভাল!' হাসি আর চাপতে পারল না।

'তোরা সবাই মিলে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে...' আপত্তি তুলল রানা। 'এত হাসির কী আছে? 'সি' প্ল্যান সফল হয়নি?'

বলেই হেসে ফেলল রানা। হো হো করে হেসে উঠল ফু-চুং। মার্ভেলের সবাই জানে ওই জটিল প্ল্যান তৈরি না থাকলে

মিশনের সবাই মস্ত বিপদে পড়ত। কিন্তু তার পরেও ওটাকে প্ল্যান না বলে তাদের ধারণা, জেনে শুনে নরকের আগুনে ঝাঁপ দেয়া। পাইলট হাউস থেকে এলিভেটরে উঠে পড়ল ওরা। রানা ঠিক করেছে কেবিনে ফিরে কমপক্ষে দশ ঘণ্টা ঘুমাবে। তবে তার আগে ঢুঁ দেবে একবার অপারেশন্স সেন্টারে।

এলিভেটর নেমে আসতেই বেরুল ওরা অপারেশন্স সেন্টারে।

নিজ ওঅর্ক-স্টেশনে কুঁজো হয়ে বসে কাজে ব্যস্ত আতাসি। ডেস্কের উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কাগজ, যেন ঝড়ে এলোমেলো। আতাসির মাথাটা চেপে ধরেছে হেডফোন। ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবছে। রানা পাশে থেমে যেতেই একটু চমকে গেল। হেডফোন খুলে চাইল।

'কী শুনলে?' জানতে চাইল রানা।

'বলতে গেলে তেমন কিছুই না, বস্।' হেডফোন বাড়িয়ে দিল আতাসি।

ওটা নিয়ে পরল রানা। কানে ভেজা অনুভূতি। কম্পিউটারের কয়েকটা কি টিপল আতাসি। স্ট্যাটিকের আওয়াজ পেল রানা। তারই ভিতর দিয়ে কীসের যেন আওয়াজ। কেউ কথা বলছে কি না নিশ্চিত হওয়া গেল না। হেডফোন খুলে আতাসির দিকে চাইল রানা। 'টেপের উপর স্ক্রাবার ব্যবহার করেছ?'

'স্ক্রাবারের পর এটা। দু'বার ব্যবহার করেছি।'

'স্পিকার ব্যবহার করো। প্রথম থেকে শুনি।'

নির্দিষ্ট সুইচ টিপল আতাসি, আবার শুরু হলো রেকর্ড। সন্দেহ নেই অ্যাক্টিভেট হয়েছে ছারপোকা। তারপর কে যেন ঘরের ভিতর ঢুকল।

'ও মাই গড্! না-না-না-না, এ হতেই পারে না।' এ কণ্ঠস্বর

ক্রিস ক্রিংগলের। খানিকটা আতঙ্কিত। তবে নিজেকে সামলে নিয়েছে। এবার ড্রয়ার টানার শব্দ। ধুপ করে বন্ধ হলো। লোকটা পরীক্ষা করে দেখল কিছু চুরি হয়েছে কি না। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ। চেয়ারে বসেছে। 'ঠিক আছে, মাথা ঠাণ্ডা রাখো, ক্রিস। এখন ক্যালিফোর্নিয়ায় ক'টা বাজে? তা ভেবেই বা কী হবে?' খুটখাট আওয়াজ তুলল একটা টেলিফোন হ্যাণ্ডসেট। তারপর দুই মিনিট নীরব। আবার কথা শুরু করল ক্রিংগল, 'মিস্টার কেসলার, আমি... ক্রিস ক্রিংগল।'

কেসলার মানে ডিয়েটস কেসলার, রেসপন্সিভিস্টদের সর্বোচ্চ নেতা।

'মিনিট পনেরো আগে একদল লোক আমাদের কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়েছিল। কোনও ধরনের রেসকিউ অপারেশন। আমাদের এক সদস্যকে ধরে নিয়ে গেছে তার ঘর থেকে... হ্যাঁ? হ্যাঁ... নাম অমল দাশা। না-না, এখন পর্যন্ত নয়। ক'দিন হলো আমাদের সঙ্গে ছিল... আমার সিকিউরিটি গার্ডরা বলছে বারোজন আসে। হ্যাঁ, পুরোপুরি সশস্ত্র... গার্ডরা জিপ নিয়ে ধাওয়া করেছে। এতক্ষণে বোধহয় ফিরিয়েও আনছে ছেলেটাকে। ...আমি আপনাকে ফোন করেছি ব্যাপারটা জানাতে।' দীর্ঘ বিরতি, স্ট্যাটিক ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই। তারপরঃ 'হ্যাঁ, আমার প্রথম কাজ ওকে ফোন করা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ভাল পয়সা খাইয়ে নিয়েছি। ওরা কাদা ঘাঁটবে না, বলবে স্থানীয় পুলিশ অস্ত্র স্মাগলারদের ধরতে চাইছে। বা আল-কায়েদাও বলতে পারে। কিছু একটা বানিয়ে দেবে... হ্যাঁ? আরেকবার বলুন। ...ফলাফল হতে পারে ভয়ঙ্কর... হ্যাঁ। ওরা প্রথমে আমার অফিসে ঢোকে, তারপর হাজির হয় ওই... এক মিনিট...অ্যাঁ?' একটু চড়ে গেল ক্রিংগলের কণ্ঠ, পরক্ষণে নামিয়ে

নিল গলা। 'না-না, ব্রাঙ্কোকে পাঠাতে হবে না। আমরাই এটা সামলে নেব... ছারপোকা? এ পুরো দেশ তো ভরা ছারপোকা দিয়ে। ওহ্! ইলেকট্রনিক বাগ্স্? মাই গড! ভাবিনি তো! দুঃখিত।'

ড্রয়ার টেনে খোলা ও বন্ধ করা শুরু হয়েছে। কী যেন খুঁজছে ক্রিস ক্রিংগল। তারপর খুব জোরে শুরু হলো স্ট্যাটিক। লোকটা ব্যবহার করেছে ইলেকট্রনিক জ্যামার। ছারপোকা থাকলেও কাজ করবে না।

রেকর্ডিং বন্ধ করে দিল আতাসি। 'আবার স্ক্রাবার ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু কাজ হবে না বোধহয়।'

'তাই আসলে, তবুও পরে চেষ্টা করে দেখো।' হাই চাপল রানা।

'এবার গিয়ে একটু ঘুমান, বস্,' বলল আতাসি।

'হ্যাঁ, ঘুমাব।' অনিলের দিকে চাইল রানা। 'একটু খুঁজে দেখিস তো কে এই ব্রাঙ্কো।'

'গুগলকে এ কাজের ভার দিয়েছি, তবে কাউকে পাইনি এ নামে। তবুও আবার চেষ্টা করে দেখব।'

'কাশেম কই?'

'মেডিকেলে। শুনলাম জলিল খান ঘুমাতে গেছে, সেই সুযোগে বাবুর্চির কাছ থেকে নাস্তা নিয়ে গেছে ওই মেয়েটার জন্য।'

হেলেন জিলের কথা ভুলে গিয়েছিল রানা। মনে পড়ল মেয়েটির কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নেই। যারা রয়েছে, ধরে নিয়েছে, জাহাজের সবার সঙ্গে ডুবে মরেছে হেলেন। আপাতত তাদের কিছু জানাবে না, ঠিক করেছে রানা। কেন জানে না, সতর্ক করছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। ভাল হয়েছে রেডিওতে ওরা জানায়নি

উদ্ধার করেছে মেয়েটিকে। আপাতত এ তথ্য গোপনই থাকুক।

যারা ওই জাহাজে হামলা করেছে, ভেবেছে সবাইকে খুন করেছে। তা-ই ভাবুক। তথ্য সব সময় বাড়তি সুযোগ এনে দেয়। পরে হয়তো সুবিধা মিলবে। মার্ভেলে নিরাপদে থাকুক হেলেন জিল। হেলমসের দিকে চাইল রানা। 'গগল, ইরাকলিয়ন-এ ইটিএ কখন?'

'ধরে নাও বিকেল পাঁচটা।'

ক্রিটের রাজধানীর উদ্দেশে চলেছে মার্ভেল। ওখান থেকে উর্বশী, ফু-চুং ও অমলকে গালফ-স্ট্রিমে তুলে নেবে ক্যাপ্টেন জাহিদ হাসান, পৌঁছে দেবে রোমে।

নিজ ওঅর্ক-স্টেশনে থামল রানা, মোফিজ বিল্লাহর জন্য কম্পিউটারে কিছু নোট দিল। ম্যাজিক শপে হেলেনের জন্য তৈরি করতে হবে পাসপোর্ট। যখন-তখন লাগতে পারে। নিজেকে মনে করিয়ে দিল, ওই মেয়ে সম্বন্ধে ফারার সঙ্গে আলাপ করতে হবে। তারপর নেবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। হেলেন থাকলে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারে ফারা। ফিজিয়োনমি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে কীভাবে বেঁচেছে মেয়েটা ওই টক্সিন থেকে। এমন হতে পারে ভুল ভেবেছে অনিল ও ফু-চুং, ওই জাহাজের খাবারে বিষ দেয়াই হয়নি!

দশ মিনিট পর নিজ কেবিনে ফিরল রানা, পোশাক পাল্টে শুয়ে পড়ল কটে। ঘুমিয়ে পড়ল দু'মিনিট পেরুনোর আগেই।

সতেরো

ডার্কো বোজান খুন করতে ভালবাসে।

আগে জানত না সে। তারপর ইউগোস্লাভিয়া জুড়ে শুরু হলো গৃহযুদ্ধ, যোগ দিতে হলো তাতে। সার্বিয়ান সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার আগে ছিল কনস্ট্রাকশন কর্মী, শখে খেলত হেভিওয়েট বক্সিং। তবে আর্মিতে এসে নিজের সত্যিকারের পরিচয় খুঁজে পেল সে। জ্বলজ্বলে পাঁচটি বছর নির্বিচারে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, খুন, ধর্ষণ চালিয়ে গেল। ইউনিটের প্রত্যেকে ছিল কঠোর প্রকৃতির মানুষ—ও ছিল তাদের মধ্যে কঠোরতম। পুরো সময়টা আনন্দে খুন করল তারা মুসলিম ক্রোয়েট ও বসনিয়ানদের। বিশেষ করে শিকার হলো কসোভোর মানুষগুলো।

তারপর উনিশ শ' নিরানব্বই-এ ঝামেলা শুরু করল বদের হাড্ডি ন্যাটো, বাধ্য হয়ে নিজের নাম পাল্টে নিতে হলো। শোনা গেল যারা মানবতাবিরোধী কাজ করেছে, তাদের শাস্তি দেয়া হবে। ডার্কো বোজান বুঝে গেল কর্তৃপক্ষ যে লিস্টি করবে, সেটার ভিতর প্রথম সারিতেই থাকবে তার নাম। কাজেই সেনাবাহিনী থেকে উধাও হলো সে। প্রথমে গেল বালগেরিয়া, তারপর সেখান থেকে ঠাঁই নিল গ্রিসে। নাম নিল: জ্যারোন ব্রাঙ্কো।

দৈর্ঘ্যে সে ছ'ফুট নয় ইঞ্চি, দেহের আকৃতি কুস্তিগীরদের মত। এথেন্সের আণ্ডারওয়ার্ল্ড-এ জায়গা করে নিতে দেরি হলো না তার। মস্তানি, মারপিট, ধর্ষণ ও খুন—সব কাজে সে দক্ষ। যে দলের হয়ে কাজ শুরু করল, সেটার বস্ বুঝল এক হীরার টুকরোর সন্ধান পেয়েছে। এলাকা দখল করার কাজ দেয়া হলো তাকে। এর কিছুদিনের মধ্যে এথেন্সের চার ভাগের এক ভাগ দখল করে নিল ওই দল। অর্গানাইযড-ক্রাইমের জগতে অনেক উপরের দিকে উঠে গেল জ্যারোন ব্রাঙ্কো। এরপর আলবেনিয়ানদের একটা ক্রিমিনাল গ্রুপের সবাইকে খুন করে হলো বসের ডেপুটি। এথেন্সের হেরোইন ব্যবসা চলে এল তাদের কব্জায়।

এথেন্সে কয়েক বছর থাকবার পর ইংরেজি বই পড়তে শুরু করল জ্যারোন ব্রাঙ্কো। ইংরেজি জানতে হবে তার, সংগঠন গড়তে হবে ব্রিটেন ও আমেরিকায় গিয়ে। কী পড়ছে তা নিয়ে ভাবতে যায়নি সে, বায়োগ্রাফি থেকে শুরু করে যা পাওয়া গেল হাতের কাছে—ইতিহাস, ভ্রমণকাহিনি, গল্প-উপন্যাস, পর্নোগ্রাফি—সবই গড় গড় করে পড়তে থাকল সে।

পড়তে পড়তেই একদিন হঠাৎ একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বইয়ের দোকানে পেল পোকায় কাটা একটা বই। তার পছন্দ হলো ওটার শিরোনাম: ***নিজেদের মৃত্যু ডেকে আনছি আমরা অতিরিক্ত সন্তান জন্ম দিয়ে।*** বইয়ের লেখক: ***ডক্টর লিঙ্ক চ্যাপেল।*** ভুল করে জ্যারোন ব্রাঙ্কো ভেবেছিল ওটা সেক্স বিষয়ক বই। ওটা কিনে বাড়ি ফিরল সে।

বইটা পড়তে শুরু করে বুঝতে পারল, গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত ও যা ভেবেছে, সব মিলছে বইটির বক্তব্যের সঙ্গে। পৃথিবীতে অতিরিক্ত মানুষ হয়ে গেছে। এখন

তাদের কমিয়ে না রাখলে একসময় ধ্বংস হবে পৃথিবী। ডক্টর চ্যাপেল একবারও কোনও ধর্ম বা জাতিকে ইঙ্গিত করেননি. তবে জাতিবিদ্বেষে অন্ধ জ্যারোন ব্রাঙ্কো ধরেই নিল ডক্টর চ্যাপেল নিচু জাতের মানুষগুলোকে শেষ করে দিতে বলেছেন। যেমন ছিল কসোভোর মুসলিমগুলো। তাদের খুন করে ঠিকই করেছে সে।

বর্তমান পৃথিবীতে শিকারি প্রাণীর মানুষ হত্যার সুযোগ কমে যাওয়ায়. মানুষের রোগবালাই কমে আসায়. ডিএনএ-তে সন্তান উৎপাদনের জোরালো তাগিদ থাকায়, আমরা নিজেদেরকে থামতে দেব না, আমরা শুধু বংশ-বৃদ্ধি করতেই থাকব—ফলে মারা পড়ব সবাই মিলে।

কাজেই বুঝে নিল জ্যারোন ব্রাঙ্কো, মানব-জাতির এখন দরকার শিকারি হিংস্র প্রাণী। যারা দুর্বল তাদের শেষ করে দিতে হবে। এর ফলে সুস্থরা ভাল ভাবে বাঁচবে। ডক্টর লিঙ্ক চ্যাপেল একবারও এ কথা লেখেননি, কিন্তু তাঁর লেখা থেকে এটাই বুঝে নিয়েছে জ্যারোন ব্রাঙ্কো—অতিরিক্ত মানুষ শেষ করে দেয়াই উচিত। এখন মানব-জাতির দরকার নতুন হিংস্র প্রাণী—যাদের কবলে পড়ে কমে আসবে মানুষ। ঠিক করে ফেলল জ্যারোন ব্রাঙ্কো, সে এই হিংস্র প্রাণীদের একজন হতে চায়।

এর কিছুদিন পর যখন জানল কোরিস্থের কাছে এক ফ্যাসিলিটি খুলেছে রেসপন্সিভিস্ট সংগঠন, তার মনে হলো সে সৌভাগ্যবান।

যেদিন সে ওদের কম্পাউণ্ডে এল, সেখানে ছিল স্বয়ং ডিয়েটস কেসলার। জ্যারোন জানাল এই সংগঠনকে সে তার সেবা দিতে চায়। এরপর আড়াই ঘণ্টা আলাপ হয় দু'জনের। কথা হয় ডক্টর লিঙ্ক চ্যাপেলের কর্ম ও সংগঠন নিয়ে। আবছা ভাবে রেসপন্সিভিস্টদের নীতির কথা বলে কেসলার, তবে

একবারও সার্বকে বলেনিঃ মানুষ নয়, আসলে সে একটা পশু।

'আমরা নিজেরা হিংস্র নই, ব্রাঙ্কো,' বলেছে কেসলার। 'তবে বহু লোক চায় আমাদের ক্ষতি হোক। তারা চায় না ছড়িয়ে পড়ুক আমাদের মহান নেতার বার্তা। এখন পর্যন্ত শারীরিক ভাবে আমাদের ক্ষতি করেনি কেউ, তবে জানি... এমন সময় আসবে যখন করবে। মানুষ চায় না আমরা বলি *তোমাদের কারণে ক্ষতি হচ্ছে পৃথিবীর*। সময় আসছে, যখন আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে মানুষ, এবং তখন নিজেদের আত্মরক্ষা করতে হবে। আর সেই কাজে সাহায্য করতে পারেন আপনি।'

কথাগুলো ভাল লাগে জ্যারোন ব্রাঙ্কোর। এরপর সরে আসে অপরাধ-সংগঠন থেকে, কাজ নেয় রেসপন্সিভিস্টদের সিকিউরিটি চিফ হিসাবে। নিজেকে মহান মনে হয় তার। এখন আর সে কোনও ড্রাগলর্ডের দোসর নয়, কাজ করছে মানবতার স্বার্থে।

ক্রিস ক্রিংগলের চেহারা চকচক করছে ডেস্কের পিছনে, জ্যারোন ব্রাঙ্কো এসে অফিসে ঢুকতেই ঝিকঝিকে হাসি দিল সে। তবে দ্রুত মিলিয়ে গেল সেই হাসি।

ডিয়েটস কেসলারের সান্নিধ্যে গিয়ে অনেক লাভ হয়েছে ক্রিংগলের। গাড়ি চুরির ব্যবসা ধরা পড়তে চলেছিল, এমন সময়ে লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। পুলিশ তো প্রায় ধরেই ফেলেছিল। আর এখন থাকে সে কম্পাউণ্ড থেকে খানিক দূরে, সাগর পারের বিশাল এক বাড়িতে। না চাইলেও বিছানায় উঠতে চায় অসংখ্য মেয়েমানুষ। রেসপন্সিভিস্ট মেয়েরা আবার সবসময় একটু বেশি আগ্রহী। হয়তো এই কারণেই মনে হয়—সত্যি, দুনিয়া জুড়ে অতিরিক্ত মানুষ হয়েছে। বিশেষ করে মেয়েমানুষ। মানুষ কমলে ভাল,

ঠিক কথাই বলা হয় রেসপন্সিভিজমে। তবে ভিন-গ্রহবাসী নিয়ে যে গল্পটা চালু করা হয়েছে, তা একবিন্দুও বিশ্বাস হয়নি তার। মনেপ্রাণে সত্যিকারের সেলসম্যান সে, কাজে নেমে কোনও কষ্ট হয়নি, সহজেই পটিয়ে ফেলেছে কেসলারকে। তার ভাব দেখে মনে হয়েছে সবার চেয়ে অনেক বেশি বুঝেছে, রেসপন্সিভিজম গ্রহণ না করলে ধ্বংস হয়ে যাবে গোটা পৃথিবী।

ডিয়েটস কেসলার ও তার স্ত্রী মাস্টার প্ল্যান বানিয়েছে, সে সেটা কার্যকর করেছে। জাহাজ ভরা একগাদা বড়লোক মারা পড়লে তার কী?

তবে এই জ্যারোন ব্রাঙ্কো সামনে এলেই বুক কাঁপে তার। বিশালদেহী সার্ব সাইকোপ্যাথ, তার চিন্তা শুধু অত্যাচার-ধর্ষণ-খুন নিয়ে। এ লোকের অতীত তার জানা নেই, তবে আন্দাজ করতে পারে। ইউগোস্লাভিয়ায় উনিশ শ' নব্বুই দশকের শেষ দিকে এথনিক ক্লিনজিঙের সময় নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল। ব্যাটা এখন এখানে এসেছে কেন? অমল দাশাকে আবারও ধরে আনবার চেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। এই লোকের উপর কাজটার দায়িত্ব দিয়েছে কেসলার? ক্রিংগল জানে, সে নিজেই সব সামলে নিতে পারত। কিন্তু এই লোক এখন ওর ঘাড়ের উপর শ্বাস ফেলবে। প্রতিটা খুঁটিনাটি সবকিছু রিপোর্ট করবে কেসলার ও তার স্ত্রীর কাছে। এ কথা ঠিক যে, ও বুঝে ওঠেনি অফিসে ছারপোকা থাকতে পারে। তাতেই বা কী? জ্যামার চালু করবার আগে গুরুত্বপূর্ণ কোনও কথা সে উচ্চারণ করেনি। এমন কিছু ঘটেনি যে এই জানোয়ারটাকে পাঠাতে হবে।

ক্রিস ক্রিংগল কিছু বলবার আগেই নিজের ঠোঁটের উপর আঙুল রাখল ব্রাঙ্কো। ডেস্কের সামনে চলে এল, বন্ধ করে দিল জ্যামার, কালো লেদার জ্যাকেটের ভিতর পকেট থেকে বের

করল একটা ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র। ওটা দিয়ে তাক করল ঘরের চারদিকে। লোকটার খুদে দুই চোখ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখছে ইলেকট্রনিক রিডআউট। চলে গেল বুক শেলফের কাছে, দেখল আসবাবপত্র ও কার্পেট। সন্তুষ্ট হয়ে আবার পকেটে রেখে দিল জিনিসটা।

'তার মানে এখানে কোনও...'

অভিযোগের দৃষ্টিতে ক্রিংগলের দিকে চাইল ব্রাঙ্কো। সিটের ভিতর আরেকটু গেঁথে গেল ক্রিংগল।

ডেস্ক ল্যাম্প তুলল ব্রাঙ্কো, ওটার তলা থেকে খুলে নিল লিসেনিং ডিভাইস। এই ব্র্যাণ্ডের জিনিস আগে দেখেনি। নতুন কিছু। ছারপোকাটা খুবই ছোট, কাজেই এক মাইলের ভিতর থাকবে বুস্টার ট্র্যান্সসিভার। ওটা রিট্র্যান্সমিট করবে কোনও স্যাটালাইটকে। তার মাধ্যমে তথ্য পাবে শত্রুপক্ষ।

'অধিবেশনের এইখানেই সমাপ্তি,' মাইক্রোফোনে বলল সে। এমন সুরে বলেছে, কেউ বুঝবে না সে কোন্ দেশের লোক। মোটা দুই আঙুলে টিপে ভাঙলো লিসেনিং ডিভাইস, তারপর জুতোর নীচে পিষে ফেলল। জিনিসটা ধূলির কণা হয়ে যাওয়ার পর চাইল ক্রিংগলের চোখে। 'আমরা এবার কথা বলতে পারি।'

'শুধু ওই একটাই ছিল তো?'

কষ্ট করে জবাব দিল না ব্রাঙ্কো। 'ওই লোকগুলো যেখানে যেখানে গেছে, সবখানে দেখতে হবে।' কাজটা কঠিন, তবে জরুরি। 'লোকগুলো কোথায় গেছে তার ম্যাপ এঁকেছে গার্ডরা?'

'নিশ্চয়ই। তবে লাগবে না ওটা। শুধু আমার অফিসে এসেছে, আর ঢুকেছে ডরমিটরির ভিতর।'

মাথার ভিতর ব্যথা শুরু হলো ব্রাঙ্কোর। এই ক্রিংগল লোকটা এত নির্বোধ হয় কী করে! নিজেকে শান্ত করতে চাইল সে।

আবার শুরু করল, তবে ইংরেজিতে জোরালো টান, 'ওরা দেয়াল টপকেছে, পেরিয়েছে উঠান, তারপর ঢুকেছে দালানের ভিতর। এখান থেকে ডরমিটরির ভিতর, তারপর দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে গেছে বাইরে। এই পথে যে-কোনও জায়গায় ছারপোকা ফেলতে পারে। ফুটপাথে, ঝোপে, গাছে, দেয়ালের উপর—যে কোনখানে।'

'ও। দুঃখিত, আমি কথাটা বুঝতে পারিনি।'

বাঁকা চোখে ক্রিংগলের দিকে চাইল ব্রাঙ্কো, মনে হলো নীরবে বুঝিয়ে দিল—ঠিক, তুমি কিছুই বোঝোনি। 'আর কী আছে ওই কম্পিউটারের ভিতর? নতুন মিশনের ব্যাপারে কিছু?'

'না, নেই। ওসব আছে আমার সিন্দুকের ভিতর। প্রথমে ওটা পরীক্ষা করেছি, তারপর যোগাযোগ করেছি মিস্টার কেসলারের সঙ্গে।'

'জিনিসগুলো আমার হাতে তুলে দিন,' সরাসরি নির্দেশ দিল ব্রাঙ্কো।

ক্রিংগল একবার ভাবল মানা করে দেবে, নিজে যোগাযোগ করবে ডিয়েটসের সঙ্গে। কিন্তু জানে সিকিউরিটির ব্যাপারে ব্রাঙ্কোকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে লোকটা। এখন তাকে কিছু বলে লাভ হবে না। থাক, লোকটার ওই প্ল্যানের সঙ্গে নিজেকে না জড়ানোই ভাল। সোজা কথা বুঝতে পারছে সে, সময় হয়েছে এখান থেকে কেটে পড়বার। এই যে ঝামেলা হলো, সেটাই বুঝিয়ে দিয়েছে, বাপু ক্রিংগল, কেটে পড়ো, বেরিয়ে যাও টাকা-পয়সা নিয়ে। গ্রিসের এই রিট্রিট থেকে প্রায় এক মিলিয়ন ডলার সরিয়েছে সে। ওই টাকা দিয়ে বাকি জীবন চলবে না, তবে নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারবে। অন্য কোথাও গিয়ে নতুন করে শুরু করবে সব।

ডেস্কের পিছন থেকে উঠে দাঁড়াল ক্রিংগল, দ্রুত চলে গেল সোফার পাশে। ব্রাঙ্কো আসবাবপত্র সরাতে হাত লাগাল না। চেয়ার-টেবিল-সোফা একা সরাল ক্রিংগল, গুটিয়ে রাখল প্রাচ্যের কার্পেট। ওটা সরে যাওয়ায় একটা ট্র্যাপডোর দেখা গেল। তার নীচে মেঝের বুকে মাঝারি আকৃতির এক সিন্দুক।

'আমি যখন অফিসে ঢুকি ঠিক এমনই ছিল টেবিল-চেয়ারগুলো। কাজেই বলতে পারি, কিছুই সরাতে পারেনি। নিশ্চয়ই দেখছেন চাবির ফুটোর উপর মোমের সিল?'

ব্রাঙ্কো বলতে গেল না, যে দক্ষ দল এই কম্পাউণ্ডে ঢুকেছে, তারা ইচ্ছা করলে সবই আগের মত করে রেখে যেতে পারে। একটু খেয়াল করলে মোমের সিল নকল করা যায়। হাতে সময় পেলে হয়তো তাই করত। তবে সিন্দুক নিয়ে আপাতত চিন্তিত নয় ব্রাঙ্কো। যে ফাইলে অমল দাশার তথ্য রয়েছে, সেটা দরকার তার। ওটা থেকে অনেক কিছু বেরিয়ে আসতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়ার যে মহিলা তার ভাইকে ফিরে পেতে উদ্ধারকারী দলকে ভাড়া নিয়েছে, সে নিশ্চয়ই আরও কিছু করেছে। ভাড়া করেছে কোনও ডিপ্রোগ্রামারকে। আর সে লোক সম্ভবত হবে লিয়োনার্দো চার্চ।

লোকটার কথা ভাবলেই বুকের ভিতর রাগ অনুভব করে ব্রাঙ্কো। জানে না পাকিয়ে ফেলেছে দুই মুঠো।

'এই যে,' বলল ক্রিংগল। সিন্দুক থেকে বের করে এনেছে স্ট্রংবক্স। ওটার উপর ইলেকট্রনিক কি-প্যাড। কয়েকটা সংখ্যা টাইপ করল সে, প্রায় ভেঙচি কেটে চাইল ব্রাঙ্কোর দিকে। 'বক্সের মেমোরি বলছে চারদিন আগে এটা খোলা হয়েছে। সে সময় মিস্টার কেসলারের কাছ থেকে আপডেট নিই।'

দশ বছরের ছেলেও স্ট্রংবক্সের তালা রিপ্রোগ্রাম করতে

পারবে। লাগবে শুধু ইউএসবি কর্ড আর একটা ল্যাপটপ। তবে কথা বাড়াল না ব্রাঙ্কো, শুধু বলল, 'খুলুন।'

পাস কোড নম্বর দিল ক্রিংগল, কয়েক সেকেণ্ড পর বিপ-বিপ আওয়াজ তুলল বাক্স, তারপর খুলে গেল ঢাকনি। ভিতরে রয়েছে তিন ইঞ্চি পুরু ম্যানিলা ফোল্ডার। ডানহাত বাড়িয়ে দিল ব্রাঙ্কো, যেন নিঃশব্দে বলছে, দাও ওটা।

ফাইল বাড়িয়ে দিল ক্রিংগল। ফোল্ডার নিয়ে পৃষ্ঠাগুলো দ্রুত পরীক্ষা করতে লাগল সার্ব। ওগুলোতে আছে নামের লিস্ট, জাহাজ, বন্দর, শিডিউল, ইত্যাদির বিবরণ। সঙ্গে জাহাজের ক্রুদের সংক্ষিপ্ত জীবনী। সংশ্লিষ্ট নয় এমন কারও কাছে ওগুলোর কোনও মূল্য নেই। যে তারিখগুলো রয়েছে, সেগুলো আগামী কিছুদিনের।

'সিন্দুক বন্ধ করে দিন,' বলল ব্রাঙ্কো, খানিক অন্যমনস্ক। খুলছে ফাইলের পৃষ্ঠাগুলো, আবার বন্ধ করছে।

লোকটার কথা মেনে নিল ক্রিংগল, স্ট্রংবক্স রেখে দিল ভিতরে, আটকে দিল সিন্দুক। 'পরে আমি আটকে দেব মোম-গালা সিল।'

কড়া চোখে তার দিকে চাইল ব্রাঙ্কো।

'বা, এখন করলেই বা ক্ষতি কী,' তেলতেলে হাসি হাসল ক্রিংগল। মোম রাখে ডেস্কে, আর সিল বলতে ব্যবহার করে তার স্কুলের আঙটি। ওটা যোগ্যতা দিয়ে অর্জন করেনি, চুরি করেছিল। কয়েক মিনিট পর আবারও মেঝের উপর কার্পেট বিছিয়ে দিল সে। তার উপর রেখে দিল কাউচ, চেয়ার ও কফি টেবিল। সব ঠিকভাবে রাখবার পর সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে চাইল ব্রাঙ্কোর দিকে।

'এই ফাইল সম্পর্কে কিছু জানে অমল দাশা?' ফাইল তুলে

দেখাল ব্রাঙ্কো। তার ভাব দেখে মনে হলো সে বুকের কাছে ধরে রেখেছে পবিত্র বাইবেল।

'না। মিস্টার কেসলারকে আমি জানিয়েছি। মাত্র কয়েক দিন আগে এসেছে সে। ওয়াশিং মেশিনগুলো দেখেছে, তবে পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছুই জানে না।'

কথাগুলো হালকা ভঙ্গিতে বলেছে ক্রিংগল। সন্দেহ জেগে উঠল ব্রাঙ্কোর মনে দু'জন যেন একই সঙ্গে টের পেল, ঘরের ভিতর কয়েক ডিগ্রি নেমে গেছে তাপ। একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ক্রিংগল। ব্রাঙ্কো বেরিয়ে গেলেই বাড়ি ফিরবে সে, জরুরি কিছু জিনিস নিয়েই উঠে পড়বে বিমানে। যাবে সোজা জুরিখে। ওখানে নাম্বার্ড অ্যাকাউন্ট আছে তার।

'তবে ছেলেটা গুজব শুনে থাকতে পারে,' স্বীকার করল ক্রিংগল।

'কী ধরনের গুজব, ক্রিংগল?'

যে ভঙ্গিতে তাকে ডাকছে ব্রাঙ্কো, ভাল লাগছে না ক্রিংগলের। অজান্তে বিশাল ঢোক গিলল। 'এই যেমন, কয়েকটা ছেলে ক্রুজ শিপে ভ্রমণের কথা বলছিল। যেমন ওই গোল্ড অভ মার্স। ওদের ধারণা ওইরকম বিরাট পার্টি হবে।'

প্রথমবারের মত নিজেকে শীতল রাখতে পারল না ব্রাঙ্কো। ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল, 'আপনি কি জানেন ওখানে কী ঘটেছে?'

'না। এখানে কাউকে খবরের-কাগজ পড়তে বা ইণ্টারনেট ব্যবহার করতে দিই না আমি। নিজেও এ নিয়ম মেনে চলি। কেন, ওখানে কোনও ঝামেলা হয়েছে?'

ব্রাঙ্কোর মনে পড়ল, সকালে যখন ক্যালিফোর্নিয়ায় ফোন করে, ডিয়েটস কেসলার জানিয়ে দেন: *তোমার যেটা ভাল মনে*

হয়, তাই করতে পারো। ওই কথার মানে এখন বুঝতে পারছে সে। যা বলবার বলে দিয়েছেন রেসপন্সিভিস্টদের নেতা। শীতল চোখে গাড়ি-চোরের দিকে চাইল ব্রাঙ্কো। 'আচ্ছা, ক্রিংগল, তুমি কি জানো তোমাকে বিশ্বাস করেন না মিস্টার কেসলার?'

'কোন্ সাহসে এ কথা বললে!' বুকে ভীষণ ভয় নিয়ে ফুঁসে উঠল ক্রিংগল। গলা চড়িয়ে দিয়েছে। 'উনি আমাকে এই রিট্রিটের দায়িত্ব দিয়েছেন! আমার দায়িত্বে ট্রেইনিং নিচ্ছে সবাই! তোমার চেয়ে আমাকে কম বিশ্বাস করবেন কেন উনি!'

'তুমি ঠিক বললে না, মিস্টার ক্রিংগল। কারণ দু'দিন আগে আমি গোল্ড অভ মার্সে উঠি এক্সপেরিমেন্ট সফল করতে। দারুণ কাজ হয় এক্সপেরিমেন্টে। যেভাবে ধারণা করা হয়েছে, ঠিক সেভাবে মরল জাহাজের সবাই। কী রকম কষ্ট পেয়ে মরেছিল তা তুমি দুঃস্বপ্নেও দেখবে না কোনদিন।'

'কী বললে?' চমকে গেল ক্রিংগল। জানে না প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছে। এই ভয়ঙ্কর সংবাদ পেয়ে মাথার ভিতর কেমন যেন লাগছে তার। মাথা ঘুরতে শুরু করল। এত ঠাণ্ডা ভঙ্গিতে কথা বলে কী করে লোকটা! যেন প্রিয় কোনও আর্ট বা শিশুদের ঘুম পাড়ানোর গল্প করছে। অজান্তেই কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে।

'ওরা সবাই মরেছে। বাঁচতে পারেনি একজনও। জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছি। আগে ওটার ব্রিজ দখল করেছি, তারপর ছড়িয়ে দিয়েছি ভাইরাস। এমন কেউ নেই যে দুনিয়াকে জানিয়ে দেবে কী ঘটেছে ওখানে। আর কী অদ্ভুত ভাইরাস! যেন জাহাজে লেলিহান আগুন ধরল! এক ঘণ্টাও টিকল না মানুষগুলো। শিশু হোক আর বুড়ো—একই সময়ে বিদায় নিয়েছে। আমাকে কে ঠেকাবে, লাশ তো আর বাধা দিতে পারে না।'

ডেস্কের পিছনে চলে গেছে ক্রিংগল, তার ভাব দেখে মনে

হলো মাঝখানের এই ছোট্ট বাধা তাকে রক্ষা করবে। হাত বাড়িয়ে দিল ফোনের দিকে। 'আমি মিস্টার কেসলারের সঙ্গে কথা বলব। তুমি মিথ্যা বলছ।'

'ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করো।'

হ্যাণ্ডসেটের উপর ভাসছে ক্রিংগলের হাত। বুঝতে পারছে, ও যদি কেসলারের সঙ্গে কথা বলে, আর সে যদি জানায় এই নৃশংস পশুটা সত্যিই ওই কাজ করেছে... হায় ঈশ্বর! দুটো চিন্তা মাথার ভিতর গুঁতো দিল তার। প্রথম কথা, আমার মাথার অনেক উপর দিয়ে চলছে এসব। দ্বিতীয় কথা, ওই ব্রাঙ্কো এই অফিস থেকে ওকে প্রাণ নিয়ে বেরুতে দেবে না।

'তোমাকে ওই অপারেশন সম্বন্ধে কতটুকু বলেছেন মিস্টার কেসলার?' জানতে চাইল ব্রাঙ্কো।

প্রাণপণে চাইল ক্রিংগল, লোকটা কথা বলুক। ওর ডেস্কের নীচে একটা সুইচ আছে, ওটা বাইরের অফিস থেকে ডেকে দেবে ওর সেক্রেটারিকে। ব্রাঙ্কো নিশ্চয়ই কারও সামনে খুন করবে না?

'অ্যাঁ... হ্যাঁ... মিস্টার কেসলার জানান আমাদের রিসার্চার টিম ফিলিপিন্সে ছিল। তারা একটা ভাইরাসের উপর ইঞ্জিনিয়ারিং করে। ওই ভাইরাস মানুষের শিরার ভিতর ভীষণ প্রদাহের সৃষ্টি করে। ফুলে যায় শিরা, আরও কীসব যেন। উনি আরও বলেন ওই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে দশজনের ভিতর তিনজন বন্ধ্যা হয়ে যায়। আর কখনও সন্তান নিতে পারে না। এমন কী ভাইট্রো টেকনিক ব্যবহার করেও না। আমাদের পরিকল্পনা: বেশ কিছু ক্রুজ শিপে ছেড়ে দেব ওই ভাইরাস। ওখানে তারা বদ্ধ এলাকায় ইনফেক্টেড হবে।'

'এটা তো পরিকল্পনার ছোট্ট একটা অংশ,' বলল ব্রাঙ্কো।

'তো বাকি অংশ কী?' *শালী মেয়েলোকটা আসছে না কেন?*

'ওই ভাইরাসের ব্যাপারে যা বললে, সবই ঠিক, তবে আরও বহু কিছু তুমি জানো না।' হাসতে শুরু করেছে ব্রাঙ্কো। 'ভাইরাসটা খুবই ছোঁয়াচে, চারমাস ধরে আশপাশে যাকে পাবে তার বারোটা বাজিয়ে দেবে। ওটার তেমন কোনও সিম্পটমও নেই। তার মানে বেশ কিছু ক্রুজ শিপে ছড়িয়ে দিলে দুনিয়ার চারপাশে ছড়িয়ে যাবে ভাইরাস। কোটি কোটি মানুষ বন্ধ্যা হবে। পুরুষ-নারী এমন কী শিশুরাও। তুমি ভুল জানো, দশজনের ভিতর বন্ধ্যা হবে আটজন। আমরা হাজার হাজার মানুষ নিয়ে ভাবছি না, কয়েক শ' কোটি নিয়ে ভাবছি। পঞ্চাশ বছরের ভিতর পৃথিবীর জনসংখ্যা নেমে আসবে বিশ থেকে পঞ্চাশ কোটিতে। আরও আছে, ক্রিংগল, প্রয়োজন পড়লে আমরা গোল্ড অভ মার্সে যে ভাইরাস ছাড়ি, সেটা ব্যবহার করতে পারি। ওটার টিকা রয়েছে শুধু আমাদের হাতে। চাইলে তিনদিনের ভিতর সাফ করে দিতে পারি সাত বিলিয়ন মানুষকে।'

জানে না কখন নিজের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়েছে ক্রিংগল। মুখ নড়ছে তার, তবে জিভ নড়ছে না, একটা কথাও বলতে পারছে না। গত তিনটে মিনিট যেন স্টিমরোলার চালানো হয়েছে তার ওপর দিয়ে। ওই গোল্ড অভ মার্স... অন্তত এক শ' লোককে চিনত সে! না, আরও বেশি! আর এসব কী বলছে এই পিশাচ! দুই বছর ধরে সে নিজে এই লোকগুলোর হয়ে কাজ করেছে! কমপক্ষে বন্ধ্যা হবে চার শ' বিলিয়ন মানুষ!

কয়েকটা ক্রুজ শিপের সমস্ত মানুষ বন্ধ্যা হলে তার কিছুই যেত আসত না, ভাবছে ক্রিংগল। মানুষগুলো জীবন নিয়ে হতাশ হয়ে পড়ত, কিন্তু প্রাণ তো বাঁচত। আর সবকিছুর ভাল-মন্দ দিক থাকে, সেটা ভেবেছে সে, এতিমখানাগুলো ফাঁকা হয়ে যেত। বাচ্চাগুলো পেত নতুন করে কোনও বাবা-মা।

কিন্তু এরা যা করতে চাইছে... আগেই বোঝা উচিত ছিল তার, সব হাতের বাইরে চলে যাবে। ওর মনে পড়ল ডক্টর চ্যাপেলের বইয়ের বক্তব্য:

মানুষ সেইসব সময়ে সবচেয়ে বেশি সম্পদ অর্জন করেছে, যখন ইউরোপের তিনভাগের এক ভাগ মানুষ প্লেগে মারা গেল। অন্যরা বিপুল জমি নিজেদের ভিতর ভাগ করে নিল। তাদের জীবনযাত্রা অনেক উচ্চস্তরে পৌঁছুল। শুধু সম্পদের মালিক নয়, তাদের হয়ে যারা কাজ করেছে, খুলে গেল তাদেরও কপাল। কাজের লোকের অভাব, কাজেই তৈরি হলো যন্ত্রপাতি। এ থেকে প্রমাণ হয় প্লেগের কারণে অন্ধকার সময় থেকে বেরিয়ে এল গোটা ইউরোপ, এবং দুনিয়ার উপর কর্তৃত্ব অর্জন করল শ্বেতাঙ্গ-জাতি।

'আমরা অন্ধের মত ডক্টর চ্যাপেলের কথা অনুসরণ করেছি, এবং কাজ করে গেছি,' বলল ব্রাঙ্কো। তার কথাগুলো ক্রিংগলের শূন্য অন্তরে প্রতিধ্বনি তুলল।

ডেস্কের এপাশে সে নিরাপদ, ভেবেছে ক্রিংগল। কিন্তু তার জানা নেই কত শক্তিশালী ওই বিশালকায় সার্ব। ওর মনে হলো ডেস্ক যেন কার্ডবোর্ডের বাক্স। ওটা তার দিকে ঠেলে দিল ব্রাঙ্কো, চেয়ার সহ দেয়ালে গেঁথে গেল ক্রিংগল। চিৎকার করবার জন্য হাঁ করল, বেটিকে ডাকতে হবে! খুব দ্রুত এগোলো না ব্রাঙ্কো, ফলে গলার ভিতর থেকে ক-ক্! আওয়াজ বেরুল ক্রিংগলের, পরক্ষণে তার কণ্ঠার উপর এসে পড়ল জ্যাব। অক্ষিকোটরের ভিতর বিশাল হয়ে উঠল ক্রিংগলের চোখদুটো। বাতাস টেনে নিতে চাইল, কিন্তু পেল না এক ফোঁটা দম।

অফিসের চারপাশ দেখছে ব্রাঙ্কো। এখানে এমন কিছু নেই যেটা দিয়ে ক্রিংগলের মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেয়া

যায়। তারপর তার চোখ পড়ল দেয়ালের উপর। ওখানে ঝুলছে ছবি। মুখগুলো দেখতে শুরু করল ব্রাঙ্কো। পাঁচ সেকেণ্ড পর বুঝল কী ব্যবহার করতে হবে। ক্রিংগলের ফুসফুস ব্যস্ত হয়ে বাতাস চাইছে, খাবি খেয়ে চলেছে সে। তাকে ছেড়ে দেয়ালের সামনে চলে গেল ব্রাঙ্কো, দেখছে পার্লা মোনার ছবি।

তুই বেটি বেশি শুঁটকি, বিছানায় তুই... নাহ্, সিদ্ধান্ত নিল ব্রাঙ্কো। তবে ক্রিংগল বোধহয় পছন্দ করত। কে বলবে সে পার্লা মোনার প্রেমে পড়েনি? এক টানে ছবি খুলে নিল ব্রাঙ্কো, ফ্রেম থেকে সরিয়ে নিল কাঁচ। ডেস্কের উপর আছড়ে ভাঙল ওটা।

একহাতে সিটের সঙ্গে ক্রিংগলকে ঠেসে ধরল সে, অন্য হাতে বড় এক টুকরো কাঁচ নিল, দৈর্ঘ্যে পাঁচ ইঞ্চি ড্যাগারের মত—ওটা দিয়ে ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ করে কাটতে লাগল কণ্ঠনালী। বামহাতে মুঠো করে ধরে রেখেছে ক্রিংগলের মাথার চুল। গলার ফাঁক হয়ে যাওয়া জায়গা দিয়ে ছিটকে বেরুল কালচে রক্ত, ভাসিয়ে দিল ডেস্ক। সেখান থেকে পড়ছে কার্পেটের উপর। ঘড়ঘড় আওয়াজ শুরু করল ক্রিংগল। সিটের উপর দাপিয়ে চলেছে। তবে ছিটকে পড়বার উপায় নেই তার। বিশাল মুঠোয় তার চুল টেনে ধরে রেখেছে ব্রাঙ্কো। বিদঘুটে আওয়াজ বেরুল ক্রিংগলের গলা থেকে। তবে সেই শব্দ দেয়ালের ওপাশে পৌঁছবে না। কমে আসছে লোকটার দাপাদাপি। আড়াই মিনিট পর স্থির হলো। বুকের উপর মাথা নামিয়ে দিল ব্রাঙ্কো। খেয়াল করেছে সরে গেলে পদচিহ্ন পড়বে না। দুই টানে আগের জায়গায় নিয়ে এল ডেস্ক। ক্রিংগলের পাশে চলে গেল, লাশ সহ ঘোরাল চেয়ার। তুলে নিল ক্রিংগলকে, উল্টো ভাবে বসিয়ে দিল চেয়ারে। ঠেলে দিল ডেস্কের কাছে। সিটের দু'পাশে ঝুলছে দুই পা, কাটা ক্ষত পড়ল চেয়ারের কাঁধের উপর। মাথা কাত হয়ে

রইল। পায়ের কাছে ফেলল ওই কাঁচের টুকরো। করোনার বুঝে নেবে এই অবস্থায় অতিরিক্ত রক্ত হারিয়ে মৃত্যু হয়েছে। পাশেই পার্লা মোনার ছবি ফেলল ব্রাঙ্কো। ওটাই বলে দেবে মৃত্যুর আগে ওটার দিকে চেয়ে ছিল ক্রিংগল।

প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা।

নিঃশব্দে দরজার কাছে চলে গেল ব্রাঙ্কো, বেরিয়ে এল কামরা থেকে। এইমাত্র এসে ঢুকেছে ক্রিংগলের সেক্রেটারি, হাতে সিরামিক কফি কাপ। আরেক হাতে বড়সড় পার্স। মহিলার বয়স হবে পঞ্চাশ মত। চুলগুলো বিশ্রী ভাবে ডাই করেছে। দেহ থেকে কমপক্ষে আশি পাউণ্ড ওজন কমিয়ে ফেলা খুবই জরুরি।

'হ্যালো, ব্রাঙ্কো, কেমন আছেন?' মিষ্টি করে হাসল মহিলা।

এর নাম মনে নেই ব্রাঙ্কোর। কাজেই বলল, 'মিস্টার ক্রিংগল অফিসে চলে এসেছেন। বুঝতেই পারছেন, গত রাতে যা হলো, সেজন্য মন খারাপ।'

'হ্যাঁ, খুবই বিশ্রী ব্যাপার।'

'আসলেই তাই।' মাথা দোলাল ব্রাঙ্কো। টের পেল পকেটের ভিতর থরথর করছে সেল-ফোন। 'আমাকে বলেছেন আজ যেন তাঁকে বিরক্ত না করি।'

'আশা করি আপনি বের করতে পারবেন কারা এসব করছে। বেচারা ছেলেটাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল।'

'তাই আজ আমাকে ডেকেছেন মিস্টার ক্রিংগল।' মনে পড়ল ব্রাঙ্কোর, বেটির নাম অ্যাবাগেইল ওব্রায়ান। ফোনের স্ক্রিন দেখল। যোগাযোগ করতে চাইছেন কেসলার। সিকিউর লাইনে আলাপ করতে চান। ভোরে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে, তারপরও ফোন, অর্থাৎ খুব জরুরি। পকেটে ফোন রেখে দিল সে।

ঘাড় কাত করে তীক্ষ্ণ চোখে ব্রাঙ্কোর চোখে চাইল

অ্যাবাগেইল। 'আমাকে মাফ করবেন, তবে আপনাকে দেখলে অনেক মানুষ ভয় পায়।' ব্রাঙ্কো কিছু না বলায় আরও উৎসাহ পেল মহিলা। 'আমার মনে হয় আপনাকে দেখতে যেমন কঠোর মনে হয়, সত্যি আপনি ঠিক তেমনই হতে পারেন। আমার আরও মনে হয়, আসলে আপনি খুব মিশুক মানুষ, কাউকে আঘাত দিতে জানেন না। আপনি অনেক বেশি ভাবেন। সমাজ ও মানুষের প্রতি অনেক দায়িত্ব নিয়ে চলেন। আপনি এখানে এলে ভাল লাগে আমার। পৃথিবী জুড়ে কত মানুষ অশিক্ষিত, তারা আমাদের দায়িত্বের বিষয়ে কিছুই জানে না। আপনি বুক পেতে আমাদেরকে রক্ষা করছেন, সেজন্য ভাল লাগে। আপনার ভাল হোক, জ্যারোন ব্রাঙ্কো।' এসব বলতে পেরে খুশিতে হেসে ফেলল মহিলা। 'আপনি লজ্জায় লাল হয়ে উঠছেন। আমি আপনাকে বিব্রত করে তুলেছি। দুঃখিত।'

'আপনি যা বললেন...' শ্রাগ করল ব্রাঙ্কো। বুঝতে পেরেছে কেন এই মোটা মহিলা রেসপন্সিভিজমে এসে জুটেছে। কে-ই বা শুনবে এর বকবকানি? একা থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে এখানে এসে সবার জীবন শেষ করছে।

'প্রশংসা যদি আপনার গাল লাল করে দিয়ে থাকে, তো বেশ করেছি আমি।'

তুই বেটি কিচ্ছু বুঝিস না, ভাবতে ভাবতে ঘুরে দাঁড়াল ব্রাঙ্কো, পিছনে একবার চেয়ে বেরিয়ে এল দালান ছেড়ে।

আঠারো

এ হোটেল এক ঐতিহাসিক বাড়িতে, কোলোসিয়াম থেকে খানিক দূরে। ওরা ভাড়া নিয়েছে যে সুইট, সেটা উপরতলায়, এই ফ্লোরের চারভাগের একভাগ জুড়ে। বাইরের দিকে রট-আয়রনের ব্যালকনি। ওটাকে দু'পাশ থেকে ঘিরেছে দেয়াল।

এখনও কেমিক্যালের কারণে ঝিমিয়ে চলেছে অমল দাশা, তার হুইলচেয়ার ঠেলে বিলাসবহুল সুইটে ঢুকল ফু-চুং। পাশে হাঁটছে উর্বশী। বিড়বিড় করে কী যেন বলে চলেছে ওর ভাই। বোঝা যায় ঘণ্টা দেড়েকের ভিতর সচেতন হয়ে উঠবে।

'হ্যালো,' সুইটের ভিতর থেকে বলে উঠল কেউ।

'হ্যালো,' পাল্টা বলল ফু-চুং। 'ডক্টর চার্চ?'

লিভিং রুম থেকে ফয়ে-এ বেরিয়ে এলেন লিয়োনার্দো চার্চ, পরনে স্ট্রাইপ দেয়া গাঢ় খয়েরী সুট, তার উপর সাদা সিল্কের পুলওভার। ভদ্রলোকের দুই হাতে পাতলা চামড়ার গ্লাভস। যেভাবেই হোক, বিকৃত হয়েছে হাতদুটো।

সাইকিয়াট্রিস্টের বয়স কত, আন্দাজ করতে চাইল ফু-চুং। মাথা ভরা চুল, এখানে-ওখানে রুপালি ছোপ। রোদে পোড়া মুখের ত্বক, তাতে কসমেটিক সার্জারি। দুই চোখ ও মুখের দু' পাশে জরজর ত্বক টানটান করা হয়েছে সার্জারির মাধ্যমে। এ লোক ডিপ্রোগ্রাম করতে যে টাকা নিয়ে থাকে, দুনিয়ার সেরা

প্লাস্টিক সার্জনকে দেখাতে পারবে। কিন্তু চেহারা এমন হয়ে উঠেছে, মনে হয় মানুষটা এক ভীত হরিণ, চোখে-মুখে এসে পড়েছে গাড়ির হেডলাইট। ফু-চুং ধারণা করল, মিস্টার চার্চ কম পয়সায় কসমেটিক সার্জারি করিয়েছেন।

ভদ্রলোকের একটা বিষয় খেয়াল করেছে উর্বশী, সামান্য অবাকও হয়েছে। হাত বাড়িয়ে দিল। 'উর্বশী দাশা।'

গ্লাভস্ পরা হাতদুটো একটু উপরে তুললেন চার্চ। 'মাফ করুন, তবে হ্যাণ্ডশেক সম্ভব নয়। কম বয়সে গাড়ি দুর্ঘটনা। পুড়ে যায় দুই হাত।'

'না-না, ঠিক আছে। ইনি লিউ ফু-চুং। যে কোম্পানি আমার ভাইকে উদ্ধার করেছে, সেখান থেকে এসেছেন।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বলল ফু-চুং। 'কিছু মনে করবেন না, আমরা রোমে পৌঁছনোর আগে জানাতে পারিনি কোন্ হোটেলে উঠছি। সাধারণ সিকিউরিটি প্রসিজিয়ার।'

'এ তো হতেই পারে,' হাতের ইশারা করলেন চার্চ, সুইটের ভিতর অংশে চলেছেন। তিন দিকে তিনটে বেডরুম। বাম দিকের দরজা খুললেন তিনি।

হুইলচেয়ার নিয়ে বিছানার পাশে থামল ফু-চুং।

'ওকে বিছানার উপর শুইয়ে দিন,' বললেন চার্চ।

অমলের পরনে হাসপাতালের জনি, মনে হলো খুব অসুস্থ। একটুও নড়ছে না, ঝিমিয়ে চলেছে। ওকে কিং-সাইজের বেডের উপর তুলল ফু-চুং। চারপাশে ঝুলছে রাজকীয় ভারী পর্দা, টেনে দিলে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেয়া যায়। ভাইয়ের পাশে থামল উর্বশী, আস্তে করে হাত বুলিয়ে দিল কপালে। চোখে মমতা, কষ্ট, অসহায়তা। নিজেকে যেন দোষ দিয়ে চলেছে।

'ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরবে, ভয় নেই,' বললেন চার্চ।

মেয়েটির চোখ পড়তে পেরেছেন। তাঁর দীর্ঘ পেশা-জীবনে এমন অনেক আত্মীয় দেখেছেন। উর্বশীকে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন তিনি, থামলেন ব্যালকনির ফ্রেঞ্চ ডোরের সামনে।

রোমের বিকেল। গাড়ি-ঘোড়া ছুটে চলেছে। বাইরে থেকে আসছে নানা ধরনের গুঞ্জন। রাস্তার ওপারে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের ছাত পেরিয়ে চোখে পড়ে বিশাল উঁচু লাইম-স্টোনের দেয়াল। ওটা এ শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান। ওটার ওপাশে বসতে পারে পঞ্চাশ হাজার দর্শক। আধুনিক যে-কোনও স্পোর্টস এরিনার সমান এই প্রাচীন কোলোসিয়াম।

'ধারণা করি সব সঠিক ভাবে চলেছে,' বললেন চার্চ। বলবার সুরে কোনও অঞ্চলের টান। সেটা যে কোথায়, ধরতে পারল না উর্বশী। ওর মনে হলো চার্চের বাবা-মা ইংরেজ ছিলেন না।

'হ্যাঁ, সঠিক ভাবেই.' বলল উর্বশী।

'তা-ই? কী ঘটে?'

মানুষটার চোখও, ভাবল উর্বশী। কী যেন আছে দৃষ্টির ভিতর। লিয়োনার্দো চার্চের দামি চশমার ওপাশে খয়েরী চোখ। কেমন যেন চাহনি। বেশিরভাগ সময় কারও চোখ দেখে ও বুঝে ফেলে মানুষটা কেমন। কিন্তু চার্চকে দেখে কিছুই বোঝা গেল না।

'রেসপন্সিভিস্টরা আজকাল আর্মড্ গার্ড রাখছে,' উর্বশী কিছুই বলেনি, কাজেই বলল ফু-চুং।

অত্যন্ত দামি সোফায় ধীরে বসে পড়লেন চার্চ। 'জানতাম একদিন এমন হবে। ডিয়েটস কেসলার ও তার স্ত্রী বার্থা গত কয়েক বছরে প্যারানয়েড হয়ে উঠেছে। সন্দেহ হয়েছিল এরা নিজেদের সঙ্গে অস্ত্র রাখতে পারে। আমি সত্যিই দুঃখিত। আমার এই সন্দেহ আগেই আপনাদের জানিয়ে দেয়া উচিত

ছিল।'

'আমাদের লোক আহত হলে ক্ষতি হতো, তা হয়নি,' বলল ফু-চুং।

'তবে আমার দায়িত্ব আমি পালন করতে পারিনি। নিজে যুদ্ধে গেছি, কাজেই বুঝি আপনারা মস্ত বিপদে পড়েন।'

কোরিয়া বা ভিয়েতনামে যুদ্ধ করেছেন ডক্টর চার্চ, ভাবল উর্বশী। গগলের কাছে শুনেছে মানুষটি আমেরিকান। 'ডিপ্রোগ্রামিং কীভাবে কাজ করে?' জানতে চাইল ও।

'সাধারণত রোগীর বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবীকে কাজে লাগাই। রোগীকে তারা তাদের সমর্থন দেয়, *তুমি পারবে, বেরিয়ে আসতে পারবে রেসপন্সিভিস্টদের কবল থেকে।* তবে এই বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রথম কিছু সেশন আমার সঙ্গে বসবে অমল, চলতে থাকবে আলাপ। তবে যখন ঘুম থেকে উঠবে, ভীষণ ঝাঁকি খাবে। বুঝে উঠতে সময় লাগবে কী ঘটেছে।' ম্লান হাসলেন চার্চ। 'আমার অভিজ্ঞতা বলে, এই শক পেয়ে ভয়ানক রেগে উঠবে।'

'মারপিট বা ভাঙচুর করে না অমল, এটুকু বলতে পারি,' বলল উর্বশী। 'আমার মত রেগে ওঠে না, ওর ভিতর রাগ নেই।'

'সাধারণত রোগী যেন শান্ত থাকে সেজন্য কিছু ওষুধ দিই। শক কেটে গেলে আর এসব ওষুধ লাগে না।' সাইড টেবিলের দিকে হাত তুললেন চার্চ। ওটার উপর পুরনো আমলের কালো ডাক্তারি ব্যাগ। পাশেই ফুলদানি ভরা তাজা ফুল।

'আপনি কতজন রোগীকে সাহায্য করেছেন, ডক্টর?'

'আমাকে দয়া করে লিয়োনার্দো বলে ডাকবেন। প্রায় দু' শ' রোগী।'

'সবাই সুস্থ হয়ে ওঠে?'

‘একথা বলতে পারলে খুশি হতাম। তবে তা নয়, কিছু রোগী পরে আত্মহত্যা করে। অনেকে ফিরে যায় নিজেদের কাল্টে। ভাবলে মন ছোট হয়ে আসে। রেসপন্সিভিস্টদের ভাল কাজগুলো আকৃষ্ট করে মানুষকে। যখন ভালমত জড়িয়ে যায়, তখন টের পায় তাদের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে শুরু করেছে উপর পর্যায়ের নেতারা। বিশেষ করে যখন জানিয়ে দেয় সদস্য নিজের কোনও ভালবাসার মানুষ, আত্মীয়-স্বজন বা পরিচিতদের সঙ্গে মিশতে পারবে না, শুরু হয় মনোকষ্ট। এসব মানুষ ফিরে আসতে চায় বাস্তব জীবনে, তবে আর অ্যাডজাস্ট করতে পারে না।’

‘মানুষ এ পরিবেশে নিজেকে ফেলে কেন?’ জানতে চাইল ফু-চুং। জানে, জবাব কী হতে পারে। কম বয়সে কোনও না কোনও গ্রুপের সঙ্গে মেশে অনেকে, নইলে চলতে পারে না। এই গ্রুপ বেশির ভাগ সময় খারাপ হয়। তাকে মেনে চলতে হয় ওটার নেতার কথা। তার কথায় কিছু অন্যায় কাজ করে বাঁধা পড়তে হয়। পরে ওই দল থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়ে।

‘একাকীত্ব, গোটা পৃথিবী থেকে আলাদা থাকার কষ্ট, এগুলো তাড়িয়ে বেড়ায় এদের। রেসপন্সিভিস্টরা তখন ভরসা দিতে থাকে। মানুষ ভাবতে শুরু করে, সে একটা দলের সঙ্গে চলছে। মনে করে তারা গুরুত্বপূর্ণ। সবার ভিতর একই সিম্পটম থাকে। যারা ড্রাগ বা অ্যালকোহলের উপর ঝুঁকে পড়ে, তাদের ভিতরেও এই একই প্রবণতা। যারা অসফল হয়, তাদেরও।’

‘আমার মা'র বক্তব্য অনুযায়ী মাত্র কয়েক মাস ধরে রেসপন্সিভিস্টদের সঙ্গে মিশছে অমল। এ থেকে বেরিয়ে আসতে সময় লাগবে না, তা-ই না?’

'কতদিন ধরে রেসপন্সিভিস্টদের সঙ্গে মিশছে, সেটা বড় কথা নয়,' বললেন চার্চ। 'ওই বিষে কত গভীর হয়ে ডুবেছে মন, সেটাই মূল বিষয়। একটা কেসের কথা মনে পড়ল। এক মহিলা দু'বার রেসপন্সিভিস্টদের মিটিঙে যান, এরপর যখন তাঁর স্বামী জানলেন, উনি আমার সাহায্য চাইলেন। শেষে মহিলা তালাক দিলেন তাঁর স্বামীকে। এই মহিলা এখন রেসপন্সিভিস্ট গ্রিক রিট্রিটের ডিরেক্টরের সেক্রেটারি। আপনারা ওখান থেকেই উদ্ধার করেছেন অমলকে। অবাক মানুষের মন, ব্যর্থতার কথা ভোলা কঠিন। মহিলার নামটা ভুলিনি—অ্যাবাগেইল ওব্রায়ান। যাদের বিষয়ে সফল হয়েছি, ভুলেই গেছি তাদের নাম।'

নীরবতা নেমে এল সুইটে। কিছুক্ষণ পর অস্বস্তিকর পরিবেশ ভাঙল ফু-চুং। 'আমার একটা কৌতূহল: পার্লা মোনার মত সফল অভিনেত্রী এ ধরনের কাল্টে গিয়ে মিশছে কেন?'

'তারও মন আর সবার মতই। সে পুরস্কার ও প্রশংসা পেলে কী, সে তো একা। শিল্পীরা সহজে বাস্তব থেকে ছিটকে পড়ে। বাস্তব জীবনে তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় ভক্তরা, কিন্তু রেসপন্সিভিস্ট সংগঠনে সে শুধু সাধারণ এক সদস্য। ওদের চেনা মোনা। সবার পরিচিত। তাদের সঙ্গে মিশছে সহজে। খুশি, কারণ ওর খ্যাতি বহু মানুষকে ওই সংগঠনে এনে ভিড়াচ্ছে।'

'এ আমি বুঝি না,' ক্লান্ত স্বরে বলল উর্বশী।

'আর তা-ই আমার সাহায্য চেয়েছেন,' পরিবেশ হালকা করতে চাইলেন ডক্টর চার্চ। 'এ নিয়ে ভাবতে হবে না আপনার। শুধু বুঝিয়ে দেবেন আপনি কতটা ভালবাসেন অমলকে।'

'রেসপন্সিভিস্টদের যে ফিলিপিন্স সেণ্টার, সেটা সম্বন্ধে কিছু জানেন?' প্রসঙ্গ পাল্টে নিল ফু-চুং।

কী যেন ভাবতে চাইলেন চার্চ, কিছুক্ষণ পর বললেন, 'খুব

যে বেশি জানি, তা বলব না। তবে ধারণা করি ওখানে ফ্যামিলি-প্ল্যানিঙের ক্লিনিক খুলেছে। না, এক মিনিট... হ্যাঁ, মনে পড়েছে। শুনেছি ওরা ওখানে রিট্রিট খুলছে। জমি কিনেছে। তবে এখনও বাড়িঘর তৈরি করেনি।'

'ক্রুজ শিপ ভাড়া নেয়ার ব্যাপারে কিছু জানেন?'

'আপনি বলছেন গোল্ড অভ মার্সের কথা। খুবই দুঃখজনক। শুনেছি ওটাকে বলত ওরা সি রিট্রিট। গত কয়েক বছর ধরে বেড়াতে বেরোয় রেসপন্সিভিস্টরা। বেশিরভাগ সময় গোটা জাহাজ ভাড়া করে। কখনও বুক করে অর্ধেক কেবিন। জাহাজে চড়ে মিটিং করে, কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করে। ওরা ওখানে কী করে জানতে একবার যাই। এসব জায়গায় যায় বড়লোকরা। এসব জাহাজকে রিক্রুটিং সেণ্টার মনে করে রেসপন্সিভিস্টরা।'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'যাই, দেখি কী করছে অমল।'

ভদ্রলোক চলে যেতে সাইডবোর্ডের দিকে চাইল উর্বশী। ওটার উপর সৈন্যের মত দাঁড়িয়ে বেশ কিছু রঙিন বোতল। একটা গ্লাস নিল ও, সিভাশ রিগ্যালের বোতল থেকে ঢেলে নিল দুই পেগ হুইস্কি। ওটা বাড়িয়ে দিল ফু-চুঙের দিকে। নিজেও নেবে। আস্তে করে মাথা নাড়ল চৈনিক গুপ্তচর।

'এটা মিশন নয়, তবুও থাক।'

'এটা আমার মাথা ঠাণ্ডা রাখবে,' গ্লাসে চুমুক দিল উর্বশী।

'সব বুঝে কেমন লাগছে?' জানতে চাইল ফু-চুং।

'ভদ্রলোককে আন্তরিক মনে হয়েছে। নিজের কাজ বোঝেন। আপনার কী মনে হয়, ফু-চুং?'

'ভাল। গগল সঠিক লোক খুঁজে বের করেছে। কিছুদিনের ভিতর দেখবে সুস্থ হয়ে উঠছে অমল।'

'আপনারা যেভাবে সাহায্য করলেন, কখনও ভুলব না।'

'আমাদের কারও বিপদ হলে এই একই কাজ করতে তুমি।'

চুপ করে রইল উর্বশী। মন থেকে জানে, ঠিকই বলেছেন ফু-চুং। তবে কৃতজ্ঞ হয়ে রইল। পার্সের ভিতর নিচু আওয়াজে বাজতে শুরু করেছে সেল-ফোন। ওটা বের করে স্ক্রিন দেখল। যোগাযোগ করতে চাইছে রানা।

বাটন টিপে ফোন রিসিভ করল উর্বশী। 'আমরা নিরাপদে পৌঁচেছি, রানা।'

'ভেরি গুড। চার্চ পৌঁচেছে?'

'হ্যাঁ। এইমাত্র ফু-চুঙের সঙ্গে কথা হলো। কপাল ভাল মিস্টার চার্চকে পেয়েছি।'

'গুড।'

'মার্ভেলে সবাই ভাল?'

'ভাল। একটু আগে আমার বসের সঙ্গে কথা হলো। খুব খুশি মনে হলো। আমেরিকান সরকার সাধু হতে চাইছে। তাদের কূটনীতিকরা এশিয়ান দেশগুলোকে বোঝাতে চাইছে কখনও তারা আক্রমণ করার কথা ভাবতেও পারেনি। পরে হয়তো উইকিলিক্স থেকে বেরিয়ে আসবে সবই, হাসবে লোকে।'

'তাই হাসবে সবাই।'

'আমার বস পাপাগোপালার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। একটু খেপেছেন উনি। পরে যখন বুঝেছেন একদল সন্ত্রাসী গ্রিক ক্যানেল ধ্বংস করতে চায়নি, তখন ঠাণ্ডা হয়েছেন। বলেছেন পরে গ্রিক ইন্টেলিজেন্স চিফের সঙ্গে কথা বলবেন।'

'ওটা ছিল বিখ্যাত *'সি' প্ল্যান,'* মৃদু হাসল উর্বশী।

'সোহেল-ফু-চুং-অনিল-গগল, সবাই জড়িত,' হাসছে রানা। 'এখন ভাবছি অন্য কিছু। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে

কথা বলব। জানি না তিনি কী বলবেন!'

'সাধারণ আমেরিকান নন উনি, তোমার কাছে যতটা শুনেছি।'

'সত্যিকারের খাঁটি মানুষ।' প্রসঙ্গ পাল্টাল রানা, 'অমল কেমন আছে?'

'একটু পর ড্রাগের প্রভাব কেটে গেলে দেখি কী করে।'

'ভাল থাকবে, তোমার ভাই তো। ওকে বুঝিয়ে দিয়ো ওকে ভালবাসো তুমি।'

'নিজের উপর কেমন যেন রাগ লাগছে।'

'এখনও তুমি নিজেকে দোষ দিয়ে চলেছ। এ ঠিক নয়। মনে রেখো ওকে সাহায্য করতে হবে। গগল তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। ধরো।'

ভেসে এল গগলের কর্কশ স্বর, 'মনে রেখো জীবনটা এমনই, উর্বশী। কিছু জিনিস তুমি বদলে নিতে পারো, আবার অনেক কিছু বদলানো যায় না। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, এসব জানো। যা ঘটবে সেই অনুযায়ী চলবে।'

'বারবার মন বলছে আমি ভাইকে সময় দিইনি।'

'দুনিয়ার সমস্ত বড় ভাই-বোন মনে করে ছোটদের সময় দিতে পারেনি। এভাবেই চলে দুনিয়া।'

চুপ করে রইল উর্বশী।

'রানার সঙ্গে কথা বলো, রাখি,' বলল গগল।

মার্ভেলের অপারেশন্স সেন্টারে সবাই শুনছে কথাগুলো। আবার লাইনে এল রানা, 'জীবন কঠিন, তাই না, উর্বশী? আমরা যখন মিশন নিই, বিস্তারিত পরিকল্পনা করি, ভেবে বের করি কোন্ দিক থেকে বাধা আসতে পারে। এরপর কাজে নেমে সহজে অবাক হই না। সামনে বাধা পড়লে এগুতে চাই বাঁক

নিয়ে। ঠিকই বলেছে গগল। জীবন এমনই। ছোট ভাইয়ের জন্য তুমি যা করছ, সেটা অনেকে করে না। বিপদের সময় পাশে থাকছ। এর বেশি আর কী করবে কেউ? কাউকে সর্বক্ষণ পাহারা দিলে সে তো মানুষই হবে না।'

'তুমি খুব ভাল ভাই বা বাবা হবে, রানা।'

'ঠাট্টা করছ?' হেসে ফেলল রানা। 'আমি শুধু জানি এই দুনিয়ার বেশির ভাগ মানুষ আমার চেয়ে অনেক ভাল।' চুপ হয়ে গেল রানা।

'এখন কী করছ তোমরা?'

'তোমাদের দক্ষিণে চলেছি। আগামীকাল রাতে পৌঁছব রিভিয়েরা। পরদিন সকাল থেকে নজর রাখতে শুরু করব সৌদি প্রিন্স আর আর্মস্ ডিলারের উপর।'

'তোমাদের পাশে থাকতে পারলে ভাল লাগত।'

'তোমার দায়িত্ব তুমি পালন করছ। অমলের পাশে থাকছ।'

ফোনের দিকে ইশারা করল ফু-চুং।

'রানা, ফু-চুং কথা বলতে চান। ওঁকে দিচ্ছি।' ফোন বাড়িয়ে দিল উর্বশী।

'রানা, আমরা মিস্টার চার্চের সঙ্গে আলাপ করেছি। ভদ্রলোক বলেছেন রেসপন্সিভিস্টরা আগেও ক্রুজ শিপ ভাড়া নিয়েছে।'

'আর কিছু?'

'আমি হয়তো বুনো হাঁসের পিছনে ছুটছি, তবে অনিলকে বল ওই যাত্রাগুলো ক্রস-রেফারেন্স করুক। অস্বাভাবিক কিছু বেরিয়ে আসতে পারে।'

'ভাল বলেছিস। আর কিছু?'

'চার্চ বলেছেন গুজব শুনেছেন, ফিলিপিন্সে নতুন রিট্রিট

খুলেছে রেসপন্সিভিস্টরা। এদের চার শ' লোক ছিল গোল্ড অভ মার্সে। মারা পড়েছে সবাই। ভদ্রলোক যা বললেন, তার বাইরে অনেক কিছু ঘটে থাকতে পারে। আমাদের বোধহয় খোঁজ নেয়া উচিত।'

'ঠিক।'

বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসেছেন লিয়োনার্দো চার্চ, পিছনে বন্ধ করে দিলেন দরজা। প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'জেগে উঠছে অমল। আমার মনে হয় আপনাদের এখন সামনে না থাকাই ভাল।' মেডিকেল ব্যাগের পাশে থামলেন ভদ্রলোক। ওটার ভিতর থেকে বের করলেন সিলিণ্ডারের মত কী যেন। দেখলে মনে হয় সুপের ক্যান। 'এটা একটা লকিং ডিভাইস। সুইটের ডোর-নবে আটকে দেব। ভিতর থেকে দরজা খুলতে পারবে না অমল।'

'আপাতত রাখি, রানা,' বলল ফু-চুং। লাইন কেটে উর্বশীর হাতে দিল ফোন।

উঠে দাঁড়িয়েছে উর্বশী। 'কতক্ষণ পর ফিরব?'

'আপনার ফোন নাম্বার দিয়ে যান, পরে ফোনে জানাব। আপাতত ওর সঙ্গে আলাপ করব। ধরুন দেড়ঘণ্টা। তারপর ওকে সিডেটিভ দেব।'

বেডরুমের দরজা ভিড়িয়ে রাখা, ওটার দিকে চাইল উর্বশী, তারপর চাইল সাইকিয়াট্রিস্টের দিকে। মনের ভিতর দ্বিধা। চলে যাবে, না থাকবে! কী করা উচিত ওদের?

'ভয় নেই, মিস দাশা। আমি নিজের কাজ বুঝি।'

'বেশ,' হোটেলের স্টেশনারি কাগজে নিজের ফোন নম্বর লিখল উর্বশী, দিল ওটা মিস্টার চার্চের হাতে।

দরজার পাশে চলে গেছে ফু-চুং। দু'জন বেরিয়ে এল সুইট

ছেড়ে। দামি কাঠের প্যানেল দেয়া করিডোর পেরিয়ে পৌঁছে গেল ওরা এলিভেটর ভেস্টিউবলে। উর্বশীর দিকে চাইল ফু-চুং। মুখটা বিবর্ণ মনে হলো। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। একবার ঘুরে চাইল সুইটের সোনালী দরজার দিকে। ভেসে এল দরজা বন্ধ করবার আওয়াজ। ক্ল্যামশেল লক আটকে দিয়েছেন চার্চ।

'চলো, তোমাকে ডিনার খাওয়াব,' বলল ফু-চুং।

'ইতালিয়ান কিছু?' বলল উর্বশী। একটু যেন কেটেছে চিন্তার মেঘ।

'তা-ই সই।' এলিভেটর চলে আসতেই হাতের ইশারা করল ফু-চুং। উর্বশীর পর উঠে পড়ল।

উনিশ

মেডিটারেনিয়ান সাগর। কালো জল চিরে ছুটছে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস। গতি তোলা হয়েছে বিশ নট। এখন ওটার সত্যিকারের তীব্র গতি কাজে লাগানো অসম্ভব। শিপিং লেন গিজগিজ করছে নানান জাতের জাহাজে। তবে মার্ভেলের ডাইনিংরুম বিন্দুমাত্র দুলছে না। ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিন বা পাম্প-জেটের মৃদু আওয়াজ। ওগুলো না থাকলে রানার মনে হতো, ওরা বসেছে প্যারিসের কোনও নামকরা বুলেভার্ডে, ফাইভ-স্টার রেস্টুরেন্টে।

রানার পরনে সামার-ওয়েট স্পোর্টস জ্যাকেট, নীচে কাস্টম শার্ট। কলার খোলা। খুদে কাফ লিঙ্ক দুটো যেন কম্পাস। পায়ে

ইতালিয়ান জুতো। উল্টো দিকে বসেছে সানজিদা স্বর্ণা, পরনে কালো টি-শার্ট ও নীল জিন্স। মোমবাতির আলোয় চকচক করছে সবার চেহারা। নানান আলাপের ফাঁকে টুকটাক হাসাহাসি চলছে। মিশন শেষে ডিনার দেবে, কথা দিয়েছিল রানা।

'মোস্তফা আবুল বিশেষ ভাবে ডিনার তৈরি করছে, কাজেই তোমাদেরকে বলেছি আনুষ্ঠানিক পোশাক পরতে,' বলল রানা। 'খাবার ও তার স্রষ্ট'র সম্মানে।'

মৃদু উষ্ণ পাউরুটি ও মাখন নিল সোহেল।

'যখন বড় হয়ে উঠছি, ততদিনে চার ভাই বুঝে ফেলেছি দ্রুত না খেলে ঠকতে হয়,' বলল গগল। 'যে দেরি করল সে টেবিল ছাড়বে খিদে নিয়ে। ওই টেবিলে কোনও আনুষ্ঠানিকতা ছিল না।'

'আপনাদের সবাইকে পিট্টি দিতেন বাবা?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'চাইত, তবে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করতাম। সংসারে তীব্র অভাব, মেজাজ খারাপ থাকত তার। অভাব ছিল কারণ লোকটা কাজ না করে সারাক্ষণ জুয়া আর মদ নিয়ে পড়ে থাকত। খাবারের অভাবে ভাইদের ভিতর খাতির ছিল না। এরপর মা আত্মহত্যা করতেই ছিটকে গেলাম সবাই। যে যার মত নেমে পড়লাম জীবনসংগ্রামে।'

পরিবেশ ভারী হয়ে উঠছে। প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইল সোহেল। 'আমার মনে পড়ে ছোটবেলায় টেবিল ম্যানার্স শেখান বাবা। মানতে চাইতাম না। টেবিলের উপর কনুই রাখলে শাস্তি মিলত। তবে এখন আর ভয় নেই। এক কনুই গায়েব, আরেক হাত তো খেতেই ব্যস্ত!'

তোকে দিয়ে হবে না, মনে মনে বলল রানা। কাজের দিকে সবাইকে সরিয়ে নিতে চাইল। 'ভবিষ্যৎ নিয়ে কী ভাবছ, স্বর্ণা?'

'সারাদিন রেসপন্সিভিজম নিয়ে পড়াশোনা করেছি। এই জ্ঞানে রেপন্সিভিস্টদের নেত্রী হতে পারব না, তবে এদের সঙ্গে আলাপ চালাতে পারব। যত শিখছি, অবাক লাগছে। একদল বুদ্ধিমান মানুষ ভিনগ্রহের প্রাণীর ভয়ে কাবু! এদের ধারণা প্যারালাল ইউনিভার্সের প্রাণী তাদের পরিচালনা করতে চাইছে।'

'মানুষ নানা ধরনের হয়,' মন্তব্য করল রানা। ভেবে দেখেছে, কেউ কাউকে আহত না করলে, তার ব্যাপারে কিছু বলা উচিত নয়। 'তুমি নিশ্চয়ই জানো, ওখানে যা ঘটেছে, এরপর আরও বাড়বে সিকিউরিটি।'

আস্তে করে মাথা দোলাল স্বর্ণা। 'তাই হওয়ার কথা, মাসুদ ভাই। হয়তো ঢুকতেই দেবে না। তবে চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?'

মন্তব্য করতে গিয়ে চুপ হয়ে গেল রানা। ডাইনিং রুমে এসে ঢুকেছে চারজন। ফারার পরনে ল্যাব কোট। ওর পিছনে জলিল ও কাশেম। পরনে জ্যাকেট-টাই ও জিন্সের প্যান্ট। কাশেমের শার্ট খানিক কুঁচকে বেরিয়ে এসেছে। দু'জন ফ্যাশন করতে গিয়ে পড়েছে অস্বস্তির ভিতর। অথবা অস্বস্তি মাঝখানের মানুষটির জন্য।

হেলেন জিলের চোখে বাঁধা স্কার্ফ খুলল ফারা। মেয়েটি যেন জাহাজের চারপাশ না দেখে, তাই এ ব্যবস্থা ছিল। বেচারি চেনে শুধু মেডিকেল সেকশন। এবার দেখল ডাইনিং রুম। রানা চেয়েছে কিছুক্ষণের জন্য হাসপাতাল থেকে বাইরে আসুক হেলেন। মোফিজ বিল্লার জাদুর দোকান থেকে ধার দেয়া হয়েছে পোশাক। এখনও দুর্বল হেলেন, তবে হাসছে খুশি মনে।

ওর বয়স কত, ভাবল রানা। বড়জোর বিশ? দুর্বল, তবে দেখতে মিষ্টি। গালে ফিরেছে লালচে রং। কালো কোঁকড়ানো চুল

যেন মেঘের ঢেউ, নেমে এসেছে ধবধবে সাদা কাঁধে। হেলেনের দু'পাশে আড়ষ্ট পায়ে হাঁটছে কাশেম ও জলিল। দুই বন্ধু পরস্পরের দিকে চাইছে না। মুখ গম্ভীর। খানিক যেন অভিমান—তুই ব্যাটা আমার প্রেমিকা ভাগিয়ে নিতে চাস্!

ভদ্রতা করে উঠে দাঁড়াল রানা। 'এসো, হেলেন, আগের চেয়ে অনেক সুস্থ দেখ'চ্ছে তোমাকে।'

'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন রানা,' কাঁচের খাঁচা থেকে বেরিয়ে খুশি হেলেন। চারপাশে চাইল।

'চোখ বেঁধে আনা হয়েছে, সেজন্য আমি দুঃখিত। চাইনি জাহাজের সেনসেটিভ জিনিসগুলো দেখো।'

হেলেনের জন্য চেয়ার টেনে দিতে চাইল জলিল ও কাশেম। একইসঙ্গে চেয়ারের কাঁধে হাত রাখল, তারপর পরস্পরের দিকে কড়া চোখে চাইল। কেউ সরিয়ে নিল না হাত।

'আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, ক্যাপ্টেন রানা, আপনাদের কোনও কাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করব না।' মেয়েটির কণ্ঠ মিষ্টি সুরেলা, কথা গুছিয়ে বলে। 'খুব ভাল লাগছে বিছানা ছেড়ে উঠতে পেরেছি।'

'তোমার অসুখটার কী অবস্থা?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'ভাল। আগের চেয়ে অনেক। ডক্টর রাইনার হাঁপানি নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেছেন। মনে হয় না আর অ্যাটাক হবে।'

একটু হাঁ করে কথা শুনছিল কাশেম, কাজেই জিতে গেল জলিল, হঠাৎ এক হ্যাঁচকা টানে বের করল চেয়ার, হাতের ইশারা করল হেলেনকে। 'বসুন, প্লিয। বসুন-বসুন।' আরেক হাতে বামদিকের চেয়ার ধরেছে। কিছুতে ওখানে বসতে দেবে না কাশেমকে। হেলেন বসে পড়তেই পাশের চেয়ারে বসল জলিল। তারপর বিজয়ীর ভঙ্গিতে চাইল কাশেমের দিকে। ভাব দেখে মনে হলো নতুন দেশ জয় করলেন সম্রাট আকবর।

কঠোর চোখে বন্ধুর দিকে চেয়ে রইল কাশেম, তারপর ঘুরে চলে গেল উল্টোদিকে, বসল স্বর্ণার পাশে।

'দুঃখজনক, তবে হেড বাবুর্চির সঙ্গে যোগাযোগ আপাতত বন্ধ,' বলল রানা। ওর কথা শেষ হতে না হতে দরজা খুলে গেল। দুই বেয়ারা পিছনে নিয়ে এল মোস্তফা আবুল। তিনজনের হাতে দুটো করে ছয়টি ট্রে। তার উপর নানান ডিশ। গম্ভীর চেহারা বাবুর্চির। সবার উপর চাপিয়ে দিয়েছে সব দোষ। 'খানিক ভুল হয়েছে,' একবার আবুলের দিকে চেয়ে হেলেনের দিকে চাইল রানা। 'আমাদের চিফ সেফ ভেবেছে তুমি ডেনমার্কের মানুষ। যদি জানত নরওয়ের, সেদেশের ডিশ রাঁধত। আপাতত ডেনিশ খাবার।'

'আপনাদেরকে ধন্যবাদ,' মিষ্টি করে হাসল হেলেন। 'আমার কথা ভেবেছেন, কৃতজ্ঞ রইলাম। ...দু'দেশ তো খুব কাছে, যেন একাত্মা।'

'শুনলেন?' বাবুর্চির কষ্ট ভুলিয়ে দিতে চাইল সোহেল।

'আমি শুনিনি, স্যর।' কঠোর মুখে বলল আবুল মোস্তফা।

দুই বেয়ারা ও বাবুর্চি টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়েছে সুস্বাদু সব ডিশ।

'সুবাস বলছে হেরিঙের ডিশ,' বলল রানা। 'ওরা তো শুরুই করে এ দিয়ে। তারপর ফিস্কবলার। ওটাও তো মাছের বড়া। তারপর খাসির কলিজা, সঙ্গে লাল বাঁধাকপি আর পোড়ানো আলু। এরপর প্যাণ্ডাক্যাজার প্যানকেক, শেষে আইসক্রিম ও চকলেট বা রিস আ ল্য ম্যাণ্ডে।'

হাসছে হেলেন। 'ওটা দুধ-ভাত দিয়ে তৈরি ক্ষীর। সঙ্গে চেরির সস্। আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি ওটা। টেবিলে আছে দেখছি।'

'তুমি কি অসলো থেকে এসেছ?' জানতে চাইল অনিল।

'আমার বাবা-মা মারা গেলে ওখানে চলে যাই। তবে আমি জন্মেছি অনেক উত্তরে, ছোট্ট এক গ্রামে। নাম ছিল অ্যারোনভাদ।'

এবার বোঝা গেল সাধারণ শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় মেয়েটি কেন একটু কালচে, ভাবল রানা। সম্ভবত ল্যাপ, আলাস্কার ইনুইট বা গ্রিনল্যাণ্ডের স্থানীয়দের মত। বরফ ও তুষার থেকে ছিটকে আসা সূর্যের আলো কিছুটা কালচে করে দেয় এদের ত্বক। হেলেনের দেহে এস্কিমো রক্তও থাকতে পারে।

কিছু বলবার আগেই আতাসিকে দেখল রানা, এই মাত্র এসে ঢুকেছে ঘরে। ডিনার করতে আসেনি। চোখের কোলে কালো দাগ। বোধহয় দু'দিন ঘুমাতে পারেনি। উঠে দাঁড়াল রানা, 'এক্সকিউজ মি, তোমরা ডিনার নিয়ে বসো।' আতাসির পাশে চলে গেল, নিচু স্বরে বলল, 'চেহারার এই অবস্থা কেন?'

'ভাল নেই শরীর, বস্,' স্বীকার করল আতাসি। 'আপনিই তো বললেন যেন কাজ চালিয়ে যাই। স্ট্যাটিকের জ্যামিঙের ভিতর থেকে ছারপোকার কথা খুঁজেছি। একটু আগে কাজ শেষ হয়েছে। এই যে দেখুন।' ভাঁজ করা একটা পৃষ্ঠা বাড়িয়ে দিল সে। 'সাউণ্ড মিক্সচার ব্যবহার করেছি। এর বেশি আর কিছু বেরুল না। মাঝে পাবেন ব্র্যাকেটের ভিতর সময়।'

কাগজের ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করল রানা।

আমি মনে করি না... (১:২৭) হ্যাঁ... (২:৫৭) পার্লা মোনার সম্প... (১:৩৫) ওই ইল লেফ অ্যাকটিভেট... (:৩৮) কী... (১:০৩) আগামী(কাল)... (৪:২০) তা হবে না... (:৪২) এক মিনি(ট)... (৬:৫৭) বাই। (১:১৪)

'এ-ই?' কণ্ঠের হতাশা চেপে রাখল রানা।

'ঠিক এ-ই, বস্। বোঝা যায়নি কিছু আওয়াজ। তবে

ওগুলোকে দশ পার্সেন্ট সুযোগ দিয়েছে কম্পিউটার। ওগুলো কিছু না-ও হতে পারে। আরও আছে। কম্পিউটার পার্লা মোনার নামকে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট বলেছে। ঠিক হতে পারে, না-ও হতে পারে। তবে মনে হয় ঠিকই ধরেছি।'

'স্ক্র্যাম্বলার চালু করার পর কেসলারের সঙ্গে কতক্ষণ কথা বলে ক্রিংগল?'

'তেইশ মিনিট তিন সেকেণ্ড।'

কথাগুলো আরেকবার পড়ল রানা। 'মনে হয় চারটে জিনিস গুরুত্বপূর্ণ। পার্লা মোনা, কী, আংশিক শব্দ ইল ও লেফ। শেষ শব্দ সম্বন্ধে কম্পিউটার কতটা অ্যাকিউরেসির প্রবাবিলিটি জানিয়েছে?'

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় দিয়েছে আতাসি, দ্বিতীয়বার নোটের দিকে চাইল না। 'ষাট পার্সেন্ট। কি-র ব্যাপারে বিরানব্বুই।'

'ইল, লেফ আর কি খুব কাছাকাছি সময়ে এসেছে। বোধহয় একটার সঙ্গে আরেকটা জড়িত। এরপর আছে পার্লা মোনা। তার কথা শেষে এগুলো এসেছে। সে বোধহয় কোনও ভাবে জড়িত।'

'আধঘণ্টা ভেবে শেষে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, বস্,' বলল আতাসি। 'আপনি ভেবে বের করলেন দু'মিনিটের ভিতর।'

'কারণ তুমি অর্থের মানে খুঁজতে চেয়েছ। শব্দগুলো কত সময় পর বলা হয়েছে, সেদিকে নজর দাওনি।'

'আরেকটা কাজ করেছি।' বুক পকেট থেকে মাইক্রোক্যাসেট রেকর্ডার বের করল আতাসি, প্লে বাটন টিপল। আগের মতই শুরু হলো স্ট্যাটিকের আওয়াজ। এরপর হঠাৎ থেমে গেল। একটা কণ্ঠ পরিষ্কার স্বরে বলল, 'অধিবেশনের এইখানেই সমাপ্তি।'

'এ লোক কে?' জানতে চাইল রানা।

'কম্পিউটার ধারণা করছে এ লোকের নিজ ভাষা ইংরেজি না।

মনে হয় মধ্য ইউরোপের লোক। বয়স হতে পারে পঁয়ত্রিশ থেকে শুরু করে ষাট।'

রেকর্ড টেপের কথা কয়েক সেকেণ্ড ভাবল রানা। তারপর বলল, 'এ বোধহয় জ্যারোন ব্রাঙ্কো। সিকিউরিটি চিফ। ...চলো, এবার টেবিলে বসে পড়ি।'

টেবিলে ফিরল রানা, পাশে আতাসি। ভাঙা স্বরে কৌতুক বলবার চেষ্টা করছে জলিল, তবে কাশেম ছাড়া কাউকে হাসতে দেখা গেল না। আনন্দের হাসি। হেলেন আর পাত্তা দেবে না জলিলকে। নিজ চেয়ারে বসে পড়ল রানা। ও কথা বলে উঠতেই স্বস্তির শ্বাস ফেলল জলিল, কৃতজ্ঞ চোখে চাইল মাসুদ ভাইয়ের দিকে। 'অনিল, বিকেলে জ্যারোন ব্রাঙ্কোর ব্যাপারে কিছু জানা গেছে?'

'না। কম্পিউটারে কিছুই নেই।'

'আমি বোধহয় ওই লোকটাকে চিনি,' বলল হেলেন। 'গোল্ড অভ মার্সে ছিল। রেসপন্সিভিস্টদের গুরুত্বপূর্ণ কেউ।'

'এদের ওয়েব-সাইটে কখনও একে পাওয়া যায়নি,' বলল অনিল। 'বেতনের খাতায় নেই।'

'তবে জাহাজে ছিল, আমি কসম খেয়ে বলতে পারি,' বলল হেলেন। 'কেউ বাধ্য না হলে তার সঙ্গে কথা বলত না। শুনেছি রেসপন্সিভিস্টদের সর্বোচ্চ নেতার ঘনিষ্ঠ লোক।'

এ লোকের বিষয়ে ভাবছে না রানা। ও জানতে চাইছে এই লোক কীভাবে উঠল ক্রুজ লাইনারে। কীভাবে এল এথেন্সে? তারপর ওর মনে পড়ল, হারিয়ে যায় গোল্ড অভ মার্সের একটা লাইফবোট। নিচু স্বরে বলল রানা, 'অর্থাৎ এই লোক খুন করেছে ক্রুজ লাইনারের সবাইকে।'

'একটু বুঝিয়ে বলবে?' জানতে চাইল ফারা। মুখের কাছে

চামচ তুলে থমকে গেছে।

'জ্যারোন ব্রাঙ্কো গোল্ড অভ মার্সে ছিল। সে এখন আছে রেসপন্সিভিস্টদের রিট্রিটে, গ্রিসে। জাহাজ থেকে নেমে লাইফবোট নিয়ে সরে পড়ে। হেলেন ছাড়া সে একমাত্র মানুষ, যার মৃত্যু হয়নি। এ থেকে মনে হয় আগেই জানত সবাই মারা পড়বে। সোজা কথা: সে-ই খুন করেছে সবাইকে।' হেলেনের দিকে চাইল রানা। 'তুমি এর চেহারার বর্ণনা দিতে পারো?'

'খুব লম্বা। দুই মিটারের বেশি।' তার মানে আন্দাজ পৌনে সাত ফুট, মনে মনে বলল রানা। 'খুব শক্তিশালী মনে হতো। মাত্র কয়েকবার দেখেছি। কখনও হাসত না। সত্যি কথা বলতে, তাকে দেখে ভয় পেত সবাই, আমারও ভয় লাগত।'

'তুমি মিস্টার অনিলকে কিছুটা সময় দিতে পারবে? লোকটার একটা ছবি এঁকে দেবে তুমি।'

'কিন্তু আমি যে ছবি আঁকতে জানি না।'

'আমাদের বিশেষ কম্পিউটার আছে। ওটাই আঁকবে আসলে। তুমি শুধু বলবে তার চেহারার বর্ণনা। বাকি যা করার মিস্টার অনিল করবেন ওটার সাহায্যে।'

'এই লোক যদি সবাইকে খুন করে থাকে, তার শাস্তি পাওয়া উচিত। নিশ্চয়ই আমি মিস্টার অনিলকে সাধ্যমত সাহায্য করব।' ফোঁপাতে শুরু করেছে হেলেন। চোখের সামনে ভাসছে সে-রাতের ভয়ানক দৃশ্য। কাত হয়ে জলিলের কাঁধে মাথা রাখল। মনে মনে জলিলের প্রশংসা করল রানা। বন্ধুর দিকে একবারও বিজয়ের চাহনি দেয়নি কমাণ্ডো স্নাইপার।

কাঁটা-চামচ নামিয়ে রাখল ফারা, ন্যাপকিন রেখে উঠে দাঁড়াল। হেলেনের পাশে চলে গেল, নরম স্বরে বলল, 'এক রাতের জন্য যথেষ্ট উত্তেজনা। চলো, তোমাকে মেডিকেলে

ফিরিয়ে নিয়ে যাই। ওখানেই খাব আমরা।' হাত ধরে হেলেনকে উঠতে সাহায্য করল।

গম্ভীর চেহারা দেখে মনে হলো পাশে থাকতে চাইছে জলিল ও কাশেম। এবার উঠে দাঁড়াবে ওরা।

শান্ত স্বরে বলল রানা, 'খাওয়ার দিকে মনোযোগ দাও, কাশেম। তুমিও, জলিল। সময় বা পরিবেশ সঠিক নয়। এখন হেলেনকে একা থাকতে দাও।'

'জ্বি, মাসুদ ভাই,' প্রায় একইসঙ্গে বলে উঠল দুই কমাণ্ডো। মনে হলো দুটো বাচ্চা ছেলে মেনে নিয়েছে বড় ভাইয়ের কথা। গম্ভীর মুখে ভাবল রানা, ডিনারে বসে একের পর এক তথ্য যা পেল, তাতে বোঝা যাচ্ছে: জ্যারোন ব্রাঙ্কো ভয়ঙ্কর এক খুনি।

হেলেনের চোখ বেঁধে দিয়েছে ফারা। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ওরা।

স্বর্ণার দিকে চাইল রানা । 'তোমার মিশন বাদ।'

'জী? কেন?'

'নিরস্ত্র তোমাকে ওই ফ্যাসিলিটিতে যেতে দেয়া যায় না। ওখানে থাকবে জ্যারোন ব্রাঙ্কো।'

'কিন্তু, মাসুদ ভাই, আমি তো নিজেকে রক্ষা করতে জানি।'

'এ নিয়ে আর কোনও আলাপ নয়,' একটু কঠোর শোনাল রানার কণ্ঠ। 'আমার যদি কোনও ভুল না হয়ে থাকে, জ্যারোন ব্রাঙ্কো গণহত্যাকারী। কাজেই ওখানে তোমাকে পাঠাব না আমরা। আতাসি ওই রেকর্ড স্ক্রাব করে আরও তথ্য পেয়েছে। ক্রিংগলের সঙ্গে কেসলার যে কথা বলে, তার ভিতর ছিল পার্লা মোনার কথা। আমরা জানি সে নামকরা রেসপন্সিভিস্ট। তার কাছ থেকে তথ্য মিলতে পারে। আমাদের পরের কাজ ওর কাছ থেকে ওদের পরিকল্পনা জানা।'

'এই অভিনেত্রী যদি কট্টর রেসপন্সিভিস্ট হয়, মুখ থেকে কথা বের করা কঠিন হবে,' বলল কাশেম।

'অভিনেত্রী. পোড় খাওয়া গুপ্তচর তো নয়,' বলল সোহেল। 'নিজের কথা বলতে শুরু করলে আজ পর্যন্ত যা করেছে, সব বলতে চাইতে পারে। এখন প্রথম কাজ তার কাছে পৌঁছুনো।'

'পার্লা মোনা এখন জার্মানিতে,' বলল স্বর্ণা। 'একটা ছবির শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে ওখানে।'

একটা ভুরু উঁচু ও অপরটা নিচু করে চাইল রানা স্বর্ণার দিকে। যেন নীরবে বলছে, সন্দেহ করছি সব সিনেমা দেখো।

দুই গাল লালচে হয়ে উঠল স্বর্ণার। 'হলিউডের খবর রাখি।'

খুকখুক করে কেশে উঠল সোহেল। 'এ মেয়ের কাছে পৌঁছুনো নিয়ে কথা, এই তো? তরুণ মেকআপ আর্টিস্ট মোফিজ বিল্লাহ এখনও হলিউডি বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। সে হয়তো পৌঁছে যেতে পারে পার্লা মোনা পর্যন্ত।'

মোফিজ বিল্লাহ্ একটু পাগলাটে মানুষ। হলিউডে মেকআপ আর্টিস্ট ছিল। ওকে তরুণ শিল্পী না বললে রেগে যায়। বয়স চল্লিশ মত। হলিউডে খুব ভাল করছিল। ভেবেছিল জীবন কাটিয়ে দেবে সেখানে। কিন্তু নাইন ইলেভেনে নর্থ টাওয়ারে মারা পড়ল ওর প্রিয় ছোটবোন। এর তিনমাস পর বিল্লাহ ফিরল বাংলাদেশে। ততদিনে জনপ্রিয় নায়ক ও নায়িকাদের দুর্ব্যবহার পেয়ে তিক্ত হয়ে গেছে মন। আমেরিকানরা ছিল তখন মুসলিম বিরোধী। অ-শ্বেতাঙ্গ এবং মুসলিম মানেই সন্ত্রাসী।

ঢালিউডে কিছুদিন কাজ করবার পর পুরুষদের জন্য বিউটি পার্লার খুলল সে। দ্রুতই দাঁড়িয়ে গেল ব্যবসা। কয়েক বছর আগে এক গভীর রাতে ছিনতাইকারীর কবলে পড়ল। সে সময় তাকে উদ্ধার করে মাসুদ রানা। হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় তিন

ছিনতাইকারীকে। এরপর থেকে রানার (ভাড়া করা) গুলশানের বাড়িতে দেখা করতে আসত মোফিজ বিল্লাহ্। বছর খানেক আগে রানা জানতে চায়, কিছুদিনের জন্য ওর সঙ্গে জাহাজে কাজ করবে কি না। শুনে লাফিয়ে ওঠে সে। সাগর তার পছন্দ। এরপর একটা অভিযানে বের হয় ওরা। সেটা শেষ হলে রানার সঙ্গে তার কথা হয়। ঠিক হয়, রানা যদি কখনও কোনও কাজ দিতে চায় তাকে, সে খুশি মনে করবে।

মোফিজকে বিশেষ কিছু ট্রেনিঙের ব্যবস্থা করে দেয় রানা। এখন নিজ যোগ্যতায় সে দুনিয়ার সেরা অন্যতম বিউটিশিয়ান ও মেকআপ-ম্যান।

'ঠিক জায়গায় ধরেছিস, সোহেল,' বলল রানা। 'মোফিজ যদি পার্লা মোনার সঙ্গে আলাপ করে, হয়তো বেরিয়ে আসবে এরা কী করছে।'

মৃদু হাসল সোহেল। 'তবে ও যদি কিছুই না জানে, তো সময় নষ্ট হবে।'

'প্রার্থনা কর্ যেন পার্লা মোনা মুখ খোলে। আমি মার্ভেলের কাউকে গ্রিক রিট্রিটে পাঠাব না।'

'আর একা যাবি তুই ফিলিপিন্সে?' মাথা নাড়ল সোহেল। 'ভুলে যা। আমিও যাব, নইলে যাবি না তুইও।'

'তোর তো এখানে কাজ আছে।'

'উঁহুঁ। উর্বশী ওর ভাইকে নিয়ে ব্যস্ত, তবে রোম থেকে ফিরছে ফু-চুং। আমরা মোনাকো পৌঁছলে পরদিন পৌঁছবে ও। তা ছাড়া সিনিয়রদের ভিতর থাকছে অনিল, আতাসি আর গগল। কোনও ঝামেলা হওয়ার কথা নয়।'

এবার আর আপত্তি তুলল না রানা। 'ঠিক আছে। ওখানে সার্ভেইল্লেন্সের কাজ সহজ। তা ছাড়া তিনদিনের ভিতর ফিরছি

আমরা।'

'তা হলে শুরু কর ডিনার,' তাড়া দিল সোহেল। 'ট্র্যাডিশনাল ড্যানিশ খাবার এনজয় করার চেষ্টা করি।'

ইচ্ছে করেই একটু জোরে বলেছে সোহেল। কিচেনের দরজা ফাঁক করে মাথা বের করল মোস্তফা আবুল। থমথম করছে চেহারা।

বিশ

এলিভেটরের দেয়ালে হেলান দিয়েছে ফু-চুং, আড়াই মিনিট পর লবিতে নেমে এল লিফট। ডানদিকে দাঁড়িয়েছে উর্বশী, দরজা খুলে যেতেই বেরিয়ে যেতে চাইল। তবে পারল না। আগেই হুড়মুড় করে এলিভেটরে ঢুকে পড়েছে দুই লোক।

বিরক্ত হলো ফু-চুং। এরা ভদ্রতার ধার ধারছে না। ততক্ষণে ওকে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে একজন। সরতে শুরু করেই বুঝল ফু-চুং, সামনে ঝামেলা। ওর কোটের ভিতর হাত ভরে দিয়েছে লোকটা। নড়বার আগেই হোলস্টার থেকে বের করে নিল সাইলেন্সার লাগানো বেরেটা পিস্তল। এক সেকেণ্ড লাগল না ওর দুই চোখের মাঝে মাযল ঠেকাতে। দ্বিতীয় লোকটা হাতে পিস্তল নিয়েই ঢুকেছে, বামহাতে কেড়ে নিল উর্বশীর পার্স। পেশাদার।

'নড়লে মরবে,' বিশালদেহী লোকটা বলল। ইংরেজির ভিতর ভিন দেশি টান।

এলিভেটরের বন্ধ জায়গায় নড়া কঠিন, মার্শাল আর্ট কোনও কাজে লাগবে না। অন্য কোনও কৌশল দরকার। ভাবতে শুরু করেছে ফু-চুং। কিন্তু বিশাল লোকটা পিস্তলের নল দিয়ে জোরে খোঁচা দিল উর্বশীর বাম বুকে।

'উহ্!' কুঁচকে গেল উর্বশীর গাল। চোখে আঁধার দেখছে।

'শেষবার সাবধান করলাম,' চাপা স্বরে বলল প্রকাণ্ডদেহী।

ফিসফিস আওয়াজ তুলে বন্ধ হলো দরজা। উঠতে শুরু করেছে এলিভেটর।

একটু সামলে নিয়েছে উর্বশী, একবার চাইল ফু-চুঙের দিকে। ভাবছে, এত দ্রুত ওদের খুঁজে পেল কী করে রেপঙ্গিভিস্টরা? এ লোক যদি জ্যারোন ব্রাঙ্কো হয়, তো মস্ত বিপদে পড়েছে ওরা। ফোনে এর কথা জানিয়েছে রানা। কিন্তু এত গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে কেন অমলকে? একেবারে পাল্টা কিডন্যাপ করতে হবে? কেন? যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।

'আমাকে মেরে ফেলতে হবে, নইলে পাবে না অমলকে, ব্রাঙ্কো,' শান্ত স্বরে বলল উর্বশী।

মনে হলো চমকে গেছে সার্ব। ভাবতে পারেনি তার নাম জানে উর্বশী। তবে দ্রুত সামলে নিল। বুঝে নিয়েছে ছারপোকা থেকে টেপ করা হয়েছে ওর কথা।

দেখলে সাধারণ মস্তান মনে হয়, ভাবল ফু-চুং। তবে তা নয়, এ লোক ঠাণ্ডা মাথার খুনি।

'দরকার পড়লে মেরে রেখে যাব, সে তো জানোই,' বলল ব্রাঙ্কো।

তুমি জানো না আমাদের পরিচয়, মনে মনে বলল ফু-চুং। হাতে টেক্কা নেই, তবে এটুকুও কিছু না থাকার চেয়ে ভাল। ভাবতে চাইল, ব্রাঙ্কোর জায়গায় ও হলে কী করত। প্রথমেই

জানতে চাইত রেপন্সিভিস্টদের সিকিউরিটি কতটা ভেদ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এ লোক ওদের আটক করবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। তার আগেই ফাঁদ কেটে বেরুতে হবে। অস্ত্র নেই, কাজেই ওরা একে অপরের সাহায্যে আসবে না। যা করবার নিজের চেষ্টায় করতে হবে। কেউ আসবে না উদ্ধার করতে। হোটেলের কর্তৃপক্ষকে আগেই জানিয়েছে ওরা, কেউ যেন বিরক্ত না করে।

এলিভেটর উঠছে, তার আগেই বুঝে ফেলেছে ফু-চুং, কী ধরনের বিপদে পড়েছে। মরতে চলেছে ব্রাঙ্কোর হাতে। বাঁচতে চাইলে হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। এবং সেটা আলাদা আলাদা ভাবে। উর্বশী দক্ষ নেভি অফিসার, নানান ধরনের ট্রেইনিং নিয়েছে। বুদ্ধিমতী, নইলে নেভাল ইন্টেলিজেন্সে টিকত না। তবে এই মুহূর্তে দুলছে ওর মন। হয়তো চাইবেই না নিজেকে রক্ষা করতে। সর্বক্ষণ ভাবছে ভাইয়ের কথা। চাইছে তাকে আগলে রাখতে। কাজেই যা করার ওর নিজের করতে হবে।

খুলে গেল এলিভেটরের দরজা। নীরব সঙ্গীকে নিয়ে পিছিয়ে গেল ব্রাঙ্কো। অস্ত্র তাক করে বেরুতে বলছে। পরস্পরের দিকে চাইল ফু-চুং ও উর্বশী। যেন নিঃশব্দে আলাপ হলো। একই কথা ভাবছে। এবং নীরবে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছুল। তিরতির করে কাঁপল উর্বশীর চোখের পাপড়ি। ওটা যেন ফু-চুংকে জানিয়ে দিল, সুযোগ বের করে চলে যান এখান থেকে। নিজেকে রক্ষা করুন। আমি নিজে রয়ে যাব ভাইয়ের পাশে। ফলাফল যাই হোক।

করিডোর ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা। সোজা গিয়ে থামল সুইটের দরজার সামনে। একবার মার্শাল আর্ট দিয়ে চেষ্টা করব, ভাবল ফু-চুং। ব্রাঙ্কোর সঙ্গী খানিক পিছনে। এক আঘাতে তাকে শেষ করা সম্ভব। তবে সার্ব রয়েছে কয়েক ফুট পিছনে। খেয়াল করছে ওদের হাঁটবার ভঙ্গি।

'বামহাত দিয়ে পকেট থেকে কি কার্ড বের করুন,' নির্দেশ দিল ব্রাঙ্কো।

তিক্ত হয়ে গেল ফু-চুঙের মন। বেশিরভাগ ডানহাতি লোক ডান পকেটে রাখে চাবি। এ লোক ধরে নিয়েছে ও ডানহাতি। ডান পকেট থেকে বামহাতে চাবি বের করতে চাইলে বেকায়দা হবে। কোনও সুযোগ রাখছে না সার্ব।

শরীর মোচড় দিয়ে দাঁড়াল ফু-চুং, চাবি বের করবে। তারই ফাঁকে চাইল ব্রাঙ্কোর চোখে। স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'ওটা বিশেষ ধরনের তালা। ভিতরে ঢোকা যাবে না।'

'এ জিনিস আগেও দেখেছি। খোলা যায়। আরেকবার কথা বললে আপনার বাম হাঁটুর উপর গুলি করব।'

ডান পকেটে বামহাত ভরল ফু-চুং, বের করল ইলেকট্রনিক কি, ওটা ভরল তালার ভিতর। ইনসার্ট বাতি লাল থেকে সবুজ হলো। এবার হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে ভিতরে ঢোকা যায়।

'এবার পিছিয়ে আসুন,' নির্দেশ দিল ব্রাঙ্কো।

পিছিয়ে এল উর্বশী ও ফু-চুং। সুইটের ভিতর ঢুকল ব্রাঙ্কোর সঙ্গী। পাঁচ সেকেণ্ড পর ডক্টর চার্চের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, চমকে উঠেছেন। 'আপনি এখানে কী করছেন! কী চান?' দ্বিতীয়বার একই কথা বললেন ডক্টর।

বিশ সেকেণ্ড পর গলা উঁচু করল ব্রাঙ্কোর সঙ্গী। ইংরেজি উচ্চারণ জানিয়ে দিল এ লোক আমেরিকান। 'সুইটে অন্য কোনও লোক নেই। শুধু ডিপ্রোগ্রামার, আর ছেলেটা।'

পিস্তলের নল দিয়ে ইশারা করল ব্রাঙ্কো। সুইটের ভিতর ঢুকল ফু-চুং ও উর্বশী। ডক্টরের তালা এক পলক দেখল সার্ব। দরজা বন্ধ করল না। তার জানা আছে ভিতর থেকে বন্ধ হয়ে যায় তালা।

'দিদি?' সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অমল। ড্রাগের কারণে বিধ্বস্ত চেহারা।

'অমল।'

'তুমি এভাবে আমাকে অপমান করলে কেন?' চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা।

'কারণ আমি তোকে ভালবাসি,' বলল উর্বশী। কণ্ঠে অসহায়তা ও আবেগ।

'আমি কি কচি খোকা...'

'চুপ্!' ধমকে উঠল ব্রাঙ্কো। ডক্টর চার্চের সামনে থামল সে। মনে হলো পাহাড় দাঁড়িয়েছে বামনের সামনে। ভীষণ ভয় পেয়েছেন ভদ্রলোক। বার কয়েক ঢোক গিললেন।

খুনি সার্ব গর্জে উঠল, 'মিস্টার কেসলার বলে দিয়েছে যেন তোকে খুন না করি। তবে বলেনি এটা করলে কী হবে।' বলেই খটাস্ করে পিস্তলের বাঁট নামিয়ে আনল সাইকিয়াট্রিস্টের মাথার উপর।

একইসঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল। মেঝের উপর ঢলে পড়লেন চার্চ। ক্ষত থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। ওই একই মুহূর্তে দৌড়াতে শুরু করল ফু-চুং।

ফ্রেঞ্চ ডোর পেরুলে ব্যালকনি, ওখানে পৌঁছতে হলে পেরুতে হবে দশ কদম। কেউ কিছু বুঝবার আগেই চার ভাগের তিন ভাগ পেরুল ফু-চুং। তার আগেই ডানদিকে এক পা ফেলেছে উর্বশী। ওর কারণে গুলি করতে পারল না দ্বিতীয় লোকটা। তখনও রাগ নিয়ে ডক্টরের দিকে চেয়ে ব্রাঙ্কো।

তীরের মত দরজা পেরুল ফু-চুং, কুঁজো করে নিয়েছে দুই কাঁধ। মুহূর্তে দামি কাঠের ফ্রেম ও অ্যান্টিক কাঁচ ভেদ করে বেরিয়ে গেল। ভাঙা কাঁচ ঝরঝর করে পড়ল ওর উপর। এখানে-

ওখানে কেটে গেল। পরক্ষণে এল গুলির আওয়াজ। কাঁধের উপর দিয়ে শিস তুলে গেল বুলেট, গাঁথল ইঁটের দেয়ালে। চারপাশে ছিটকে উঠল লাল ইঁটের কণা।

না থেমেইনি রেলিঙে পৌঁছে গেল ফু-চুং। দু'পা তুলেই পেরিয়ে গেল বাধা, ততক্ষণে ঘুরছে ওর দেহ। শূন্যে ঘুরে গিয়ে বাড়ির দিকে মুখ করল। আটতলা থেকে পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু অসংখ্য রট আয়রন রডের দুটো খপ করে ধরল। পিছলে নেমে চলেছে ঘর্মাক্ত হাত। বাধা দিল না নিজ পতনকে। অনেক নীচে পাকা সড়ক। সাঁই-সাঁই চলছে গাড়ি-ঘোড়া।

নীচের মেঝের কংক্রিট বাধা দিল দুই হাতকে। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল ফু-চুং। টের পেল দুই পায়ের বুড়ো আঙুল স্পর্শ করেছে সাততলার রেলিং। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সরিয়ে নিল দুই হাত। আবার পড়তে শুরু করেছে। অনেক নীচে ফুটপাথ। মুখের সামনে সাততলার ব্যালকনি দ্রুত উপরে উঠছে। দুই হাতে খপ করে ধরল দুটো রড, আবার কমিয়ে নিল গতি। নিয়ন্ত্রিত গতিতে নেমে চলেছে। এ যেন ওর প্রচণ্ড শক্তি ও সামর্থ্যের প্রকাশ। মনে বিন্দুমাত্র ভয় নেই।

ছয়তলার রেলিঙে পা রাখল, ঠিক করে নিল ভারসাম্য, তারপর আবার খসে পড়ল। ততক্ষণে সুইটের ব্যালকনিতে বেরিয়ে এসেছে ব্রাঙ্কো। ভেবেছে পেভমেন্টে দেখবে লোকটার লাশ। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর নীচের ব্যালাস্টারে দেখল ফু-চুংকে। গুলিবৃষ্টি শুরু করল সার্ব।

চারপাশে একের পর এক গুলি, চাবুকের মত বাতাস এসে লাগছে দেহে। রড বেয়ে নেমে চলেছে ফু-চুং। পঞ্চমতলার কংক্রিটের মেঝের উপর ঠাস্ করে নামল দুই হাত। আকড়ে ধরল দুই শিক। প্রচণ্ড টান পড়ছে দেহে। তীব্র ব্যথায় লাল হয়ে গেল

মুখ। এখনও চারতলা ব্যালকনির রেলিঙে পৌঁছয়নি পা। ছেড়ে দেবে রড? নীচে গিয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু! তবে পায়ের এক ইঞ্চি নীচে পেয়ে গেল রেলিং। আস্তে করে ভর দিল রেলিঙে। চরকির মত ঘুরছে দু'হাত, চাইছে ভারসাম্য রাখতে। তিন সেকেণ্ড ওভাবে রইল, তারপর নতুন করে শুরু হলো পতন। খপ্ করে ধরতে হবে চতুর্থতলা ব্যালকনির রড। যে-কোনও সময়ে টান খেয়ে ভাঙবে হাতের হাড়। এই ভাবে নামতে পারলে তা হবে বিস্ময়কর একটা ব্যাপার।

শরীর ঘুরিয়ে ঝুঁকে পড়েছে ব্রাঙ্কো, তবে গুলি করতে পারছে না। গুলির আওয়াজে উপরে চাইছে পথচারীরা। অবাক ব্যাপার! চিনা এক লোক দুর্দান্ত স্টাণ্ট দেখিয়ে নেমে চলেছে! অস্ত্র সরিয়ে নিল ব্রাঙ্কো, দৌড়ে গিয়ে ঢুকল সুইটে।

আবার রড বেয়ে নামতে শুরু করল ফু-চুং। ফেটেছে দু'হাতের তালুর চামড়া। খসখস করছে। তৃতীয়তলার রড ধরে ফেলল। একবার ভাবল, কেমন হয় ব্যালকনি পেরিয়ে ঘরে ঢুকে গেলে! তবে জানা নেই ব্রাঙ্কোর সঙ্গে ক'জন থাকবে। হয়তো পুরো হোটেল ঘিরে রেখেছে। এখন ওর উচিত এ হোটেল থেকে বেরিয়ে যাওয়া। পরে ভেবে ঠিক করবে কী করা যায়।

দোতলা পনেরো ফুট সামনে বেড়ে পেভমেণ্টের উপর গেছে। ওখানে হোটেলের লবির ছাত। নীচে নামতে হলে পেরুতে হবে বিশ ফুট। তবে বামদিকে উজ্জ্বল হলুদ ক্যানোপি। ওটা ঢেকেছে সাইডওয়াক ও হোটেলের এণ্ট্র্যান্স। কসরৎ করে রেলিঙের উপর উঠে এল ফু-চুং, দড়িবাজের মত বামে সরছে, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যানোপি লক্ষ্য করে। দেহ ঘুরিয়ে নিয়েছে, টানটান কাপড়ের উপর নেমে এল পিঠ দিয়ে।

ছাতি থেকে পিছলে পড়ছে। ততক্ষণে নীচের দিকে তাক

করেছে দুই পা। দুই উরুর ভিতর পেয়ে গেল ছাতির ফ্রেমের শিক। দ্রুত নেমে চলেছে, তারই ফাঁকে নিজেকে সোজা করে নিতে চাইল। পারল না। মনে হলো ছাত থেকে সমারসল্ট দিয়ে নীচে গিয়ে পড়বে। একবার দুই হাতে শক্ত করে ধরল কাপড়। ছ্যাঁৎ করে উঠল ছেঁড়া ত্বক। কয়েক সেকেণ্ড ওখানে ঝুলে রইল, তারপর সামলে নিয়ে আস্তে করে নেমে এল পেভমেণ্টে। ক'জন দর্শক জুটেছে। হাততালি দিয়ে চলেছে। ভেবেছে সিনেমার শ্যুটিং চলছে। জানে না, মরতে বসেছিল মানুষটা!

লাফ দিয়ে ফুটপাথে উঠল ফু-চুং, ভিড়ের ভিতর দিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে। ঠিক তখন চারপাশের আওয়াজ ছাপিয়ে এল ইঞ্জিনের গর্জন। ঘুরে চাইল ফু-চুং, পিছনের বাঁক থেকে রওনা হয়েছে একটা লাল ডুকাটি মোটরসাইকেল। ওটার সামনে থেকে ছিটকে সরছে পথচারীরা। পুরো থ্রটল খুলে তীব্র গতি তুলল আরোহী। আর বড়জোর পনেরো ফুট দূরে শিকার।

দৌড়াতে শুরু করেছে ফু-চুং। মনে হলো হোটেলের পাশের এক বইয়ের দোকানে ঢুকতে চলেছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে উঠল পার্ক করা এক গাড়ির হুডে। পিছলে নেমে গেল ওপাশে, সড়কে নেমেই পড়ল আরেক বিপদে। জ্যামের ভিতর জায়গা পেয়ে সামনে বেড়েছে এক ভলভো ট্রাক। গাড়ির হুড থেকে কেউ নেমেছে খেয়াল করেনি ড্রাইভার। অ্যাক্সেলারেটার দাবিয়ে ধরল সে। এক সেকেণ্ড পর ট্রাকের নীচে চাপা পড়বে ফু-চুং। এগিয়ে এল ধুলোমাখা চাকাগুলো। রাস্তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ফু-চুং, দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে মাথা। জানে, মরতে চলেছে। ওর মনে হলো, জ্বলন্ত ফার্নেসের ভিতর পুড়ছে। ইঞ্জিন থেকে এল তীব্র তাপ ও তেলের গন্ধ। পরক্ষণে ওকে পেরিয়ে গেল দশ চাকার ট্রাক।

ব্রেক কষল যন্ত্রদানবের ড্রাইভার। অ্যাসফল্টের উপর কর্কশ আওয়াজ তুলল চাকা। আবারও মোটরসাইকেলের গর্জন শুনল ফু-চুং। ওটা বোধহয় দু'পাশে পার্ক করা গাড়িগুলোর মাঝের সড়কে, ভলভোর সামনে।

ট্রাকের নীচ থেকে ছিটকে বেরুল ফু-চুং, চট্ করে দেখে নিল চারপাশ। উল্টো দিকের লেনে ছাত-খোলা এক ডাবল-ডেকার টুরিস্ট বাস। ওটা থেকে নামছে টুরিস্টরা। আশা করা যায় উঠে পড়লে খেয়াল করবে না ড্রাইভার। এক লাফে বাসের পাশে পৌঁছুল ফু-চুং, একটা জানালা ধরে নিজেকে তুলে নিল রাস্তা থেকে। পাশের ট্রাকে বাম পা রেখে ডান পা ঠেকাল বাসের গায়ে। মাঝখানের ফাঁক দিয়ে উঠতে হবে। প্রতিবারে উঠছে এক ফুট করে। জানালা দিয়ে অবাক হয়ে দেখছে টুরিস্টরা। প্রচণ্ড শারীরিক শক্তি ও দক্ষতা ওকে তুলে নিয়ে চলেছে উপরে। এক মিনিট পেরুনোর আগেই ভলভো ট্রাকের উপর উঠে পড়ল ফু-চুং। ছাতের উপর গড়িয়ে দিল দেহ, হাপরের মত হাঁপিয়ে চলেছে। ভেবেছে এবার একটু বিশ্রাম নেবে, কিন্তু তা হলো না। ওর মুখের পাশে গেঁথেছে কী যেন! জ্বলন্ত ধাতু হিস্-হিস্ আওয়াজ তুলল।

মুখ তুলে চাইল ফু-চুং। হোটেলের ব্যালকনিতে আবারও এসে দাঁড়িয়েছে জ্যারোন ব্রাঙ্কো। পিস্তল তাক করছে ওর মাথা লক্ষ্য করে! কী ঘটছে টের পাবে না পথচারীরা। অস্ত্রের মুখে সাইলেন্সার। আরাম করে শিকার করতে চাইছে। এক লাফে উঠে দাঁড়াল ফু-চুং, ঝেড়ে দৌড় দিল ছাত ধরে। পরক্ষণে লাফ দিল বাস লক্ষ করে। মাত্র রওনা হয়েছে ওটা। সিটের উপর দিয়ে উড়ে গেল ও, নীচে রইল জাপানি টুরিস্ট। তাদের টপকে ধুপ করে পড়ল মাঝখানের আইলে। ওখান থেকে উঠেই রওনা হয়ে গেল বাসের পিছন দিক লক্ষ্য করে। তারই ফাঁকে দেখেছে, ভলভো

ট্রাক ঘুরে পিছু নিয়েছে ডুকাটি মোটরসাইকেল।

হোটেল থেকে নিরাপদে বেরিয়ে এসেছে ফু-চুং, কিন্তু এখন তাড়া করছে ওকে ব্রাঙ্কোর দলবল।

মোটরসাইকেলের কালো পোশাক পরিহিত আরোহী পিছু নিয়েছে বাসের। নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করছে না। এর হেলমেটের ভিতর রেডিও আছে কি না, জানে না ফু-চুং। তবে অপারেশনের দায়িত্বে রইলে ও নিজে চাইত এর সদস্যরা যেন নিজেদের ভিতর যোগাযোগ রাখে। আর তাই ওর মনে হয়েছে, কিছুক্ষণের ভিতর হাজির হবে এর সঙ্গীরা। ব্রাঙ্কো নিশ্চয়ই হোস্টেজ রেসকিউ টিম বিষয়ে বিশদ জেনে এসেছে। কাজেই অমল দাশাকে কেড়ে নিতে সঙ্গে এনেছে বড় কোনও দল।

চার লেনওয়ালা বড় সড়কে পড়েছে বাস, গতি তুলে চলেছে কোলোসিয়ামের দিকে। বাসটাকে পাশ কাটানোর সময় তীব্র-গতি গাড়িগুলোর ড্রাইভাররা কখনও বিশ্রী ভঙ্গি করছে জানালা দিয়ে। ডুকাটি মোটরসাইকেল যেন কোনও মাণ্টা রে, অনুসরণ করে চলেছে মস্ত কোনও তিমিকে।

পাঞ্জা দুটো বারবার মুঠো করছে ফু-চুং, চাইছে স্বাভাবিক হোক রক্ত চলাচল। তার ফাঁকে ভাবছে কীভাবে উদ্ধার পাওয়া যায় এই ঝামেলা থেকে। সুইটে রেখে এসেছে নিজের সেল ফোন। ভেবেছিল ফোন সঙ্গে রয়েছে উর্বশীর, তাতেই হবে। হঠাৎ উদ্ভট একটা চিন্তা এল ওর মনে। জানে হাতে সময় নেই। এ পরিকল্পনা বাদই দিত, কিন্তু মরিয়া হয়ে উঠেছে। কাজেই...

বাসের পিছনে সরু সিঁড়ির দিকে চাইল ফু-চুং, রওনা হয়ে গেল ওটার দিকে। নেমে এল এক তলায়। মনে মনে স্বস্তির শ্বাস ফেলল। এই ট্রিপে বেশি টুরিস্ট নেই। পুরো বাসে রয়েছে জনা পনেরো যাত্রী। তাদের বেশিরভাগই উপরের তলায়। নীচে যারা

রয়েছে তারা চারপাশ দেখছে, ফু-চুঙের দিকে ফিরেও চাইল না। আইল ধরে কুঁজো হয়ে সামনে বাড়ল ও, ড্রাইভারের দিকে চলেছে। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছে এক মহিলা অনুবাদক, দু' হাতে রুপালি বোর্ড। বক্তৃতার জন্য পড়ছে ট্যুর স্ক্রিপ্ট। ফু-চুং এগিয়ে যেতেই মুখ তুলল সে, ফাইল রেখে মিষ্টি হাসি দিল। ধরে নিয়েছে ফু-চুং তার গ্রুপের কেউ। জাপানি ভাষায় কী যেন জানতেও চাইল।

ভাব দেখে মনে হলো শোনেইনি ফু-চুং। ড্রাইভারের দিকে খেয়াল। লোকটার পরনে সাদা শার্ট, কালো টাই, মাথার উপর ক্যাপ, বিমানের পাইলটের। লোকটা স্বাস্থ্যবান নয়, খুশি হয়ে উঠল ফু-চুং। খপ্ করে তার ডান বাহু ধরল, একটানে সরিয়ে দিল ড্রাইভিং সিট থেকে। কুঁজো হয়ে গেছে, পরমুহূর্তে কাঁধের উপর তুলেই পিছনে ফেলল ড্রাইভারকে। ডিগবাজি খেয়ে পিছলে পড়ে গেল লোকটা বাসের সিঁড়ির ধাপে। সেখান থেকে নামল দরজার উপর। ঠাস্ করে কপালে লাগল হাতল। ওখানেই ধুপ করে পড়ল। অচেতন।

শক্তিশালী ডিজেল ইঞ্জিন বিরতি নেয়নি বললেই চলে, তার আগেই ড্রাইভিং সিটে বসে পড়েছে ফু-চুং। মেঝের সঙ্গে চেপে ধরল অ্যাক্সেলারেটার। ট্যুর গাইড প্রাণপণে চেঁচাতে শুরু করেছে। তার চিল-চিৎকার ভীত করে তুলল যাত্রীদের। বিশাল উইং মিররে চাইল ফু-চুং, পরক্ষণে কড়া ব্রেক কষল।

চারপাশ থেকে শুরু হলো হর্নের আওয়াজ। পিছনের গাড়িগুলো ব্রেক কষছে। বাসের পিছন থেকে সরে গেল মোটরসাইকেল, পাশের গাড়িগুলোর মাঝখানের সরু জায়গা দিয়ে এগিয়ে আসছে। তাকে আসতে দিল ফু-চুং, তারপর হঠাৎ গতি বাড়িয়ে বাঁয়ে সরতে লাগল। মোটরসাইকেলের সামনে আর পথ

নেই। পাশের লেনে একের পর এক গাড়ি, প্রায় ঠেকিয়ে রেখেছে সামনের গাড়ির বাম্পারে। ব্রেক চেপে পিছনে রয়ে যেতে পারে মোটরসাইকেল। সেক্ষেত্রে আবারও পিছু নিতে হবে। কিন্তু তা করল না আরোহী, মাঝখানের সরু অংশ পেরিয়ে এগুতে চাইল। নিচু গিয়ার ফেলল সে, মুচড়ে ধরল থ্রটল। গর্জে উঠল এক হাজার সিসি ইঞ্জিন. রাস্তা ছাড়ল সামনের চাকা। হ্যাণ্ডেলবারের কাছে নামিয়ে নিয়েছে মাথা, দ্রুত এগুতে চাইছে। বাতাসের বাধা খানিক কমে যেতেই বোধহয়, বাড়তি গতি পেল।

তবে কোনও সুযোগ নেই আরোহীর। দশ ফুট দূরে ড্রাইভিং সিটে ফু-চুং। বাসের ধাক্কা খেয়ে বামের লেনে চলে গেল ডুকাটি, দড়াম করে গুঁতো দিল এক গাড়ির পিছনে। মোটরসাইকেল থেকে উড়াল দিল আরোহী, সামনের গাড়ি পেরিয়ে পরের গাড়ির পিছনের কাঁচে গিয়ে নামল হেলমেট নিয়ে। সেফটি কাঁচ বিস্ফোরিত হতে মনে হলো ছিটকে উঠল হাজারো হীরা। লোকটা যদি সুস্থ থাকে, বলে বেড়াবে বেঁচেছে হেলমেটের কারণে। ওই এক সংঘর্ষে একের পর এক ছোট দুর্ঘটনা ঘটতে শুরু করল সামনের লেন জুড়ে।

বাস থামাল ফু-চুং, দরজা খুলবার কণ্ট্রোল টিপে দিতেই আংশিক ভাবে খুলে গেল দরজা। পুরো খুলবে না অচেতন ড্রাইভারের কারণে। অনুভব করছে ফু-চুং, রক্তে কমে আসছে অ্যাড্রিনালিন। সিট থেকে উঠে পড়ল, ট্যুর গাইডের দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'আমি সত্যিই দুঃখিত।'

মস্ত হাঁ করে খাবি খেল গাইড, মুখ দিয়ে কথা বেরুল না।

একবার চট্ করে পিছন দিক দেখে নিল ফু-চুং। ওখানে ঝামেলা শুরু হয়েছে। এক বাঁক থেকে আরেক বাঁক পর্যন্ত গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট। গাড়ির মালিকরা বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে চলেছে

সম্ভব শুধু ইটালিতে। বাস থেকে নেমে পাশের এক গলিতে চলে এল ফু-চুং, একবার চাইল পিছনে। ঠিক তখন দেখল সেডানটা। চারপাশের গোলমালে যুদ্ধের ট্যাঙ্কের মত আসছে ওটা। দুই লোক ওটার সামনে থেকে সরতে চাইল, বদলে গুঁতো দিল সামনের গাড়িকে। সেডানের গতি কমছে না, সামনের বাম্পার বাঁকা-চোরা। ভিতরের লোকগুলোকে দেখতে পেল না ফু-চুং। তাদের চেপে ধরেছে ইনফ্লেটেড এয়ার ব্যাগ।

ওরা ওকেই শিকার করতে চাইছে, বুঝতে দেরি হলো না ওর। দুই লাফে আবার এসে উঠল বাসে, বসে পড়ল ড্রাইভিং সিটে। কান খাড়া রেখেছে। সুন্দরী ট্যুর গাইড এইমাত্র চেঁচানোয় বিরতি দিয়েছে, কিন্তু হঠাৎ দেখল সেই ভয়ানক লোকটা আবার কোত্থেকে উদয় হয়েছে! এবারের চিৎকার তিনগুণ বাড়ল। তারই ফাঁকে গুলির মত বেরুল ইতালিয়ান ভাষা। দাঁড়ি-কমা নেই, স্রেফ বিরতিহীন গালি।

অটোমেটিক ট্র্যান্সমিশন দিল ফু-চুং, দেরি না করে ফেলল গিয়ার। জোর এক ঝাঁকি খেয়ে রওনা হলো বাস। সিট ছেড়েছে কয়েকজন টুরিস্ট, হুড়মুড় করে মেঝের উপর পড়ল তারা।

একহাতে হুইল ধরেছে ফু-চুং, কোলোসিয়ামের বৃত্তাকার সড়কে এগিয়ে চলেছে। ডান কাঁধের কাছে ঝুলন্ত পিএ সিস্টেম মাইক্রোফোন। ওটা বামহাতে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'সবাই উপরতলায়! জলদি!'

মাত্র ক'জন টুরিস্ট, জান হাতে নিয়ে ছুটল তারা বাসের পিছন দিকে। উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। রিয়ারভিউ মিররে চোখ রেখেছে ফু-চুং. কালো ফিয়াট ব্রাভো তেড়ে আসছে বুলেটের মত। দেখতে না দেখতে চলে এল বাসের পাশে। ভিতরে তিনজন লোক। সামনের জনের হাত ডোরসিলের নীচে, তবে চোখে পড়ল পিছন

সিটের লোকটার কোলে রাইফেল।

জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল অ্যাসল্ট রাইফেলের নল, ব্রাশ ফায়ার করা হলো বাসের পাশে। বুলেটবৃষ্টির কারণে বিস্ফোরিত হলো জানালার কাঁচ, ছিন্নভিন্ন হলো সিটের গদি। বাতাসে ভেসে উঠল ফোম। গাড়ির দিকে সরতে শুরু করেছে ফু-চুং। ব্রেক চেপে পিছিয়ে গেল ব্রাভো। বাসের উপরতলা থেকে আসছে যাত্রীদের আর্তচিৎকার।

দু'পাশের গাড়িগুলো নিজ লেনে থেমেছে, সেগুলো এড়াতে গিয়ে বনবন করে ঘোরাতে হলো স্টিয়ারিং হুইল। টের পেল ফু-চুং রাস্তা ছাড়ছে বাসের বামদিকের চাকা। সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের কারণে যে-কোনও সময়ে উল্টে পড়বে ওরা। স্টিয়ারিং হুইলে হালকা মোচড় দিল ও, ভারী বাস ধপাস করে নেমে এল রাস্তার উপর। সাসপেনশনের কারণে বারবার দু'পাশে দুলছে। সামনের পথ সোজা, কোলোসিয়াম এক চক্কর ঘুরে এসেছে ওরা, চলেছে এখন উত্তর-পুবে। দু'পাশে প্রাচীন ও আধুনিকতার মিশেল। পেরিয়ে চলেছে অফিস ব্লক, চার্চ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির। আবারও বাসকে পিছনে ফেলতে চাইল ফিয়াট। দু'পাশে সরে গাড়িটাকে বাধা দিয়ে চলেছে ফু-চুং। কয়েকবার ধাতব আওয়াজ পেল। প্রতিবার ছিটকে সরে গেল ফিয়াট।

কমপক্ষে পঞ্চাশ মাইল গতি তুলে ছুটছে ফু-চুং। ভাবল, বারোটা বেজে গেছে সেডানের। আর এগুবে না ড্রাইভার। ঠিক তখনই খটাখট আওয়াজ তুলল অটোমেটিক রাইফেল। মনে হলো ঝাঁকি খেল প্রকাণ্ড বাসের চেসিস। লোকগুলো গুলি করছে ইঞ্জিন লক্ষ্য করে। পিছন থেকে থামিয়ে দিতে চাইছে বাস, তারপর উঠে এসে খুন করবে ওকে।

সামনে অদ্ভুত এক দৃশ্য চোখে পড়ল, ওটা হতে পারত বিশাল

এক ওয়েডিং কেক। ওই দালান সত্যিই প্রকাণ্ড, তৈরি করা হয়েছে মার্বেল পাথর দিয়ে। ওটা যেন ঝুঁকে আছে এরিনার দিকে। আবছা মনে পড়ল ফু-চুঙের, কোথায় যেন পড়েছিল ওটা দ্বিতীয় ভিক্টর ম্যানুয়ালের মনুমেন্ট। এ লোক গোটা ইটালির খুদে রাজ্যগুলো একত্র করেন, জন্ম দেন বর্তমানের ইটালি রাষ্ট্র। এই মার্বেলের বিল্ডিং এতই বড়, সামনে থেকে দেখলে হাঁ হয়ে যেতে হয়। একের পর এক পিলার, ধাপে ধাপে উঠেছে উপরে। হঠাৎ দেখলে লাগে বিশাল দাঁতের সারি, মনে হয় না মস্ত এক নেতার মনুমেন্ট।

বামে চলে গেছে সড়ক, এ পথে এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল ঘোড়ার পিঠে ব্রোঞ্জের ভিক্টর। সূর্য ডুবছে, সেই রক্তিম আলোয় মনুমেন্টের উপর টুরিস্ট ও ব্যাকপ্যাকাররা সফট ড্রিঙ্ক কিনছে ভেণ্ডারদের কাছ থেকে।

বাসের পিছনে আবারও লাগল এসে অসংখ্য গুলি। চারপাশে ছিটকে গেল টুরিস্টরা, মনে হলো বিস্মিত পাখির দল।

হয়তো ইঞ্জিনের জরুরি কোনও পার্টস নষ্ট হবে, অথবা সামনে পড়বে পুলিশের রোডব্লক। দূর থেকে আসছে সাইরেনের আওয়াজ। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হবে পুলিশ। একটা সাইন পড়ল ফু-চুং: *ভিয়া ডেই ফোরি ইমপেরিয়ালি।* ওটার অর্থ বুঝল না। ইটালিয়ানদের অন্য সব সড়কের তুলনায় সামনের সড়ক অনেক চওড়া। চারপাশ খোলা। এ পথে যাবে না, ঠিক করে ফেলল ফু-চুং। সামনে দু'দিকে বাঁক নিয়েছে সড়ক। একটা গেছে বিশাল এক পার্কিং লটে। ওখানে অসংখ্য বাস। ঠিক ওর বাসের মত।

বামের সড়কে বাঁক নিল ফু-চুং, এগিয়ে চলেছে। দু'পাশে চার-পাঁচতলা ইঁটের বাড়ি। নীচে দোকান। সেখানে চামড়ার

জিনিস থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক্স সবই পাওয়া যায়। কিছু দোকানে বিক্রি চলছে পোষা প্রাণীর। এ রাস্তা বেশ চওড়া, এমন পথ চাইছে না ফু-চুং। সামনে অসংখ্য গাড়ির ব্রেক লাইট। জ্যামে পড়েছে। বামহাতে হর্ন টিপে ধরল ফু-চুং, স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে চলে গেল সামনের বাঁকে। পাশের ফুটপাথে ভারী যান নিয়ে ওঠা কঠিন। বাস নিয়ে কাত হয়ে উঠে পড়ল কোবল পাথরের ফুটপাথে। পার্কিং মিটার খটা-খট ভাঙছে বাসের সঙ্গে লেগে। ওগুলো যেন উপড়ে নেয়া খড়। পাশের গাড়িগুলোকে ধাক্কা দিয়ে চলেছে বাস। হই-হই শুরু করল গাড়ির মালিকরা, চারপাশে নানা ধরনের হর্ন।

একটা টুরিস্ট শপের নানান জিনিস বাইরে রাখা, ওগুলোর ভিতর দিয়ে চলল বাস। উজ্জ্বল রঙের নানান পোস্ট কার্ড ছিটকে উঠল চারদিকে। এক সেকেণ্ডের জন্য ফু-চুঙের মনে হলো সামনে থেকে উড়ে গেল এক মহিলা। তা নয়, ওটা টি-শার্ট পরা ম্যানিকিন। হঠাৎ এক বাড়ির সঙ্গে ঘষা লাগতেই উপড়ে গেল ডানদিকের আয়না।

চারপাশে হুলুস্থূল তৈরি করে এক ইণ্টারসেকশনে ঢুকল ফু-চুং। বাস নিয়ে ঢুকে পড়ল সরু এক লেনের ভিতর। ওটাকে সড়ক বলা চলে না, দুই পাশের বাড়ির মাঝখানে গলি। তার ভিতর দিয়ে চলছে গাড়ি চলাচল। তবে উল্টো দিক থেকে কেউ আসছে না।

খরচ করা ম্যাগাযিন ফেলে নতুন ম্যাগাযিন ভরে নিল ব্রাঙ্কোর লোক, আবার গুলি শুরু করল বাসের পিছনে। গ্যাস পেডালে হঠাৎ ভুস্ করে ডেবে গেল পা। বামদিকের আয়নায় চাইল ফু-চুং, বাসের পিছন থেকে কুণ্ডুলি পাকিয়ে উঠছে কালো ধোঁয়া।

'আর একটু, পঞ্চাশ গজ,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ফু-চুং।

খক-খক করে কেশে উঠল ইঞ্জিন। থামছে না কাশি। খ্যার-খ্যার আওয়াজ তুলছে। মৃত্যু-ঘণ্টি বাজছে ইঞ্জিনের। মাইক্রোফোন মুখের কাছে তুলল ফু-চুং। দু'পাশ থেকে চেপে এসেছে বাড়িগুলো, তবে গলি ধরে এখনও এগুনো সম্ভব।

'সবাই শক্ত কিছু ধরে বসুন।'

যে-কোনও সময়ে বন্ধ হবে ইঞ্জিন। একটানে ট্র্যান্সমিশন নিউট্রালে নিল ফু-চুং, বাকি তিরিশ ফুট নিঃশব্দে এগুলো। পিছন থেকে শুনতে পেল সিয হয়ে গেল মোটর। ধাতব কী যেন ছিঁড়ে পড়ল।

অন্ধকার-প্রায় গলির দু'পাশে মাত্র তিন ইঞ্চি জায়গা। বামদিকের আয়না ছিঁড়ে পড়ল। সামনের পথ আরও সরু হয়েছে। একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং অন্যগুলোর চেয়ে খানিক বড়। ওই বাড়িতে গুঁতো দেয়ার আগেই ব্রেক করল ফু-চুং। একটু দুলে উঠল বাস, তারপর উল্টোদিকের বাড়ির সঙ্গে ঘষা খেয়ে থামল। উপর থেকে ভেসে এল টুরিস্টদের ভীত চিৎকার। তবে কেউ আহত হয়নি, নীরবতা নামল কয়েক সেকেণ্ড পর।

বড়সড় লাল এক ফায়ার এক্সটিংগুইশার ফু-চুঙের পায়ের কাছে, ওটা খুলে নিয়ে আছড়ে ফেলল উইণ্ডশিল্ডের উপর। ফেটে গেল কাঁচ, তবে চুরচুর হয়ে পড়ল না। দ্বিতীয়বারের মত এক্সটিংগুইশার কাজে লাগাল ও, তারপর তৃতীয়বার। এবার ভেঙে পড়ল কাঁচ। যে ফাঁক তৈরি হলো, তার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে যে-কোনও লোক। লাফ দিয়ে ফোকর পেরুল ফু-চুং, চার হাত-পায়ে নেমে এল গরম অ্যাসফল্টের উপর। লাফ দিয়ে উঠে ঝেড়ে দৌড় দিল। একবার কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে চাইল। বাসের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে ঘন কালো ধোঁয়া। ব্রাঙ্কোর লোক বাস পেরুতে পারবে না। অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িগুলো ঘুরে

আসতে হবে। আর পিছন থেকে যদি কোনও গাড়ি এসে থাকে, আটকা পড়েছে তারা ভাল মতই।

গলির মুখে বাঁক নিল ফু-চুং, দৌড়ের গতি কমিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল। চারপাশে হেঁটে বাড়ি ফিরছে পথচারীরা। কেউ কেউ পরিবার নিয়ে বেরিয়েছে ডিনার সারতে। একমিনিট পর দূর থেকে চাকার বিশ্রী আওয়াজ এল। পাশে এক ট্যাক্সি পেয়ে দেরি না করে উঠে পড়ল ফু-চুং। রওনা হয়ে গেল ট্যাক্সি। একবার ঘুরে চাইল ও, দেখল গলির মুখে থেমেছে ফিয়াট ব্রাভো।

এবার খুঁজতে থাক্, মনে মনে বলল ফু-চুং। সাত মিনিট পর ড্রাইভারের দিকে দশ ইউরোর একটা নোট বাড়িয়ে দিল। জ্যামের ভিতর নেমে পড়ল ট্যাক্সি থেকে। খানিক হেঁটে তামাকের ছোট এক দোকানে থামল, ওখান থেকে কিনল প্রিপেইড ডিসপোজেবল সেল-ফোন। ঢুকে পড়ল পাশের বারে। কাউন্টারের মেয়েটিকে বলতেই বাড়িয়ে দিল টাইগার বিয়ার। ওটা নিয়ে এক কোণে চলে এল ফু-চুং, ফোন করল হোটেলে। ওপাশ থেকে শুনতে পেল লোকজনের আলাপ। এক লোক নাকি আটতলার ব্যালকনি বেয়ে নীচে নেমে গেছে। দু'মিনিট লাগল ওর ক্লার্ককে বোঝাতে যে, একদল ডাকাত ঢুকেছে ওদের সুইটে। রিসেপশন ক্লার্ক কথা দিল, এখনই ফোন করবে পোলিযিয়ায়। নিজের সেল-ফোনের নাম্বার দিল ফু-চুং।

পনেরো মিনিট পর বিয়ার শেষ হলো ওর। তার এক মিনিট পরেই বেজে উঠল ফোন।

'মিস্টার, সুং,' এ নামে সুইট ভাড়া নিয়েছে।

'হ্যাঁ, বলছি।'

'আমাদের ম্যানেজার পুলিশ নিয়ে আপনার সুইটে ঢুকেছেন। ওখানে ছিল এক লোক।, নাম, লিয়োনার্দো চার্চ। মাথা ফেটে

গেছে তার।' দুঃখিত স্বরে বলল ক্লার্ক, 'পুলিশ চাইছে আপনি এসে একটা স্টেটমেন্ট দেবেন। এটাই তো আপনার ফোন নাম্বার? তাদের মনে অনেক প্রশ্ন জন্মেছে, জানতে চাইছে কী ঘটেছে সুইটে। আশপাশে আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে। সে ব্যাপারেও জানতে চায়।'

'নিশ্চয়ই জানবে, আমি সবই জানাব কর্তৃপক্ষকে। বিশ মিনিট পর আসছি।'

'অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার সুং।'

'আপনাকেও ধন্যবাদ,' লাইন কেটে অন্য একটা নাম্বারে যোগাযোগ করল ফু-চুং। পাঁচ সেকেণ্ড পর ওদিক থেকে ফোন ধরতেই বলল, 'নিং লং, আমি লিউ ফু-চুং। শহর থেকে বেরিয়ে যেতে প্লেনের টিকেট দরকার। যত দ্রুত সম্ভব।'

চাইনিজ সিক্রেট এজেন্টকে কথা বলতে না দিয়েই ফোন রেখে দিল ফু-চুং, আবার ফোন করল। জানে, এ শহরে থাকবে না জ্যারোন ব্রাঙ্কো। বেরিয়ে যাবে ইটালি থেকে। কাজেই ওরও বেরিয়ে যাওয়া উচিত। পুলিশের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করবার প্রশ্নই ওঠে না।

'হ্যালো।'

'রানা, আমি ফু-চুং।'

'বল?'

'জ্যারোন ব্রাঙ্কো কিডন্যাপ করেছে উর্বশীকে।'

পাঁচ সেকেণ্ড পেরুল, তারপর জানতে চাইল রানা, 'আর অমল?'

'আমার ধারণা ওই ছোকরা এর সঙ্গে জড়িত।'

(দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা

সর্বনাশের দূত

প্রথম খন্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

মধ্যপ্রাচ্যের তেল-সমৃদ্ধ দেশগুলোকে গ্রাস করতে চলেছে পশ্চিমা দুনিয়া। প্রস্তুতির কাজ শেষ। এমন সময় মাসুদ রানার হাতে এল ওদের পরিকল্পনার নীল নকশা। পৌঁছে গেল ওটা বাংলাদেশের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চিফ মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের হাতে। ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে এমন কয়েকটি দেশের সিক্রেট সার্ভিস চিফের সঙ্গে বসে তৈরি করলেন তিনি পাল্টা পরিকল্পনা।

প্রস্তুত রইল এশিয়ার বেশিরভাগ দেশের সেনাবাহিনী। ঠিক হল, ইজরায়েলের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে মার্কিন পারমাণবিক মিসাইল।

ডাক পড়ল মাসুদ রানা, সোহেল আহমেদ, লিউ ফু-চুং, অনিল চট্টোপাধ্যায়, আতাসি ও উর্বশী দাসার। ওদের সঙ্গে সেই ধচাপচা জাহাজে করে চলেছে আরও অনেকে।

জাহাজটা কিন্তু আপনার খুবই চেনা...

স্বর্ণ-বিপর্যয়ের সেই মার্ভেল অফ গ্রিস।

পাঠক, এই আত্মঘাতী মিশনে যাবেন ওদের সাথে??

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০